উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রস্তাবনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সাহিত্যের সম্যক্ উপলব্ধির জন্যও হয়ত পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে কম বেশী পরিচিত আছেন, সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলী এঁদের অন্তর্ভুক্ত নন; অথচ বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের কৌতূহল কম নেই।

বর্তমান গ্রন্থটি বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। 'বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা' পাশ্চাত্য-সাহিত্যজ্ঞ বিদগ্ধশ্রেণীর জন্য নয়, কর্মব্যস্ত সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য—যাঁদের বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ আছে অথচ নানা কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা পড়া যাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন, আশা করি, রেফারেন্সের প্রয়োজনে এ সংকলনটি তাঁদের কাছেও অপাঙ্‌ক্তেয় হবে না।

আলোচ্য পর্বটিতে কথাসাহিত্যে নোবেলপুরস্কার-প্রাপ্ত সমস্ত লেখকদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা নাটকের কাহিনী সংকলিত হয়েছে। মূল গ্রন্থের বক্তব্য এবং উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি বজায় রেখে উক্ত কাহিনীগুলিকে গল্প-রূপে পরিবেশন করা হয়েছে। গল্পগুলিকে লেখকদের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কালানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত করা হ'ল। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য গ্রন্থের শেষে লেখক এবং সংকলিত গ্রন্থগুলির (ইংরেজী সংস্করণ) একটি সূচী (Author-Title Index) যুক্ত করা হয়েছে।

রচনাগুলি সংকলিত করবার পূর্বে নির্ভরযোগ্য একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের রচিত তালিকা যথাযথ ভাবে বিচার করে দেখা হয়েছে। যে-ক্ষেত্রে কোন রচনার 'শ্রেষ্ঠত্ব' সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিচার পাওয়া যায় নি, সেখানে পাঠকদের রুচির কথা স্মরণে রেখে বহুল প্রচলিত ধারণাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কোথাও ব্যক্তিগত রুচি বা খেয়ালের প্রশ্রয় দিই নি।

প্রসঙ্গতঃ, উক্ত দিক্‌পাল লেখকদের জীবনচরিতও কম চমকপ্রদ নয় এবং তা জানবার আগ্রহও পাঠকদের পক্ষে হওয়া স্বাভাবিক। তাই গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে—'লেখক-পরিচিতি'-তে সেই সাহিত্যিকদের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পারম্পর্য হিসাবে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে বহু পরিশ্রমে এঁদের প্রত্যেকের আলোকচিত্র সংগ্রহ করে যুক্ত করা হ'ল।

আর একটি নিবেদন,—প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনীর বক্তব্য এবং শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য রেখে গল্পের নামকরণ করা হয়েছে।

এ ধরণের প্রচেষ্টা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় সাহিত্যে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বর্ধমান উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এরকম একটি রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।—অনেকটা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ দুরূহ কাজে একদিন ব্রতী হয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে এটি একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

স্বল্পপরিসরের রেখাচিত্রের মধ্যে বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার রূপরস যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি বলে দাবী করি না। এ প্রচেষ্টায় কতটা সিদ্ধি লাভ করেছি তাও জানি না। সে বিচারের দায়িত্ব সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের। তবে দীর্ঘকালের সাধনায় জ্ঞাতসারে এতটুকু ফাঁকি দিই নি।

'বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা' পড়ে যদি মুষ্টিমেয় পাঠক-পাঠিকা তৃপ্তি পান অথবা সেই পাঠকমনে যদি কোন মূলগ্রন্থ বা তার লেখক সম্পর্কে কৌতূহল জাগে তাহ'লে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। পাঠক-পাঠিকাদের থেকে উৎসাহ পেলে পরবর্তী পর্ব ভবিষ্যতে তাঁদের হাতে তুলে দেবার ইচ্ছা আছে।

এ গ্রন্থ সংকলনে যাঁদের কাছে আমি আন্তরিক উৎসাহ, প্রেরণা ও নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অগ্রজপ্রতিম সর্বশ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (জাতীয়

গ্রন্থাগার)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দিসাহিত্যিক শ্রীমতী রজনী পানিক্করের উৎসাহও ভুলবার নয়। ভুলতে পারি না জাতীয় গ্রন্থাগারের বন্ধু-কর্মীবৃন্দ এবং তরুণ বন্ধু শ্রীঅশোক রায়ের সাহায্যের কথা। গুজরাটবাসী সহৃদয় শ্রীকৃষ্ণভাদন জেট্‌লি, এম-এ, বি-টি আটজন লেখকের (আইভান বুনিন, আনাতোল ফ্রাঁস, আলবেয়ার কামু, গেরহার্ট হাউপ্টমান, গ্রাৎসিয়া দেলদ্দা, জেলমা লেগারলয়েফ, পার ফেবিয়ান লাগেরকভিস্ট এবং হালডোর ল্যাক্সনেস) আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সবশেষে, ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতি তুচ্ছ করে শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ ধরণের ব্যয়বহুল বই প্রকাশ করবার জন্য যে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়েছেন সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি—

নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী

কলিকাতা;
২৭শে মাঘ, ১৩৭২।
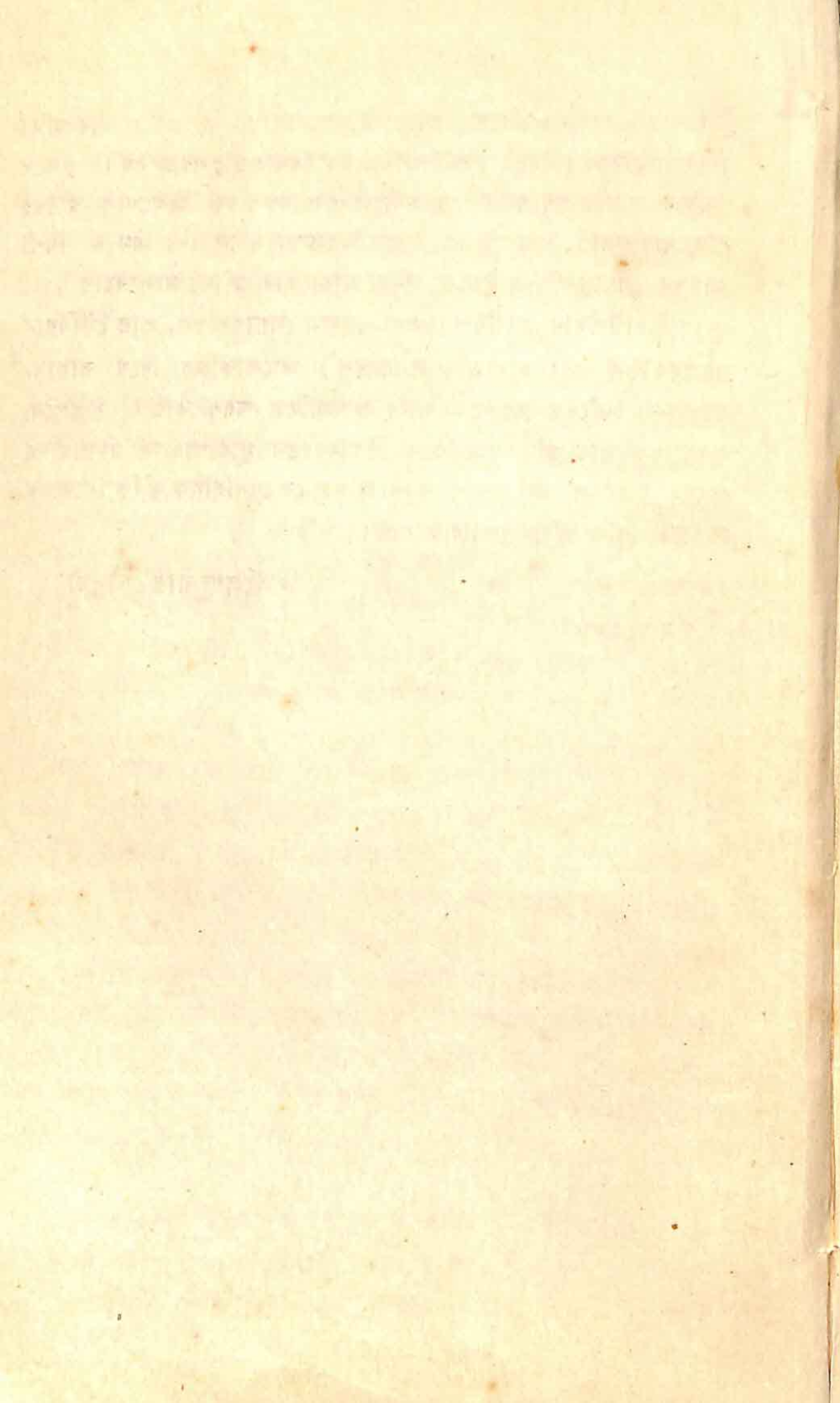
প্রকাশকের নিবেদন

'বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা' বাংলা সাহিত্যে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। আজ পর্যন্ত এ ধরনের প্রচেষ্টা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, কোন ভারতীয় সাহিত্যে-ই হয় নি।

আলোচ্য পর্বটিতে কথাসাহিত্যে নোবেলপুরস্কার-প্রাপ্ত যাবতীয় লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা নাটকের কাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে। মূল গ্রন্থের বক্তব্য এবং উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি বজায় রেখে গ্রন্থকার চিত্তাকর্ষক ভাষায় কাহিনীগুলির ব্যঞ্জনা দিয়েছেন সরস গল্প-রূপে। লেখনীর প্রসাদ-গুণে ও মাধুর্যে প্রত্যেকটি গল্পই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ।

নানা কারণে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে নোবেলপুরস্কার-প্রাপ্ত লেখকগণের রচনা পড়া সম্ভবপর নয়। বর্তমান গ্রন্থটি সেই বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকগণের রচনার সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেবার পক্ষে একটি দুর্লভ অবদান।

শেষ অধ্যায়ে আলোকচিত্রসহ উক্ত বরণীয় সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

নিঃসন্দেহে 'বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা' বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন-রূপে দাবী রাখে। প্রধানতঃ সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য হ'লেও—সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থটি প'ড়ে আনন্দ পাবেন ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

কয়েকটি আলোকচিত্রের জন্য আমরা—ব্রিটিশ্ ইনফরমেশন সার্ভিস্ এবং ইউ এস্ আই এস্, কলিকাতা ; বেলজিয়াম, স্পেইন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, ডেনমার্ক এবং পলিশ দূতাবাস ও জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা প্রভৃতি সংস্থার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ইতি—

প্রকাশক

॥ সূচী ॥

মানরক্ষা ... ১
আঁধারে আলো ... ১১
ঝড়ের পরে ... ১৯
গরবিণী ... ২৮
নষ্টনীড় ... ৪৩
তাঁতি ... ৫১
বুভুক্ষা ... ৫৮
পাপ-পুণ্য ... ৬৫
শেষরক্ষা ... ৭৪
চাষী ... ৮১
সেন্ট জোয়ান ... ৮৮
মা ... ৯৯
হারানো প্রেম ... ১০৬
যাদু-পাহাড় ... ১১৫
রাজপথ ... ১২২
'ফরসাইট' পরিবার ... ১৩০
শহর থেকে দূরে ... ১৩৮
জ্যান্ত ভূত ... ১৪৪
অ্যানা ক্রিস্টি ... ১৫১
'থিবো' কাহিনী ... ১৫৮
সোনার মাটি ... ১৬৯
মুক্তি ... ১৭৮
যাত্রী ... ১৮৭
সিদ্ধার্থ ... ১৯৮
জালিয়াত ... ২০৪
শ্রাবণের রোদ ... ২১৩
বারাব্বাস ... ২২৫

প্রেমের মরুভূমি	...	২৩১
মুক্তির আহ্বান	...	২৩৮
স্বাধীনতার পণ	...	২৫১
মহামারী	...	২৫৮
ডক্টর জিভাগো	...	২৬২
সেতু	...	২৭০
শেষ আশ্রয়	...	২৭৭
বিবমিষা	...	২৮৮
ধীরে বহে ডন	...	২৯৪

* * *

লেখক-পরিচিতি	৩১৩
সূচী (Author—Title Index)	৩৮৩

মানরক্ষা

পোলিশ কথাসাহিত্যের দিক্‌পাল হেনরিক সিনকিয়ুইজ (Henryk Sienkiewicz)-এর 'কুও ভেডিস' (Quo Vadis), ১৮৯৬, উপন্যাসের গল্পরূপ।

সেদিন পেট্রোনীয়াস প্রসন্ন মনে তাঁর বাড়িতে বসে আছেন একাকী। এমন সময় তাঁর ঘরে এসে ঢুকল এক সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবক—তাঁর প্রিয় ভাইপো, ভিনিসাস্। পেট্রোনীয়াস ভাইপোকে জানালেন সাদর অভ্যর্থনা।

তাঁর সুযোগ্য ভাইপোটি সদ্য ফিরে এসেছে উপনিবেশ থেকে সম্রাটের আদেশ সুষ্ঠু ভাবে পালন করে।

পেট্রোনীয়াস সম্রাট ছিলেন না বটে কিন্তু রোম সাম্রাজ্যে তাঁর আভিজাত্য, ক্ষমতা বা প্রতাপ ছিল রাজকীয়। স্বয়ং সম্রাট নীরোও তাঁকে রীতিমত খাতির করে চলতেন। নীরো ছিলেন পেট্রোনীয়াসের বিশেষ বন্ধু।

রাজপ্রাসাদের তুলনায় তাঁর অট্টালিকাটিও নেহাৎ মন্দ ছিল না। দেখতে সেটি সত্যিই চমৎকার ছিল। তাঁর ক্রীতদাসদাসীরা সবাই ছিল বাছাই করা।

সেই অট্টালিকায় ছিল নানা ধরণের যাদুর বিচিত্র সরঞ্জাম। আর ছিল বিবিধ দুর্লভ শিল্প ও কলার মনোরম নিদর্শন, যা বহু সম্রাটের মনে ঈর্ষা জাগাত। তাই সম্রাট নীরোর স্থূল ঐশ্বর্যের প্রতি পেট্রোনীয়াসের কোন মোহ ছিল না।

বন্ধু হলেও নীরোর চরিত্রের রূপটি পেট্রোনীয়াসের অ-জানা ছিল না। তিনি জানতেন, নীরোর কোন রুচির বালাই নেই। আছে

কেবল অহেতুক অহংকার বোধ। শুধু কি তাই? নীরো ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং দুষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু পেট্রোনীয়াস জানেন—তবুও নীরো সম্রাট!

আজ বিজয় নিশান নিয়ে ফিরে এসেছে তাঁর তরুণ ভাইপো। কিন্তু তার চোখে মুখে কেমন যেন এক বিমর্ষ ভাবের আভাস। সে মুখে তিনি খুঁজে পান না খুশীর ছোঁয়াচ।

বিস্মিতভাবে তিনি প্রশ্ন করেন, "কি হয়েছে তোমার?"

"সেই কথা বলতে আপনার কাছে এসেছি।"

ভিনিসাসের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি অনিন্দ্যসুন্দর মুখ। কিন্তু দ্বিধা আর সঙ্কোচ এসে ভিনিসাসের কণ্ঠরোধ করে।

সে বুঝতে পারে না কিভাবে কাকাকে জানাবে তার মানসীর কথা। সে কেমন করে তাঁকে বোঝাবে তার অন্তরের অসহ্য বিরহ-বেদনার জ্বালা।

অথচ লিগিয়া-হীন জীবনের কথা ভিনিসাস্ ভাবতেও পারে না। সে জীবন তার কাছে মনে হয় দুঃসহ। অগত্যা এক সময় তাকে আনত মুখে বলতে হয়—

'আমি আপনার কাছে রাজকুমারী লিগিয়াকে প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি তাকে সঙ্গিনী হিসাবে। আপনি দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।'

ভাইপোর আব্দার শুনে পেট্রোনীয়াস একটু যেন চিন্তিত হলেন। কিন্তু প্রিয় ভাইপোটির কাতর মিনতি পেট্রোনীয়াস এড়াতে পারেন না। খানিক বাদে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি আশ্বাস দেন—

'বেশ, পাবে তুমি সেই শ্রীমতীকে। কিন্তু এজন্য আমাকে নীরোর সাহায্য নিতে হবে।'

পেট্রোনীয়াসের অনুরোধে নীরো হুকুম করলেন—রাজকুমারী লিগিয়াকে অবিলম্বে তাঁর রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসবার জন্য।

সম্রাটের আদেশ। সে আদেশ যত কঠিনই হোক না কেন তা অমোঘ!

লিগিয়ার পালক পিতা বুঝতে পারলেন, এবার হাতে ধরে কন্যাকে দিতে হবে চিরবিদায়। আসবার সময় তিনি রাজকুমারীর ভৃত্য হিসাবে তার সঙ্গে পাঠালেন অনুগত আরসাসকে।

আরসাসের যেমন ছিল দৈত্যের মত বিরাট চেহারা—তেমনি সে ছিল অসাধারণ শক্তিশালী বীরপুরুষ। শুধু অনুগত ভৃত্য নয়, সে এল রাজকুমারীর আদর্শ দেহরক্ষীও হয়ে।

রাজপ্রাসাদে সেদিন সকলে পানোন্মত্ত হয়ে উঠেছে। চারিদিকে হৈ চৈ। সেই সুযোগে ভিনিসাস্ চুপি চুপি এগিয়ে গিয়ে লিগিয়ার কাছে প্রেম নিবেদন করে।

দূর থেকে শ্রীমতী অ্যাস্টী সব কিছুই লক্ষ্য করছিল।

শ্রীমতী অ্যাস্টী এক সময় ছিল নীরোর প্রণয়িনী। সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতা। আজ সে উপেক্ষিতা হলেও রাজপ্রাসাদের কোন খবরই তার অজানা থাকে না। বিদেশিনী লিগিয়ার খবরও সে বিলক্ষণ জানে।

সে জানে রাজকুমারী লিগিয়া তার সধর্মী। হঠাৎ শ্রীমতী লিগিয়ার প্রতি সে কেমন মমতা বোধ করে। ধীর পায়ে সে গিয়ে হাজির হয় ভিনিসাস্ এবং লিগিয়ার মাঝখানে।

ভিনিসাস্ অপ্রস্তুত হয়, হয় তার রসভঙ্গ। অগত্যা তাকে সেখান থেকে সরে আসতে হয়। লিগিয়া স্বস্তি পায়।

শ্রীমতী অ্যাস্টী কি করে জানতে পারে ঐদিন রাত্রেই শ্রীমতী লিগিয়াকে তুলে দেওয়া হবে ভিনিসাসের হাতে—সম্রাটের বিশেষ উপহার হিসাবে। শুনে লিগিয়া চমকে ওঠে।

বিপদ কি এক!

দৈবের দুর্বিপাকে রাজকুমারী আগস্টা হঠাৎ মারা গেল ঐদিনে।

জানা গেল, মহারাণীর কি করে ধারণা হয়েছে—ডাইনী লিগিয়া-ই তার মেয়ের এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ—এ তারই কারসাজি। স্তাবকের দল মহারাণীর সে ধারণাতে যোগায় ইন্ধন।

সর্বনাশ, রাজরোষ! শ্রীমতী অ্যাস্টী এবং আরসাস পরামর্শ করে স্থির করে, ঐ রাত্রেই লিগিয়াকে নিয়ে প্রাসাদ থেকে দূরে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে ওরা পালিয়ে যাবে।

ওদিকে ব্যবস্থা অনুযায়ী সন্ধ্যার আগেই ভিনিসাস্-এর তরফ থেকে লোক এসে হাজির হয়েছে—শ্রীমতী লিগিয়াকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য।

ভিনিসাসের বাড়ি হয়ে উঠেছে আনন্দে মুখরিত। তার প্রণয়িনীর সম্মানের জন্য সে আয়োজন করেছে মস্ত বড় এক প্রীতিভোজের। আজ ভিনিসাসের আনন্দের সীমা নেই। মিলনের আশায় তার দেহমন উন্মুখ হয়ে আছে। শ্রীমতীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ভক্তবৃন্দ নিয়ে সে প্রতীক্ষা করছে।

ভিনিসাসের অনুচরবৃন্দ শ্রীমতী লিগিয়াকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এগিয়ে যায় তার বাড়ির দিকে আড়ম্বর করে।

আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ অপরিচিত একদল লোক এসে শোভাযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লিগিয়াকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

শোভাযাত্রীদের দল হয় হতভম্ব। বিভ্রান্ত লোকগুলি অনর্থক কিছু সময় খুঁজল শ্রীমতী লিগিয়াকে এদিক ওদিক।

ততক্ষণে আক্রমণকারীরা লিগিয়াকে নিয়ে সহর ছেড়ে ছুটে চলে গেছে তার উপকণ্ঠে—খ্রীষ্টানদের নিরাপদ আশ্রয়ে।

খবর শুনে ভিনিসাস্ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পেট্রোনীয়াস এগিয়ে আসেন তার সাহায্যে। সহরের চারিদিকে লোক পাঠান হয় লিগিয়ার

সন্ধানে। কোন ফল হয় না। ক্রমে ভিনিসাসের হয় মানসিক বিপর্যয়।

সুবিধাবাদী স্তাবকের অভাব ছিল না কোন কালে। ভিনিসাসের অবস্থা দেখে গ্রীসবাসী চিলো এগিয়ে আসে তার কাছে আশার বাণী নিয়ে।

চিলো ঘোষণা করল এক লোভনীয় পুরস্কার। তবুও কিন্তু কেউ জানাল না শ্রীমতী লিগিয়ার সন্ধান। ধূর্ত চিলো এবার খ্রীষ্টানদের কাছে নিজেকে প্রচার করল তাদেরই একজন সহধর্মী বলে।

খ্রীষ্টানরা তাকে জানায় সাদর অভ্যর্থনা।

ক্রমে চিলো তাদের সঙ্গে অবাধে মিশবার সুযোগ পায়। ফলে সে সন্ধান পায় খ্রীষ্টানদের সব ঘাঁটির। সে জানল শ্রীমতী লিগিয়ার গুপ্ত আস্তানাটির খবরটি পর্যন্ত।

এবার চিলো ভিনিসাস্‌কে পরামর্শ দিল লিগিয়াকে সেই গুপ্ত ঘাঁটি থেকে চুরি করে আনবার জন্য।

যাত্রার আয়োজন হতে দেরী হল না। আরসাসের কথা মনে পড়তে তারা সঙ্গে নিল এক পালোয়ান।

না, চিলো ভুল করে নি। সে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছেছে। সবে তারা লিগিয়ার ঘরটিতে ঢুকেছে, কোথা থেকে আরসাস এসে যমদূতের মত তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আরসাস তাদের সঙ্গের পালোয়ানটিকে নিমিষে মেরে ফেলল। বেগতিক বুঝে চিলো কোন ফাঁকে সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

ভিনিসাস্‌ও গুরুতর ভাবে আহত হল বটে কিন্তু সহৃদয় খ্রীষ্টানরা তাকে দিল আশ্রয়। তাদের কাছে ভিনিসাসের সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হল না। শ্রীমতী লিগিয়া নিজে এগিয়ে এলো তাকে সেবা করতে।

ভিনিসাস্‌ তাদের উপনিবেশে থেকে যায়। লিগিয়া প্রাণ ঢেলে তার সেবা করে।

দিন যায়। শ্রীমতী লিগিয়া একদিন ভিনিসাসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মনকে শাসন করে—

—না না, এ অসম্ভব। সে যে বিধর্মী, সে খ্রীষ্টানদের শত্রু!

তবুও তার মন মানে না। তাই বাধ্য হয়ে সে ভিনিসাসের থেকে দূরে থাকে। ভিনিসাসের কিন্তু সেবাযত্নের কোন ত্রুটি হয় না।

ভিনিসাস্ অনেকটা সুস্থ হয়েছে। সে আরোগ্যের পথে দ্রুত এগিয়ে যায়।

খ্রীষ্টানদের মহত্ত্ব, সহৃদয়তা এবং ক্ষমার আদর্শ দেখে ভিনিসাস্ অভিভূত হয়। ধর্মের প্রতি তাদের নিষ্ঠা দেখে সে হয় মুগ্ধ।

শুয়ে শুয়ে সে শোনে যীশুর অলৌকিক মহিমার কথা। তার মনে কেমন দ্বন্দ্ব উঁকি দেয়। সে হয় বিভ্রান্ত।

ক্রমে তার মন থেকে সব দ্বন্দ্ব কেটে যায়। শুধু লিগিয়া নয়, সমস্ত খ্রীষ্টানদের প্রতি সে বোধ করে গভীর মমতা। আশ্চর্য, এখন আর প্রণয়িনী লিগিয়াকে জোর করে নিয়ে যেতে ভিনিসাসের ইচ্ছা জাগে না।

ভিনিসাস্ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। খ্রীষ্টানদের মনে হয় তার আত্মীয় বলে। একদিন সে দীক্ষিত হল খ্রীষ্টধর্মে।

এবার ভিনিসাস্‌কে বরণ করে নিতে লিগিয়ার কোন আপত্তি থাকে না। ওরা পরস্পর পরস্পরকে নিবেদন করল প্রেম।

এই সময় নীরো গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু টিজেলিনাসরের কাছে বেড়াতে। সেখান থেকে ফিরবার সময় বন্ধুটি নীরোকে পরামর্শ দিল—

'বন্ধু, ফিরে গিয়ে রোম নগরটিতে তুমি আগুন লাগিয়ে দাও। নগরটির সেই ধ্বংসের রূপ দেখে তুমি পাবে প্রেরণা। তোমার সেই প্রেরণা থেকে সৃষ্টি হবে একটি অপূর্ব সংগীত। সে সংগীতের মাধ্যমে তুমি হয়ে থাকবে অমর।'

বন্ধুর পরামর্শটি নীরোর মনে ধরল। রোমে ফিরে এসে নীরো

সত্যি সত্যিই নগরের চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। দাউ দাউ করে সে আগুন জ্বলে উঠল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ধ্বংসের মারাত্মক বিভীষিকা।

নাগরিকরা প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করে। ক্রমে চারিদিকে চাপা অসন্তোষ আর বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে ওঠে।

তবুও নীরোর চেতনা হয় না। জাগে না শুভবুদ্ধি। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মহারাণী এবং রাজ দরবারের দুষ্ট ইহুদিরা নীরোকে পরামর্শ দেয়—

'সম্রাট, অবস্থা শোচনীয়। অবিলম্বে এজন্য খ্রীষ্টানদের দায়ী করুন।'

নীরোর সম্বিত ফিরে আসে। তাঁর ইঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গে রটে গেল, যে এই ধ্বংসের জন্য দেশদ্রোহী খ্রীষ্টানরাই দায়ী।

খ্রীষ্টানরা সকলে নগর ছেড়ে তার উপকণ্ঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ শুনে তারা সকলে শংকিত হয়ে ওঠে।

এ সুযোগ থেকে সুবিধাবাদী চিলো নিজেকে বঞ্চিত করল না। বিশ্বাসঘাতক সম্রাটকে জানিয়ে দিল খ্রীষ্টানদের সব গুপ্ত আশ্রয়ের সন্ধান। শুধু তাই নয়, তাদের গ্রেপ্তার করতে সে হল সম্রাটের সৈনিকদের পথপ্রদর্শক।

শুরু হল নিরীহ খ্রীষ্টানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। নারীদের ওপর চলে জঘন্য পাশবিক অত্যাচার। নির্মমভাবে তারা হয় বন্দী। শ্রীমতী লিগিয়া এবং তার দেহরক্ষী আরসাসও রেহাই পায় না।

অসহায় বন্দীদের ভিতর কেউ হল ক্রুশবিদ্ধ। কাউকে বা আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। আবার কারুকে ক্ষুধার্ত হিংস্র জন্তুর সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নীরো মজা দেখেন। বর্বর জনতা তাদের সম্রাটের সঙ্গে সে দৃশ্য উপভোগ করে।

বন্দী প্রণয়িনী লিগিয়াকে উদ্ধার করবার জন্য ভিনিসাস্ নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে ব্যর্থ চেষ্টা করে।

পেট্রোনীয়াস নীরোকে অনেক করে অনুরোধ করেন ক্ষান্ত হতে। কিন্তু কোন ফল হয় না। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

খামখেয়ালী সম্রাটের নিষ্ঠুর খেলা অব্যাহত থাকে।

এলো সুন্দরী লিগিয়ার পালা। তাকে বিবসনা করে একটি উন্মত্ত বুনো ষাঁড়ের পিঠে বাঁধা হল। তারপর সেই ষাঁড়টিকে ছেড়ে দেওয়া হল ক্রীড়াঙ্গনে। সেই অবস্থায় ষাঁড়টি ঢুকলে চারিদিকের বর্বর জনতা পৈশাচিক উল্লাসে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ কোথা থেকে আরসাস এসে ক্রীড়াঙ্গনের মাঝখানে দাঁড়ায়। মানুষ নয় তো যেন সাক্ষাৎ যমরাজ—দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে সেই ষাঁড়টির জন্য !

ষাঁড়টি তার প্রকাণ্ড শিং দুটি উঁচিয়ে ছুটে আসে তার দিকে। চকিতে আরসাস্ তার বজ্রকঠিন হাত দুটি দিয়ে ষাঁড়টির গলা সাঁড়াশির মত চেপে ধরে।

আশ্চর্য, ষাঁড়টি একটুও আর নড়তে পারে না। আরসাসের চোখ দুটি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ে। তার দেহের পেশীগুলি দ্বিগুণ ফুলে ওঠে।

খানিক বাদে সেই বিরাট বুনো ষাঁড়টি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল—তার চোখ দুটি বেরিয়ে আসে, মুখ দিয়ে আসে অবিশ্রান্ত রক্তধারা।

সে দৃশ্য দেখে উত্তেজিত জনতা হয় বিস্ময়ে হতবাক্। মুখর জনতা হয় স্তব্ধ। কারুর মুখে ভাষা নেই—বুঝি তাদের নিঃশ্বাসও পড়ে না।

সম্বিত ফিরে আসতে একই সঙ্গে তারা চিৎকার করে ওঠে—'সাবাস্ আরসাস্, বেঁচে থাকো।'

এবার তারা সকলে উচ্চকণ্ঠে দাবী জানায়—আরসাস্ এবং লিগিয়ার মুক্তি।

অগত্যা নীরোকে সেই বিপুল জনতার দাবী মানতে হয়। তারা দু'জন মুক্তি পায়।

পেট্রোনীয়াস ভিনিসাস্‌কে আড়ালে ডেকে বলেন,—'বাঁচতে চাও তো লিগিয়াকে নিয়ে এক্ষুণি তোমরা বদমাইস নীরোর আওতা থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে যাও।'

ভিনিসাস্ শ্রীমতী লিগিয়াকে নিয়ে সেই দিনই সিসিলিতে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার পর একজন মুমূর্ষু খ্রীষ্টান সেই জনতার মাঝে চিৎকার করে নীরোকে অপরাধী বলে জানায়। খানিক বাদে আর একটি মৃত্যুপথের যাত্রীর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেখে বিশ্বাসঘাতক চিলোর মনে কেমন অনুশোচনা জাগে। সে নিজের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে উচ্চকণ্ঠে জনতাকে জানিয়ে দেয়—

'খ্রীষ্টানরা সম্পূর্ণভাবে নিরপরাধ; আসলে এই ধ্বংস এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্য দায়ী খামখেয়ালী সম্রাট নিজে, অন্য কেউ নয়।'

এক সময় জনতা নীরোর এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের খেলা দেখে দেখে হয় ক্লান্ত। তাদেরই দাবীতে নীরোকে এবার বন্ধ করতে হয় তাঁর নির্মম খেলা।

নীরো নিজেও বুঝি একটু ক্লান্ত হয়েছিলেন। এবার তাঁর দরবারের অমাত্যবর্গদের নিয়ে কিছুদিনের জন্য গেলেন কূমেতে। সঙ্গে গেলেন পেট্রোনীয়াসও।

আশ্চর্য, সেখানে গিয়ে পেট্রোনীয়াস শুনলেন নীরো তাঁর মৃত্যুদণ্ড হুকুম করেছেন। সে খবর শুনে পেট্রোনীয়াস তাঁর বাড়িতে একদিন সম্ভ্রান্ত সব লোকেদের একটি প্রীতিভোজে আমন্ত্রণ জানালেন।

যথাসময়ে তাঁরা সকলে এলেন সেই প্রীতি সম্মিলনে। সেই বিশিষ্ট অতিথিদের সকলকে অবাক করে পেট্রোনীয়াস একসময় দীপ্ত

কণ্ঠে ঘোষণা করলেন সম্রাট নীরোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তারপর নাটকীয় ভাবে পেট্রোনীয়াস করলেন আত্মহত্যা।

নীরো রোমে ফিরে এলেন। দীর্ঘদিনের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে এবার প্রজারা প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি ঘৃণা আর বিদ্বেষ প্রকাশ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হল না।

ক'দিন বাদে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁর বিরুদ্ধে ঘোষণা করে বিদ্রোহ। দেখতে দেখতে সাম্রাজ্যের চারিদিকে সেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহীরা সম্রাটের মৃত্যুদণ্ড জারী করে।

অনুগত কয়েকটি মাত্র ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে নীরো রাতের অন্ধকারে চোরের মত প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি পালাবার পথ পান না।

বিভ্রান্ত নীরো একসময় তাঁর তীক্ষ্ণ ছুরিটি নিজের গলায় বসিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু আত্মহত্যা করবার মত শক্তি ও সাহস দুই-ই তখন তিনি হারিয়েছেন। অসহায় নীরো ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকেন। সে চোখে থাকে না কোন ভাষা, না কোন দৃষ্টি।

বিক্ষুব্ধ সৈনিকরা ছুটে এগিয়ে আসে নীরোকে বন্দী করতে।

বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর বন্দী হবেন তাঁরই সামান্য সৈনিকের হাতে! সে কথা ভাবতে বিশ্বস্ততম অনুগত ক্রীতদাসটির প্রাণ কেঁদে ওঠে নীরোর জন্য। প্রভুকে দেখতে চায় না সে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে।

অগত্যা প্রভুর হাত থেকে শাণিত ছুরিকাটি কেড়ে নিয়ে ক্রীত-দাসটি সেটি আমূল বসিয়ে দিল নীরোর কণ্ঠে।

ক্রোধোন্মত্ত সৈনিকরা এগিয়ে এল। কিন্তু তখন নীরোর রক্তাক্ত নিস্পন্দ দেহটি মাটিতে লুটোচ্ছে।

অনুগত ক্রীতদাসের দয়ায় সম্রাট নীরো পেলেন তাঁর লাঞ্ছিত জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি।

আঁধারে আলো

ইংরাজী সাহিত্যিক রুডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling)-এর 'ব্রাসউড বয়' (The Brushwood Boy), ১৮৯৫, উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

জর্জীর ছ' বছর বয়স হল। সারাদিন সে খেলাধূলায় মেতে থাকে। কখনও বা তার কিশোর মন কল্পনারাজ্যে ঘুরে ফেরে।

তার বাড়ির কাছে সমুদ্রের পাড়ে ছিল লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটি ঝোপ। সেখানে রোজ আসত জর্জীর সমবয়সী সব ছেলেমেয়ের দল। তাদের সঙ্গে সেই ঝোপের ভিতর সে খেলা করত লুকোচুরি, আরও কত কি?

রাত্রে শুতে গিয়ে চোখ বুঁজলে, সারাদিনের তার বিচিত্র ভাবনাগুলি স্বপ্নলোকে হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। জর্জী দেখে সব মজার জিনিস—

তখন ঐ লোহার রেলিংগুলি আর শক্ত থাকত না। সেগুলি সব হয়ে যেত নরম। তার ওপর দিয়ে ওদের কোমল পায়ে হেঁটে যেতে একটুও হত না কষ্ট। বাড়ির সব বড় লোকগুলি হয়ে যেত ছোট, আর ছোটরা হত বড়।

শুধু কি তাই? জর্জী হয়ে ওঠে মস্ত এক বীরপুরুষ। সেখানে সে প্রকাণ্ড ড্রাগন আর বুনো মোষকে মেরে ফেলে অনায়াসে। তার সেই দুঃসাহসিক কাজ দেখে তার প্রিয় রাজকুমারী এনিয়ান-লাউসি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। গর্বে জর্জীর বুকটা ফুলে ওঠে বারবার।

আশ্চর্য! জর্জী ভেবে পায় না, চোখ খুলতে সে সব কোথায়

মিলিয়ে যায়। অথচ রোজ রাত্রে চোখ বুঁজতে তারা সব একই ভাবে এগিয়ে আসে তার সামনে।

ক্রমে সাত বছর বয়স হয় জর্জীর। এই সময় একদিন বাড়ির লোকের সঙ্গে সে গেল অক্সফোর্ডে বেড়াতে। সেখানে কোন এক সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে যাওয়া হল ম্যাজিক দেখাতে।

জর্জীর পাশের চেয়ারটিতে বসে ছিল ছোট্ট একটি মেয়ে; মিষ্টি মুখখানি তার দুষ্টুমিতে ভরা। ওরা পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করল। দু'জনের চোখে মুখে ফুটে উঠল খুশীর আভাস।

অনেকদিন আগে ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটতে গিয়ে জর্জীর হাতের একটি আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল। কাটা দাগটি তখনও মিলিয়ে যায় নি।

তার আঙ্গুলের ঐ কাটা দাগটির ওপর নজর পড়তেই ছোট্ট মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আধো আধো ভাবে সে জর্জীকে প্রশ্ন করে—

ইস্, দেখি তোমার ঐ আঙ্গুলটি। কি করে কেটেছিল? বড্ড লেগেছিল না?

প্রশ্ন শুনে বীরপুরুষের বুকটা ফুলে ওঠে।

জর্জী কিন্তু মেয়েটির প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ পায় না। তার নিষ্ঠুর আয়াটি ছুটে এসে বাধা দেয়—

জর্জী, অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল না?

জর্জী কি করে আয়াকে বোঝাবে যে ছোট্ট মেয়েটি মোটেই তার অপরিচিতা নয়। সে যে তার বহুদিনের পরিচিতা—অন্তরঙ্গ বন্ধু। বেচারী মনের দুঃখে চুপ করে থাকে।

আশ্চর্য! সেই রাত্রে জর্জী এক নতুন স্বপ্ন দেখল—

সে দেখল, সেদিন তার পৌঁছবার আগেই ম্যাজিক হলের সেই ছোট্ট মেয়েটি ঝোপে এসে হাজির হয়েছে। সে অপেক্ষা করছে

জর্জীর জন্য। তারপর তারা তু'জন সেখানে খেলল কত মজার খেলা।

কিছুদিন পরের কথা। জর্জী যায় ইংলণ্ডে পড়াশুনা করতে।

সেখানে দশ বছর তার কাটে পাবলিক স্কুলে। সে হয়েছিল ছাত্রদের নেতা, খেলাধূলোর পাণ্ডা। সহপাঠী বন্ধুদের ঝগড়া মিটাতেও সে ছিল অগ্রণী। তাইতো সে হয়েছিল হেডমাস্টারেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র—সর্বজনপ্রিয় ছাত্রনেতা।

সেই ব্যস্ত ইস্কুল-জীবন জর্জীকে করেছিল তার স্বপ্নলোক থেকে বিচ্ছিন্ন।

পাবলিক স্কুলের পাঠ শেষ করে জর্জী গেল সামরিক শিক্ষায়তনে স্যাণ্ডার্স্টে। সে ভর্তি হল তৃতীয় শ্রেণীতে। কিন্তু কিছুদিন যেতে সেখানেও সে ছাত্রদের নেতার আসনটি লাভ করল; হল সে শিক্ষকদের প্রিয়পাত্র।

শিক্ষা শেষে জর্জী পেল একটি নিম্নপদস্থ অফিসারের পদ। চাকুরি নিয়ে সে এল ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ হল তার কর্মস্থল।

নতুন পরিবেশ। তার বাহিনীর সৈনিকরা সকলেই ভারতবাসী —ভিন্ন জাতি। তাদের আচার ব্যবহার কথাবার্তা সবকিছুই ভিন্ন। সবকিছুই তার অপরিচিত।

জর্জী কিন্তু দরদী মন নিয়ে তার প্রতিটি জোয়ানের সঙ্গে মেলা-মেশা করে সহজ এবং সচ্ছন্দ ভাবে। তার সহৃদয়তার স্পর্শে জোয়ান-দের বিভীষিকা দূর হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সে তার বাহিনীর হৃদয় জয় করল। জর্জী হল একজন জনপ্রিয় অফিসার, হল সে বাহিনীর আদর্শ দলপতি।

জর্জীর মধুর ব্যবহারে জোয়ানরা ভুলে যায় তাদের কঠিন জীবনের ক্লান্তি। জর্জীর নির্দেশে হাসিমুখে তারা এগিয়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের জীবন তুচ্ছ করে।

নিজে সে দুঃসাহসিক কাজ করে তার কর্তব্য মনে করে, বাহাদুরীর প্রত্যাশায় নয়।

দুর্গের ভিতরকার চপল তরুণীরা কখনও এগিয়ে আসে তরুণ জর্জীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ; হয়ত বা তার হৃদয়ে দোলা দিতে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। তার কাছে হৃদয়বৃত্তি প্রশ্রয় পায় না। সুন্দরীরা ফিরে যায় আশাহত হয়ে।

জর্জী ডুবে থাকে তার কাজের ভিতর।

হঠাৎ একদিন শৈশবের সেই পুরানো স্বপ্নলোক জর্জীর মনে আবার জেগে ওঠে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই পরিচিত প্রিয় ঝোপটি। জর্জী ফিরে যায় তার পুরানো জগতে।

এবার এই ঝোপটির পাশ দিয়ে কখনও সে হেঁটে যায় অনেক দূরে ল্যাম্পপোস্টটি পর্যন্ত। বিচিত্র এই ল্যাম্পপোস্টটি—কত মজার জিনিসই না ঘটে এই ল্যাম্পপোস্টটিকে কেন্দ্র করে—

কখনও বা এই ল্যাম্পপোস্টের কাছে সে ছুটে যায় নিরাপদ আশ্রয় মনে করে। আবার কখনও বা এইখানেই তার শৈশবের সেই বিভীষিকা দেখে সে চমকে ওঠে।

কোনদিন বা পদ্মের বাগানের ভিতর দিয়ে স্টীমারে করে জর্জী চলে যায় দূরদূরান্তে, বুঝি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে। তখন ভয়ে তার মুখ যায় শুকিয়ে।

আশ্চর্য ! ঠিক সেই সময় হাসিমুখে কোন্ এক অ-জানা বন্ধু এগিয়ে আসে তার কাছে। বন্ধুটি তার হাত ধরে নিয়ে এসে তাকে পৌঁছে দেয় সেই ঝোপের কাছে, নিরাপদ আশ্রয়ে। জর্জী স্বস্তি পায় বটে কিন্তু সে ভেবে পায় না,—কে এই অ-জানা বন্ধু !

আবার অনেক সময় ছোট্ট টাট্টু ঘোড়াটির পিঠে চড়ে জর্জী ছুটে চলে যায় তিরিশ মাইল দূরের সেই ল্যাম্পপোস্টটির নিরাপদ আশ্রয়ে।

এই ভাবেই সে আবার রোজ বিচিত্র স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কিন্তু দিনের আলোতে জর্জী হয়ে ওঠে দক্ষ সৈনিক।

ইতিমধ্যে জর্জীর নেতৃত্বে একটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে তার বাহিনী জয়লাভ করল। তার হল পদোন্নতি।

কর্তৃপক্ষ খুসী হয়ে তাকে মঞ্জুর করে পুরো এক বছরের ছুটি—স্বদেশে কাটিয়ে আসবার জন্য।

এতদিন পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে তার পিতামাতা দাসদাসী সকলেই খুব খুশী হয়। খুশী হয় জর্জী নিজেও। এখানে থাকে না কঠিন অনুশাসনের কোন বালাই, থাকে না সামরিক কর্তব্যের জরুরী তাগিদ। জর্জী খেয়াল খুশীমত ঘুরে ফেরে এদিক ওদিক। সে ছুটি ভোগ করে।

আশ্চর্য! ছুটিতে স্বদেশে ফিরে এসেও সে তার কর্মক্ষেত্রের বিচিত্র স্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পায় না।

কিন্তু এবার তার স্বপ্ন হয়ে ওঠে মধুময়। স্বপ্নলোকে এগিয়ে আসে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। মুখে তার মিষ্টি হাসি, চোখ দুটি তার স্বপ্নালু। তার কালো কেশগুচ্ছ পরিপাটি করে বাঁধা থাকে চূড়ো করে।

তরুণীটি এগিয়ে আসে তাকে সাহায্য করতে। সেই ঝোপ বা ল্যাম্পপোস্টটিতে সে যায় তার সঙ্গিনী হয়ে। জর্জী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তরুণীটিকে কিন্তু চিনতে তার অসুবিধা হয় না। এ তার শৈশবের সেই ছোট্ট এনিয়ান লাউসি। সে আজ হয়েছে মনমোহিনী—সে তার সঙ্গিনী।

সামাজিক দৃষ্টিতে ছেলে হিসাবে জর্জী আদর্শ। পাত্র হিসাবে সে লোভনীয় বটে।

জর্জীর বয়স হয়েছে। সে উপযুক্তও হয়েছে বটে। তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। জর্জীর পিতামাতার ইচ্ছা এবার তাকে বিয়ে দেবে।

সে খবর শুনে অনূঢ়া মেয়েদের পিতামাতা ছুটে এসে ভীড় জমায়। সঙ্গে আসে ভাবী কনের দল। যেন মৌমাছির দল ছুটে আসে মিষ্টি ফুলের গন্ধে। ফুলটি কিন্তু থাকে তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

সুন্দরীদের ভিতর কেউ জর্জীর মন স্পর্শ করতে পারে না। তারা সব ফিরে যায় আশাহত হয়ে।

জর্জী আপন মনে ঘুরে ফেরে। রাত্রিবেলায় চোখ বুঁজতেই তার সামনে এসে হাজির হয় তার প্রিয় বান্ধবী এনিয়ান লাউসি। তার সান্নিধ্যে জর্জীর জেগে ওঠে আপন সত্তা।

এমনি ভাবেই জর্জীর ছুটি কাটছিল।

সেদিন জর্জী শূন্য-মনে একাকী বসে আছে তার ঘরটিতে। হঠাৎ তার কানে ভেসে আসে একটি মধুর সঙ্গীতের টুকরো। গায়িকার কণ্ঠ তার কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হয়। সে হয়ে ওঠে উৎকর্ণ।

এবার জর্জীর অবাক হবার পালা।

জর্জী ভাবে, আশ্চর্য! এ সঙ্গীত যে তার স্বপ্নলোকেরই আলেখ্য।

জর্জীর মনে সন্দেহ জাগে, তবে কি এই দিনের আলোতে স্বপ্নলোকের বান্ধবী এলো আজ তার বাড়িতে!

সে আবার ভাবে, না এ অসম্ভব। অথচ জর্জী নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে পারে না। আবার সে কান পেতে শোনে।

—হ্যাঁ, ঠিক সেই কণ্ঠস্বর। তবে কি…।

এবার উত্তেজনায় তার হৃদয়ের স্পন্দন বুঝি স্তব্ধ হয়।

ধীর পায়ে জর্জী তার বিবশ দেহটিকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যায় সেই ঘরের দিকে যেখানে বসে মেয়েটি গান গাইছিল।

ঘরের দোরে পা দিয়ে জর্জী থমকে দাঁড়ায়। সে ভাবে, এও কি সম্ভব! এযে সেই মেয়ে—সেই চোখ, সেই মুখশ্রী। তার চুল বাঁধায়ও নেই কোন পার্থক্য। এতো তার পরম প্রিয় বান্ধবী—এনিয়ান লাউসি!

চকিতে ওদের পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হল। কারুর মুখে ভাষা নেই। শুধু তাদের দু'জনের মুখে ফুটে ওঠে খুশীর আভাস।

সেই সন্ধ্যায় শ্রীমতী মারিয়াম এবং জর্জী ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে যায়। চলতে চলতে জর্জী বলে,—

এনিয়ানলাউসি, আজ আর স্বপ্নলোক নয়। আমাদের গতি আজ সেই ল্যাম্পপোস্ট পর্যন্ত সীমিতও নয়। আমরা এগিয়ে যাবো সীমাহীন পথে। সেখানে থাকবে না কোন বাধা, না কোন বিভীষিকা। —শুধু তুমি আর আমি। কি বল?

জর্জীর উক্তি শুনে শ্রীমতী মারিয়াম কোন জবাব দেয় না। শুধু তার মুখে দুষ্টু হাসি খেলে যায়। ভাবখানা এই যেন, সে কিছু জানে না। অথচ মনে হয়, জর্জীর কথা শুনতে তার মনে পুলক জাগে।

জর্জীর অনুরোধে শ্রীমতী সেই গানটি গুণ গুণ করে গাইতে শুরু করে। গানটি উভয়ের মধ্যে কেমন এক মোহ ছড়ায়। ক্রমে গানটি ভাসিয়ে নিয়ে যায় দুজনের সংশয়, সব দ্বিধা।

এবার স্বপ্নলোককে পিছনে ফেলে তারা পা বাড়ায় বাস্তব জীবনের যাত্রার পথে।

লাজুক কণ্ঠে শ্রীমতী প্রশ্ন করে,—

'এ কি সত্যি?'

জর্জী দয়িতাকে জানায়,—

'এ স্বপ্ন নয়। তুমিই আমার এনিয়ানলাউসি'।

মারিয়াম তার সংশয় আর দ্বিধার আবরণ থেকে মুক্ত হয়। আনত মুখে সে আরও এগিয়ে আসে তার দয়িতের বুকের কাছে। মৃদু কণ্ঠে সে বলে,—

'আমি জানি তুমিই আমার সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ। আমি তোমার চিরসঙ্গিনী—প্রিয় বান্ধবী।'

এবার তাদের সত্যিকারের মিলনের আর কোন বাধা রইল না। তাদের বিয়ে হল। সকলেই খুশী।

বিয়ের মধুর আনন্দে ওদের দুজনের মন কানায় কানায় ভরে ওঠে। রাত্রের আধো আলো আধো অন্ধকারের সেই মোহময় পরিবেশে তারা পাশাপাশি শুয়ে আছে সুখ বাসর শয্যায়।

দু'জনেরই তনুমন আনন্দে শিহরণে পরিপূর্ণ। এই মোহময় আবেশে মুক্ত বিহঙ্গের মত দুটি মন ভেসে যায় যেন কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যে। কি ভাবছে তারা দুজন? তাদের ভাবনা কি একই সূত্রে গাঁথা?

ভাবছে কি দু'টি মন—এই স্বপ্নময়ী রাত্রির অবসানেও দিনের আলোয়—প্রতিদিনকার দেওয়া নেওয়ার জগতে, একে অন্যকে ঠিক এমনি মধুর ভাবে গ্রহণ করতে পারবে?

ঝড়ের পরে

সুইডিস সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা জেলমা লেগারলয়েফ্ (Selma Lagerlof)-এর 'স্টোরি অব গোস্টা বার্লিং' (The story of Gosta Berling), ১৮৯৪, উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার।

রবিবারের উপাসনার সময় এলেই উপদেষ্টা-যাজক গোস্টার গায়ে যেন জ্বর আসে। বিশেষ করে এই রবিবারটা তাকে আরও শঙ্কিত করে তোলে।

সে-রবিবারের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং বিশপ। ঐ অঞ্চলের উপাসক মণ্ডলী তাদের যাজক গোস্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে: সে একজন মদ্যপ, লম্পট। ধর্মের প্রতি তার কিছু মাত্র অনুরাগ নেই; অন্তরঙ্গ বন্ধু বাউণ্ডুলে বার্গ-এর সঙ্গে দিবারাত্রি মদের নেশায় চুর হয়ে থাকে। সম্ভব হলে হয়ত সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভাতেও মদের বোতল নিয়ে বসতে সে দ্বিধা করবে না।

অভিযোগ গুরুতর। তাই বিশপ নিজে ছুটে এসেছেন সে বিষয়ে তদন্ত করতে।

প্রার্থনার সময় হয়ে এলো। গীর্জায় আজ বসবার ঠাঁই নেই। বেদীর কাছে বসে আছেন সৌম্যদর্শন বিশপ, চোখে মুখে তাঁর গাম্ভীর্যের আভাস। যাজক গোস্টা ধীরে ধীরে উপাসনা বেদীর উপর উঠে দাঁড়ায়। সে উপাসনা-বেদীকে আজ গোস্টার মনে হয় যেন আসামীর কাঠগড়া।

তবুও গোস্টা আত্মস্থ হয়ে এক সময় সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করে। অপূর্ব ভাবগম্ভীর কণ্ঠে সে বলে চলে তার সুসমাচার। সে

বাণী হয় হৃদয়স্পর্শী, হয় অভূতপূর্ব। মনে হয় যেন গোস্টা কোন অলৌকিক শক্তির বলে সে-বাণী প্রচার করছে। চারিদিক স্তব্ধ, উপস্থিত জনতা মুগ্ধ।

উপাসনার শেষে বিশপ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উপাসক-মণ্ডলীকে জানালেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি প্রত্যক্ষভাবে শুনতে চাইলেন গোস্টার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ।

কিন্তু আশ্চর্য, কেউ সাড়া দিল না বিশপের আহ্বানে। তাদের একজনও এগিয়ে এল না কোন নালিশ নিয়ে।

উপস্থিত উপাসকবৃন্দের আচরণ দেখে গোস্টা হয় স্তম্ভিত। সে ভেবে পায় না এ কি করে সম্ভব হল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে গোস্টা তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে—সে দৃষ্টিতে বুঝিবা ফুটে ওঠে প্রেমের আভাস।

সেদিন সন্ধ্যায় গোস্টা বসে আছে একাকী তার ঘরে। নেশার তীব্র বাসনা আজ আর তাকে টেনে নেয় না মদের দোকানে। বসে বসে গোস্টা ভাবছিল সকাল বেলার উপাসক মণ্ডলীর অদ্ভুত আচরণের কথা। সেই সময় জানালা দিয়ে উঁকি দেয় তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বার্গ।

—আশ্চর্য! এখনও ঘরে বসে আছ? বসে বসে কি এত ভাবছ? ভাববার কিছু নেই। সেই সুখবরটি তোমাকে জানাবার জন্য আমি ছুটে আসছি। কথাগুলি বলতে বলতে বার্গ ঘরে ঢোকে।

গোস্টা তবুও নিরুত্তর।

ঘরে ঢুকে বার্গ গুছিয়ে বসে আরাম করে। ভাবখানা এই যে তোমার ঘাড় ভেঙ্গে শুধু নেশা করি না, দেখ প্রয়োজনে আজ তোমার কত বড় উপকার করে ফিরছি। বার্গ আবার বলতে শুরু করে—

বুঝলে, বেড়াবার নাম করে বিশপ আর তাঁর অনুচরদের সাদরে আমার গাড়ীতে তুলে নিয়েছিলাম। তারপর চড়াই থেকে উৎরাই আবার চড়াই শেষে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, ঐ চাষের জমির উপর দিয়ে ঘোড়া এমন জোরে ছুটিয়েছিলাম, ওদের প্রাণ হয়ে উঠেছিল

ওষ্ঠাগত। হোটেলের দোরে নাবিয়ে দেবার সময় বলে দিয়েছি আর যেন তোমাকে কোনদিন জ্বালাতে না আসে। জানলে, ব্যাটারা যা শিক্ষা পেয়েছে, জীবনে ভুলবে না। বার্গের কণ্ঠে আত্মপ্রসাদের সুর।

সে বিশপ বা তার কোন প্রতিনিধিকে সে অঞ্চলে আর আসতে হয়নি। বিশপ ফিরে যাবার দু' দিন পর গোস্টা পদচ্যুত হয়।

উপদেষ্টা-যাজক গোস্টা হল রাস্তার ভিখারী। তার দুর্গতির শেষ নেই। দারুণ শীতের দিনে এক টুকরো কম্বলেরও সম্বল নেই তার। তবুও কিন্তু সে নেশা ভুলতে পারে না।

কোন এক শীতের সন্ধ্যায় গোস্টার পরিচিত একটি ছোট্ট দুঃখী মেয়ে এক গাড়ী খাবার টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে সাহায্য করবার ভান করে গোস্টা এগিয়ে যায় মেয়েটির কাছে। সরল মেয়েটি তাকে বিশ্বাস করে গাড়ীটি গোস্টার দায়িত্বে ছেড়ে একটু দূরে যায় অন্য কোন কাজে।

মেয়েটি চোখের আড়াল হলে গোস্টার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে যায়। সস্তা এক বোতল মদের বিনিময়ে অতগুলি খাবার সহ গাড়ীটি বেচে দিয়ে গোস্টা সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়।

নেশা ছুটে যেতে গোস্টা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। মহিলাটির চোখে অনুকম্পার ছোঁয়াচ।

এই মহিলাটি আর কেউ নয়—শ্রীমতী মার্গারেটা। তিনি শুধু ইকেবির জমিদারির কর্ত্রী নন আরও ছ'টা জমিদারি তাঁর অধীনে। গোড়াতে অ্যালটিনগারের বাগ্‌দত্তা ছিলেন তিনি। ভাগ্যের সন্ধানে অ্যালটিনগারকে দূরে যেতে হয়েছিল। যাবার আগে তিনি মার্গারেটাকে অনুরোধ করেছিলেন মাত্র পাঁচ বছরের জন্য অপেক্ষা করতে। মার্গারেটা দয়িতকে জানিয়েছিলেন তাঁর সম্মতি। কিন্তু

তাঁর মা-বাপ অতদিন অপেক্ষা করতে রাজী হননি। মেয়ের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন জনৈক মেজরের সঙ্গে।

অ্যালটিনগার বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে ফিরে এসে জানলেন তাঁর প্রেয়সী বিবাহিতা। মার্গারেটা কিন্তু অ্যালটিনগারের প্রেম ভোলেন নি।

তিনি অ্যালটিনগার-এর রক্ষিতা হতে দ্বিধা করেন না। কিছুদিন পর অ্যালটিনগার মারা যান। কিন্তু মারা যাবার আগে তাঁর সব সম্পত্তি লোক-দেখানো হিসাবে লিখে দিয়ে যান মেজরের নামে; আসলে দিয়ে যান মার্গারেটাকে।

গোস্টার দুর্দশা দেখে মার্গারেটার কেমন মায়া হয়। তিনি তাকে সাহায্যের প্রস্তাব করেন। গোস্টা তাঁর সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দেয়। অবশেষে মার্গারেটার পীড়াপীড়িতে গোস্টা তাঁর আশ্রিতদের দলভুক্ত হতে রাজী হয়।

মার্গারেটার দৌলতে কুখ্যাত আশ্রিতদের দিন ভালই কাটে। তারা সদা উল্লসিত। গোস্টাও তাদের একজন হোল। অন্তরঙ্গ বন্ধু বার্গও এখানে এসে জুটেছে কোন্ ফাঁকে, তার আগে।

ক্রীস্টমাসের সন্ধ্যায় তাদের জন্য একটি বড় রকমের ভোজের আয়োজন হয়, তাতে যথেষ্ট পানীয়ের ব্যবস্থাও থাকে। ক্রমে ওদের এই আনন্দোৎসব জমে ওঠে।

দলের মধ্যে সীনত্রাম ছিল সেরা বদমাইশ। সে নিজেকে মনে করত শয়তানের যোগ্য চেলা। তার ইয়াররা যখন নেশায় চুর হয়ে উঠেছে সেই সময় সীনত্রাম শয়তানের বেশে এসে তাদের মাঝে দাঁড়াল। সে নিজের পরিচয় দিল শয়তান বলে তারপর তাদের জানাল সে মার্গারেটার সঙ্গে আবার নতুন করে চুক্তি করতে যাচ্ছে। ভাবটা যেন তারই জন্যে মার্গারেটার এই অতুল ঐশ্বর্য আর প্রতাপ।

শয়তানের কথা শুনে মার্গারেটার ক্ষমতা আর তার ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের মনে প্রশ্ন জাগে। তাই নাকি?

শয়তান তাদের মনের এই দ্বন্দ্বের সুযোগ নেয়। সে বলে উঠে—

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমাদের সন্দেহ মিথ্যা নয়। আসলে তোমরাই হচ্ছ মার্গারেটার ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের উৎস। তার এই বিপুল ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মার্গারেটাকে প্রতি বছর উৎসর্গ করতে হয় শয়তানের কাছে তোমাদের একজনের আত্মা। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি যা বলছি শোন—

'মনে রেখো, এবার থেকে শুধু এই ইকাবির নয় অন্যান্য ছ'টা জমিদারিরও আসল মালিক তোমরা; তোমরা সেই ভাবে চলবে। আমি তোমাদের নেতা। ভয় নেই, এ বছর থেকে তোমরা আর কেউ মরবে না। তোমরা মুক্ত, মার্গারেটার আশ্রিত নও।'

শয়তানের উক্তি শুনে তাদের নেশা ছুটে যায়। বিভ্রান্ত আশ্রিত-দল এক সঙ্গে বলে উঠে—তথাস্তু।

পরের দিন উৎসবের সময় বার্গ এমন বেলেল্লাপনা শুরু করে যে মার্গারেটা উত্তক্ত হয়ে তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করতে বাধ্য হন।

সে আদেশ শুনে বার্গ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে চীৎকার করে বলে ওঠে—স্বামী বর্তমানে অ্যালটিনগারের যে রক্ষিতা হয়েছিল তার মুখে এত বড় কথা!

বার্গের উক্তি শুনে উপস্থিত জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মেজরের মুখ হয় আনত। মার্গারেটা কিন্তু গর্বের সঙ্গে সে অভিযোগ স্বীকার করেন।

মার্গারেটার স্বীকারোক্তি শুনে মেজরের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। তিনি মার্গারেটাকে প্রকাশ্যে ত্যাগ করেন। মার্গারেটা

সাহায্যের জন্য আশ্রিতদের দিকে তাকালে তারা সকলে একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাধ্য হয়ে মার্গারেটা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

এতদিনের রাজরাণী মার্গারেটা হলেন ভিখারিণী।

এই ঘটনার পর মনের অশান্তিতে মেজর ইকাবি ছেড়ে চলে যান তাঁর নিজের পুরানো খামার বাড়ীতে। ফলে, সেই কুখ্যাত আশ্রিত-দের স্বপ্ন সফল হয়। তারা সত্যি সত্যিই ইকাবির সেই বিশাল রাজপুরী আর তার জমিদারির কর্তা হয়ে বসে। বলা বাহুল্য, ওদের দিন কাটে পরম আনন্দে।

অ্যানা সেই অঞ্চলের সুন্দরী এবং ধনী মেয়ে। সে ছিল ফারডি-নাণ্ড-এর বাগ্‌দত্তা। ফারডিনাণ্ড একদিন ছুটে এসে মোড়ল গোস্টাকে জানায়, অ্যানা তার বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে কোন এক বুড়ো টেকো ধনীর গলায় মালা পরাতে যাচ্ছে। সে গোস্টার সাহায্য প্রার্থনা করে।

গোস্টা ভীরু ফারডিনাণ্ড-কে অভয় দেয়।

খবর নিয়ে গোস্টা জানল, অ্যানা তখন নাচের আসরে স্ফূর্তি করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গেল সেই আসরে। আশ্চর্য, অ্যানার কাছে এগিয়ে যেতেই সে গোস্টার ছ'গালে কষে চড় লাগায়। গোস্টা হতবাক্। কিন্তু গোস্টার বুঝতে দেরী হয় না—এ অ্যানার রাগ নয়, গোস্টার প্রতি তার গভীর অনুরাগের বিকাশ, তার অভিমানের ফল।

চড় খেয়ে গোস্টা ভুলে যায় তার কর্তব্য, ফারডিনাণ্ডের কাছে তার প্রতিশ্রুতির কথা। অ্যানাকে সঙ্গে নিয়ে সে ইকাবির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কিন্তু রাস্তায় এক নেকড়ে তাদের পিছু নেয়। আত্মরক্ষার জন্য মাঝরাস্তায় তাকে বাধ্য হয়ে ফারডিনাণ্ডের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হয়। পরোক্ষে গোস্টা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

ফারডিনাণ্ডের বরাত মন্দ। ছ'দিন বাদে সে হঠাৎ মারা যায়।

তার মৃতদেহটিকে বিয়ে করে অ্যানা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। গোস্টার প্রতি অ্যানার গভীর ভালবাসার কথা কেউ বুঝতে পারে না।

ক'দিন বাদে ইকেবিতে একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হয়। সে উৎসবে একটি নাটক পরিবেশনেরও ব্যবস্থা থাকে। নাটকের প্রেমিক-প্রেমিকার ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে গোস্টা এবং মেরিয়ানী। অভিনয় হয় রসোত্তীর্ণ। নাটকের শেষেও সে রসের রেশ থেকে যায় নায়িকার মনে। সে তার প্রেমিকের প্রেমে মুগ্ধ, বাইরে এসেও তাকে হাতছাড়া করতে চায় না। এক সময় মেরিয়ানী গোস্টাকে চুমু খেলো। কিন্তু তাতে তার তৃষ্ণা যায় বেড়ে। মেরিয়ানী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গোস্টার দিকে।

নাটকের পর জুয়াখেলার আয়োজন হয়। সে খেলায় মেরিয়ানীর বাবা তার সব টাকা হেরে যায় গোস্টার কাছে। বাবা অসহায় বোধ করে। তার অবস্থা বুঝে কে যেন ঠাট্টা করে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করে গোস্টার সঙ্গে।

সে খুশীমনে সম্মতি জানায়। কিন্তু খানিক বাদে সে গোস্টার স্বরূপ জেনে চটে লাল হয়। মেয়ের রুচিকে বাবা তীব্র ভাবে ধিক্কার করে।

উৎসব শেষে মেরিয়ানীকে দেখা গেল অতিথিশালার বন্ধ ঘরে; তার বাবা তাকে সেখানে বন্ধ করে রেখেছে। সে অসাড় হয়ে পড়ে আছে, মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে মার্গারেটা কি করে সেখানে ফিরে এসেছিলেন।

মেরিয়ানী শুনতে পেল, মার্গারেটা একটা হট্টগোল সৃষ্টি করবার ষড়যন্ত্র করছেন। উদ্দেশ্য, সব আশ্রিতদের সেই রাত্রে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের কবল থেকে ইকেবি পুনরুদ্ধার করা।

গোস্টা এবং অন্যান্য আশ্রিতদের আসন্ন বিপদের কথা জেনে মেরিয়ানী শিউরে ওঠে। সেই গভীর রাতে, বাড়ীর পিছন দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের লোকের সাহায্য নিয়ে মার্গারেটার ষড়যন্ত্র মেরিয়ানী নষ্ট করে দেয়।

ক'দিন পরে বসন্ত রোগের ফলে সুন্দরী মেরিয়ানীর চেহারা হয় কুশ্রী। সে চেহারা নিয়ে প্রেমিক গোস্টার সামনে যেতে তার মন সায় দেয় না। তাই সে তার বাবার সঙ্গে ফিরে যায় গোস্টার অজ্ঞাতসারে। গোস্টাও তাকে ক্রমে ভুলে যায়।

কিছুদিন পরের কথা। কোন একটি নাচের আসরে আসে এলিজাবেথ নামে এক সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলা, সঙ্গে তার বোকা স্বামী। গোস্টা মহিলাটির প্রতি আকর্ষণবোধ করে এগিয়ে যায়—

মাদাম, আপনার সঙ্গে নাচবার আমার সৌভাগ্য হবে কি ?

গোস্টার প্রস্তাব শুনে এলিজাবেথ তার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে আপত্তি জানায়। সে প্রত্যাখ্যানে গোস্টা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর গোস্টার ইঙ্গিতে তার চেলারা মহিলাটিকে নিয়ে সে-আসর থেকে উধাও হয়ে যায়। আশ্চর্য, স্বামীটি কিন্তু গোস্টাকে সমর্থন করে।

ক'দিন পরে এলিজাবেথ সেখান থেকে কোন এক গাঁয়ে গিয়ে তার লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুক্তি পায়। ইতিমধ্যে তার সুযোগ্য স্বামীটি আইনসঙ্গত ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ করে।

এ খবর জানবার কিছুদিন বাদে এলিজাবেথের কোলে এল একটি সন্তান। কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের কথা এলিজাবেথ ভাবতে পারে না। সে নিজেকে অসহায় বোধ করে।

তাই নিরুপায় হয়ে সে আসে গোস্টার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

খুশী মনে গোস্টা তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ওরা পরস্পর পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গনে ছেড়ে দেয়।

এলিজাবেথের সান্নিধ্যে এসে গোস্টার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। শুধু তাই নয়, এবার তাদের সকলের মিলিত চেষ্টা ও যত্নে ইকাবির চেহারা দু'দিনেই যায় পাল্টে, ফিরে আসে লক্ষ্মীশ্রী।

ইতিমধ্যে স্বামী মারা গেলে মার্গারেটা ফিরে আসেন শ্রীমণ্ডিত ইকাবিতে তার অধীশ্বরী হয়ে।

গোস্টা এলিজাবেথকে সঙ্গে নিয়ে ইকাবির ঐশ্বর্য ছেড়ে চলে যায় অনাড়ম্বর কুটীর জীবনে। সেই পল্লীজীবনের শান্ত পরিবেশে বাকী জীবন ওরা দু'জনে সঁপে দেয় আর্তের সেবায়।

গরবিণী

জর্মন সাহিত্যিক পল ফ্যান হেইস (Paul Von Heyse)-এর 'লে অ্যারবিটা' (L' Arrabita), ১৮৫৫, উপন্যাসের কাহিনী।

ভোরের আলো তখনও ফুটে ওঠে নি। ভিসুভিআস আগ্নেয়গিরি থেকে সুদূর নেপলস্ পর্যন্ত কে যেন ধূসর কুয়াশার একখানি চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

অন্ধকারেই জেলেরা মাছ ধরতে বেরিয়ে গিয়েছে।

বুড়োবুড়ির দল—যারা এখন মাছ ধরতে অক্ষম, তাদের কেউ বসে বসে জাল বুনছে, কেউবা জীর্ণ জাল মেরামত করতে ব্যস্ত।

ছোট্ট ছেলে মেয়ে সব এরই মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে।

সেই উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলি তাদের ঠাকুমা-ঠানদিদের গা ঘেঁসে বসে আছে এদিক ওদিক।

বসে আছে বটে কিন্তু তারা চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। প্রশ্ন-বাণের জাল বুনে সেই বুড়িদের অস্থির করে তুলছে তারা।

কে একজন বলে উঠল—'প্রণাম হই ঠাকুর।'

প্রশান্ত মুখে পাদ্রী এগিয়ে যান সাগরের খেয়াঘাটের দিকে। যাবেন তিনি সাগরের ওপারে—কেপরী শহরে।

চলার পথে ছেলেবুড়োরা পাদ্রীকে জানায় শ্রদ্ধা। স্মিতমুখে তিনি তাদের সকলকে জানান শুভেচ্ছা, ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

ধীরে ধীরে পাদ্রী খেয়ানৌকায় উঠে গুছিয়ে বসলেন। তার আগেই সেখানে হাজির হয়েছে আরও ক'জন যাত্রী।

কাণ্ডারীকে উদ্দেশ্য করে পাদ্রী বলেন,—'আর দেরী করছ কেন? রোদ চড়া হয়ে ওঠবার আগেই ওপারে পৌঁছুতে চেষ্টা কর হে বাপু।'

এবার অ্যানটোনিও উঠে গিয়ে তার প্রকাণ্ড বৈঠাটি হাতে তুলে নিল। নৌকাটি ছাড়তে গিয়ে কিন্তু সে থেমে যায়।

সে লক্ষ্য করল, দূরে—উপকূলে সুরেণ্টোর পাহাড়ী চড়াই রাস্তাটি দিয়ে যেন একটি মেয়ে ছুটে আস্‌ছে; মেয়েটি রুমাল তুলে ইশারায় কি জানাতেও চেষ্টা করছে।

অ্যানটোনিও-র মনে হল যেন মেয়েটি ওপারে যেতে চায়। তাই নৌকাটি ছাড়তে গিয়ে সে ইতস্ততঃ করে।

পাদ্রী প্রশ্ন করলেন—'কি হ'ল গো, ছাড়ছ না কেন?'

…'মনে হচ্ছে একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে কেপরীতে যাবার জন্য ছুটে আসছে।'

কাণ্ডারীর কথা শেষ হ'ল না।

অ্যানটোনিওর পিছন দিকে মেয়েটির চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাদ্রী উল্লাসে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—'লরেলা!'

নাম শুনে অ্যানটোনিও সচকিত হয়ে ওঠে।

মেয়েটির বেশবাসে দারিদ্র্যের ছাপ। তবুও তা তার ব্যক্তিত্ব বা চেহারার বৈশিষ্ট্যকে ম্লান করতে পারে নি। তার চোখেমুখে আত্ম-প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা।

মেয়েটি আরও কাছে এগিয়ে আসতে আশ পাশ থেকে ক'টি চেঙ্গড়া ছেলে বলে ওঠে—'ঐ আসে দেমাকী মেয়েঃ সুপ্রভাত দেমাকী।'

হঠাৎ তাদের খেয়াল হয় পাদ্রীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের তারা সামলে নিয়ে চুপ করে যায়।

খেয়া নৌকাটির কাছে এগিয়ে আসতে পাদ্রী লরেলাকে জানালেন শুভেচ্ছা, জিজ্ঞাসা করেন তার কুশলবার্তা। তারপর প্রশ্ন করেন সেও কেপরীতে যাবে কিনা।

পাদ্রীকে উদ্দেশ্য করে লরেলা বলে—

'আপনি যদি দয়া করেন। পারের কড়ি সঙ্গে যা আছে, তা অতি সামান্য।'

—'যার নৌকা তাকেই তুমি বল।'

পাদ্রীর কথা শুনেও লরেলা কিন্তু অ্যানটোনিওকে অনুরোধ করে না। তার অস্তিত্ব যেন সে গ্রাহ্য করতে চায় না।

অ্যানটোনিও হাত থেকে বৈঠাটি রেখে তার কমলালেবুর ঝুড়ি ক'টি সরিয়ে একটু জায়গা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মুখে বিড়বিড় করে বলতে থাকে—'জানি, তোমার কাছে ঐ সামান্য কড়ির মূল্য কত বড়; আমার চেয়ে তোমার সে কড়ির প্রয়োজন কত বেশী।'

অ্যানটোনিওর সে কথাগুলি আর কেউ শুনল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। তবে যাকে উদ্দেশ করে বলা সে ঠিকই শুনেছে।

একটু আড় চোখে অ্যানটোনিওর দিকে তাকিয়ে নিয়ে লরেলা বলল—'আমি বিনা প্রয়োজনে যাচ্ছি না।'

পাদ্রী বললেন, 'নৌকায় উঠে এস লরেলা। তোমার ঐ সামান্য পারের কড়ি দিয়ে সহৃদয় পাটনি বড় মানুষ হতে চায় না।'

পাদ্রী হাত বাড়িয়ে দিয়ে লরেলাকে নৌকায় উঠতে সাহায্য করেন।

—'ঐ দেখ, অ্যানটোনিও তোমার বসবার জন্য তার জামাটি বিছিয়ে দিয়ে কেমন নরম আসন করে দিয়েছে। কি জান, যুবকরা তোমাদের মত সুন্দরীদের বেলায় একটু উদার হয়। তখন আমাদের মত পাদ্রীরাও হয় অপাঙক্তেয়।' ঐ কথা বলে পাদ্রী হা হা করে হেসে ওঠেন।

পাদ্রীর উক্তি শুনে লরেলার মুখখানি রাঙা হয়ে ওঠে। আড় চোখে সে অ্যানটোনিওকে আর একবার দেখে নেয়।

লরেলা নৌকায় উঠে অ্যানটোনিওর পাতা আসনটি সরিয়ে দিয়ে পাদ্রীর পাশে বসে পড়ে।

ততক্ষণে অ্যানটোনিও সেই লম্বা বৈঠাটি দিয়ে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে নৌকাটি ছেড়ে দেয়। নৌকাটি সমুদ্রের দিকে ছুটল।

পাদ্রী প্রশ্ন করেন,—'তোমার ঐ পুঁটলির ভিতর কি আছে, লরেলা?'

লরেলা ঃ 'আছে কিছু পশম, সূতো আর এক টুকরো রুটি— 'খাবার জন্য। পশম আর সূতো বিক্রীর জন্য। এই পশম দিয়ে তৈরী হবে রিবন।'

'বিক্রী কেন, তুমি নিজেও তো রিবন তৈরী করতে ?'

'হাঁ, এককালে করতাম বৈকি ? কিন্তু রুগ্ন মার অবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ হবার পর থেকে তা আর সম্ভব হয় না। তাছাড়া তাঁত কিনবার মত আমাদের পয়সাই বা কোথায় ?'

তার মার অবস্থা শুনে পাদ্রী বেদনা বোধ করেন। তাঁর আরোগ্যের জন্য পাদ্রী লরেলাকে আরও প্রার্থনা করতে উপদেশ দেন।

খানিকক্ষণ মৌন থেকে পাদ্রী লরেলাকে আবার প্রশ্ন করেন—

—'আচ্ছা, ঐ ছেলেগুলি তোমাকে ওরকম বিদঘুটে সম্বোধন করছিল কেন ?'

এবার লরেলার চোখ দুটি যেন জ্বলে ওঠে। সে জানাল—'কি জানি কেন ওরা আমাকে দেখলেই এরকম বিশ্রীভাবে ঠাট্টা করে। তবে আমার মনে হয়—ওদের ঠাট্টা তামাসায় আমি যোগ দিই না বলেই ওরা অমন করে।'

দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ কেটে যায়। সূর্য প্রায় মাঝ আকাশে এসে পড়ে। অ্যানটোনিও আপন মনে বেয়ে চলেছে। তার সারা দেহ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে।

পাদ্রী লরেলাকে জিজ্ঞাসা করেন—

'আচ্ছা সেই শিল্পী ছেলেটির খবর কি ? যে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ?'

'জানি না।'

'সে কি কথা ?'

'তার বিয়ের জন্য মেয়ের অভাব নেই।'

'ছিঃ, ওরকম ভাবে কথা বলে না। ছেলেটি ভাল ছিল। তোমাকে সে ভালবাসত।'

পাদ্রীর এই ধমকের জন্য লরেলা প্রস্তুত ছিল না। এবার সে বলে ফেলল ঃ

'আমি বিয়ে করব না।'

'তবে তুমি কি সন্ন্যাসিনী ঠাকরুণ হবে?'

'না, তা নয়।'

'তবে?'

আড়চোখে লরেলা অ্যানটোনিওকে একবার দেখে নেয়। অ্যানটোনিও তখন ঘাড় গুঁজে একমনে বেয়ে চলেছে।

লরেলা পাদ্রীর কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। তারপর বলতে সুরু করে—

'আপনি হয়ত জানেন না। আমার মার এই অসুস্থতার জন্য দায়ী একমাত্র আমার স্বর্গত পিতা। মার ওপর তিনি যে নির্মম অত্যাচার করেছেন তা আমি ভুলতে পারিনি। কোনদিন ভুলতে পারব না। এখনও মার সারা দেহে কালশিরে। দাগগুলো দগ্ দগ্ করছে। দরকারের সময় সেই বাবাকেই দেখেছি নির্লজ্জের মত মাকে সোহাগ করতে।'

একটু দম নিয়ে লরেলা আবার বলে—

'সেই থেকে বিয়ের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে; পুরুষের ভালবাসাকে মনে হয় ভণ্ডামি।'

'তোমার পিতার ঐ নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। কিন্তু একজন পুরুষের অত্যাচার দেখে দুনিয়ার সব পুরুষের প্রেমকে সন্দেহ করলে তুমি ভুল করবে। ভবিষ্যতে তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে। তাছাড়া তোমার ভবিষ্যৎ আছে। আছে তোমার মাকে দেখাশুনা করবার প্রয়োজন। বিয়ে করলে তোমার স্বামী তোমাদের দেখাশুনা করতে পারত, পারত সাহায্য করতে। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা কে জানে……।'

পাদ্রী আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই সময় নৌকাটি কেপরীর কূলে এসে লাগল।

কূলে এলো বটে কিন্তু নৌকাটি একদম শুকনো জমিতে পৌঁছল না।

অ্যানটোনিও ঝপ করে সেই অল্প জলে লাফিয়ে পড়ল। তার পর পাদ্রীকে কাঁধে করে পৌঁছে দিল পাড়ে।

লরেলা কিন্তু অ্যানটোনিওকে সে সুযোগ দিল না।

পাদ্রীকে কূলে পৌঁছে দিয়ে অ্যানটোনিও ফিরে আসবার আগেই সে তার পুঁটলিটি হাতে নিয়ে স্কার্টটি একটু গুটিয়ে উপরে তুলে সেই জলকাদার ভিতর লাফিয়ে পড়ে পাড়ে গিয়ে হাজির হল।

পাদ্রী ঃ 'লরেলা, আমার হয়ত আজ ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তোমার মা অসুস্থ। তুমি কিন্তু সন্ধ্যার আগেই ফিরে যেও—আমার জন্য অপেক্ষা করো না।'

'চেষ্টা করব।'—স্কার্ট ঝাড়তে ঝাড়তে লরেলা আপন মনে বলল।

—'আর কেউ ফিরে যাক বা না যাক আমাকে ফিরতেই হবে। অবশ্য অন্য একজন যাত্রীর জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।' নির্লিপ্ত কণ্ঠে অ্যানটোনিও বলে যায়। যেন লরেলার জন্য তার মাথা ব্যথা নেই।

পাদ্রী এগিয়ে যান। তাঁর পিছনে লরেলাও চলতে শুরু করে।

অ্যানটোনিও লরেলার গতিপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পথের বাঁকে এসে লরেলা হঠাৎ পিছন দিকে তাকাল। চোখো-চোখি হতে দুজনেই লজ্জায় পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের ভাবখানা হল যেন তারা কি একটা অপরাধ করে ফেলেছে।

লরেলা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাঁক ঘুরে যায়।

অ্যানটোনিও খেয়া ঘাটের কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে বসে বিশ্রাম করতে থাকে।

তাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে পাশের জেলে-বস্তির একজন স্ত্রীলোক এগিয়ে আসে অ্যানটোনিওর দিকে।

স্ত্রীলোকটি ক্লান্ত অ্যানটোনিওর হাতে তুলে দেয় পানীয়। তরল কণ্ঠে সে তাকে এটা সেটা প্রশ্ন করে। তার কণ্ঠে ফুটে ওঠে সহানুভূতির সুর।

কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত অ্যানটোনিও তবুও স্বস্তি পায় না। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সেই রাস্তার বাঁকটির দিকে একবার করে সে উঁকি দিয়ে আসে। কখনও এদিক ওদিক তার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

'তুমি বার বার উঠে কি দেখছো বলতো'।—স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন করে।

'একটি যাত্রী আসবার কথা আছে কিনা, তাই।'

'তা অত দেখবার কি আছে? এলে সে তো এখানেই আসবে।'

'বাড়িতে তার অসুস্থ মা রয়েছেন। সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে।'

'সে ভাবনা তো যাত্রীর, তোমার নয়।'

স্ত্রীলোকটি অ্যানটোনিওর মনের হদিস পায় না।

এমন সময় দূরে একটি অস্পষ্ট চেহারা ফুটে উঠতেই অ্যানটোনিও লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। সে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। মেয়েটির চেহারা একটু স্পষ্ট হয়ে উঠতে তার মনটা খুশী হয়। সে তার জায়গায় ফিরে এসে বসে।

স্ত্রীলোকটি আর এক গ্লাস পানীয় নিয়ে তাকে পীড়াপীড়ি করে। কিন্তু তাতে অ্যানটোনিওর আর স্পৃহা থাকে না।

লরেলা খেয়াঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে লরেলা এদিক ওদিক তাকায় অন্য যাত্রীর সন্ধানে।

এমন সময় অ্যানটোনিও পিছন থেকে দ্রুত পায়ে লরেলাকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে সরাসরি নৌকায় তুলে দেয়। লরেলা কোন আপত্তি জানাবার অবকাশও পায় না।

এবার নৌকাটিকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সে নিজে উঠে পড়ে। নৌকাটি দ্রুতবেগে সমুদ্রের গভীর জলে গিয়ে পড়ে।

নৌকায় উঠে লরেলা আরও গম্ভীর হল। বসল সে অপর প্রান্তে; অনেকটা অ্যানটোনিওর দিকে পিছন ফিরে। তার ভাব যেন সে কোন অপরিচিত লোকের নৌকায় অনিচ্ছায় উঠেছে।

নৌকাটি তরতর করে এগিয়ে চলে।

সূর্যের প্রখরতা তখনও কমেনি। লরেলা তার পুঁটলি খুলে রুমালটি বের করে মাথায় জড়ায়। তারপর রুটিটি নিয়ে খেতে বসে।

ওর খাওয়া দেখে অ্যানটোনিও বুঝতে পারল, বেচারীর সারাদিনে পেটে কিছু পড়েনি। সে বেদনা বোধ করে।

অ্যানটোনিও ছ'টি কমলা লেবু লরেলার দিকে বাড়িয়ে দেয়—

'এই নাও, রুটির সঙ্গে খাও। মনে করোনা এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে।'

'আমার প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে এমনি খেয়ে নাও; গরমের ভিতর ভালই লাগবে।'

'প্রয়োজন নেই।'

'তবে তোমার রুগ্ন মার জন্যে নিয়ে যাও। তাঁকে বলো— আমি দিয়েছি।'

'তিনি তোমাকে চেনেন না।'

'তুমি পরিচয় দিও।'

'আমিও তোমাকে চিনিনা।'

কথাটা অ্যানটোনিওকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করে। সে ভাবে, এত দম্ভ, এত অবহেলা! তার মনে পড়ে যায় ঠিক এমনি ভাবে সে তাকে আগেও ছ' একবার অস্বীকার করেছে।

না, এ অসহ্য। অ্যানটোনিওর মাথায় খুন চেপে যায়। আজ সে একটা বোঝাপড়া করবে লরেলার সঙ্গে।

সমুদ্র শান্ত, নিস্তরঙ্গ। হাতের বৈঠাটি সে নৌকায় তুলে রাখল। তারপর উঠে গিয়ে লরেলার মুখোমুখি দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার সমস্ত দেহ কাঁপছে।

'বল কি বলতে চাও? তুমি আমাকে চেনো না? এতদিনের দেখাশুনা সব মিথ্যে? তোমাকে পাবার জন্য আমার এই আকুলতা— তাও মিথ্যে?'

লরেলার দৃষ্টি নির্ভীক। দৃঢ়কণ্ঠে সে জানায়—

'বলবার কি আছে? তুমি অনর্থক মাথা গরম করছো। আমাকে পাবার আশা তোমার কি করে হল জানি না! আমি তোমাকে বিয়ে করব না; তোমাকে কেন, কোন পুরুষকেই না, জেনো।'

'এ শুধু তোমার এড়িয়ে যাবার কথা। ভুলে যেওনা—এখন তুমি আমার মুঠোর মধ্যে। ইহলোকে তোমাকে না পাই তো এই মুহূর্তে সমুদ্রের কোলে সহমরণে তোমাকে পেতে পারি।'

'জানি, তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেলতে পারো। তার জন্য আমি একটুও ভীত নই।'

লরেলার উক্তি শুনে অ্যানটোনিও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। দু' পা পিছিয়ে গিয়ে সে লাফিয়ে ওঠে। নৌকাটি দুলে ওঠে। আবার এগিয়ে গিয়ে সে লরেলাকে এক টানে তার বজ্রকঠিন দুই বাহুর মধ্যে তুলে নেয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা বোধে অ্যানটোনিও তার ডান হাতখানি সরিয়ে নিল। লরেলা মারাত্মক ভাবে তার হাতখানা কামড়ে দিয়েছে। সেই গভীর ক্ষত থেকে অবিরাম ধারায় রক্ত বেরিয়ে আসে।

লরেলা অ্যানটোনিওর বাহুবন্ধন থেকে এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে—

'ভেবেছিলে আমি তোমার হাতের মুঠোর ভিতর? এতই কি সহজ?'

এই বলে সে সমুদ্রের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে বুঝি ডুবে গেল।

খানিক বাদেই লরেলা ভেসে উঠে নিপুণ ভাবে সাঁতার কাটতে সুরু করে।

এবার অ্যানটোনিওর সম্বিত ফিরে আসে। তার নজরে পড়ল—হাতের ক্ষতের রক্ত ধারায় নৌকার খোল ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। লরেলার নিরাপত্তার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বিভ্রান্ত অ্যানটোনিও চীৎকার করতে থাকে—

'লরেলা, বিশ্বাস কর—আমার তখন জ্ঞান ছিল না। আমি আমার অপরাধের জন্য ক্ষমাও চাইছি না। যীশুর নামে, ঈশ্বরের নামে তুমি নৌকায় উঠে এস। অসম্ভব, ওপারে তুমি পৌঁছতে পারবে না। তা অনেক দূর। তোমার মার কথা ভেবে দেখো। লক্ষ্মীটি, উঠে এস। আমি তোমাকে আর একটুও বিরক্ত করব না—তুমি না হয় জীবনে আমার আর মুখদর্শন নাই করলে। তুমি উঠে এস……'

লরেলা ওপার দেখবার একবার বৃথা চেষ্টা করল; তারপর কি যেন একটু ভাবল। এবার সে এক ঝটকায় নৌকায় উঠে তার আগেকার জায়গাটিতে বসে পড়ল।

হাতের যন্ত্রণা তীব্র। কিন্তু মুখে এতটুকুও প্রকাশ নেই। মাথা গুঁজে একমনে অ্যানটোনিও বেয়ে চলে।

হঠাৎ নৌকার খোলের জমাট রক্তের ওপর নজর পড়তে লরেলা আঁৎকে ওঠে। এবার তার দৃষ্টি পড়ে অ্যানটোনিওর ক্ষত হাতটির ওপর—ক্ষত জায়গাটি থেকে তখনও অবিরাম রক্ত বেরুচ্ছিল। লরেলার মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

তড়িৎবেগে লরেলা ছুটে গিয়ে অ্যানটোনিওর আহত হাতটি

আলতো করে কোলে তুলে নেয়। ক্ষতের গভীরতা উপলব্ধি করে সে হয় দারুণ মর্মাহত। অনুশোচনায় তার মন ভরে ওঠে। তার মাথার রুমালটি দিয়ে লরেলা নীরবে ঐ ক্ষত জায়গাটির ওপর নিপুণ ভাবে বেঁধে দেয়।

নৌকা এগিয়ে যায়। উভয়ের কারুর মুখে ভাষা নেই। বুঝি তারা দৃষ্টিও হারিয়েছে। দু'জনের মুখেই ফুটে উঠেছে গভীর অনুশোচনার ব্যঞ্জনা।

অ্যানটোনিওর বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে আর একটি বৈঠা তুলে নিয়ে লরেলা এবার বাইতে শুরু করে।

শান্ত সমুদ্রের বুক বেয়ে নৌকাটি এক সময় ফিরে এল মেরিনার কূলে। তবুও কিন্তু তারা দু'জনেই থাকে নীরব।

লরেলা উঠে দাঁড়িয়ে তার স্কার্টটি ঝাড়ল তারপর এক লাফ দিয়ে পারে নামল।

এক বুড়ি সেখানে বসে তখনও জাল বুনছিল। নৌকায় জমাট রক্ত আর অ্যানটোনিওর পট্টি বাঁধা হাত দেখে সে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

অ্যানটোনিও তাকে আশ্বস্ত করে: 'ও এমন কিছু হয়নি। নৌকার পেরেকে একটু কেটে গেছল—কালই ঠিক হয়ে যাবে।'

তার উক্তি শুনে লরেলা আরও সঙ্কুচিত হয়। সে অ্যানটোনিওর দিকে তাকাতে পারে না। আনতমুখে কোন প্রকারে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লরেলা অদৃশ্য হয়ে যায়।

অশান্ত মন তায় হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। নির্জন ঘরটিতে ফিরে এসে অ্যানটোনিও খানিকক্ষণ পায়চারি করে। তারপর পট্টিটি খুলে ক্ষত জায়গাটি পরিষ্কার করতে বসে।

বাঁধন মুক্ত হতে ক্ষতটির থেকে আবার বেগে রক্ত বেরিয়ে আসতে শুরু করে। বাঁ হাত এবং দাঁতের সাহায্যে যাহোক করে অ্যানটোনিও একটি নতুন পট্টি বেঁধে দিল ক্ষতটির ওপর।

এবার সে বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ল। তার চোখে ঘুম আসে না। কত কথাই না এক সঙ্গে তার মনে ভীড় করে আসে।

দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ হতে তার তন্দ্রা ছুটে যায়। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটি তুলতে তার ইচ্ছা করে না।

অগত্যা তাকে উঠে গিয়ে দরজাটি খুলে দিতে হয়। দরজা খুলতে সে হয় বিস্ময়ে হতবাক: বাইরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে লরেলা, তার হাতে ছোট্ট একটি ঝুড়ি।

অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করে লরেলা সরাসরি ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অ্যানটোনিও বলে: 'রুমালটি আমি ভোর হতেই পাঠিয়ে দিতাম; তার জন্যে এই রাত্রে এত কষ্ট করে না এলেই পারতে।'

রুমালের প্রসঙ্গ এড়িয়ে লরেলা বলে,—

'পাহাড় থেকে খুঁজে তোমার জন্যে একটা গাছের শিকড় এনেছি। এটা বেটে লাগিয়ে দিলেই ঘাটা ভাল হয়ে যাবে।'

'ছিঃ ছিঃ এজন্য তুমি এত কষ্ট করে আমাকে যে আরও অপরাধী করছ। আমি ভাল আছি। আর খারাপ হলেও বা দুঃখের কি আছে। সেটাই আমার প্রাপ্য ছিল। তাছাড়া এত রাত্রে এখানে একাকী এসে কাজটা তুমি ভাল করনি। নিন্দুকের অভাব নেই।

'আমি ওদের গ্রাহ্য করি না।' লরেলার কণ্ঠে উত্তেজনা।

তারপর সে অ্যানটোনিওর আপত্তিতে কান না দিয়ে তার হাতের পট্টিটি আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করে। ক্ষতের চেহারা দেখে লরেলা ভয়ে শিউরে ওঠে। তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে উৎকণ্ঠার আভাস।

আশ্চর্য, ক্ষত জায়গাটির ওপর ওষধি লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানটোনিও আরাম বোধ করে; তার জ্বালা যন্ত্রণা অনেক কমে যায়।

অ্যানটোনিও—'তোমাকে এজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না। তবে আমার একটি অনুরোধ: আমার ঐ পাগলামির জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

—'সে কি কথা? অসভ্যতার জন্য আমিই তোমার ক্ষমাপ্রার্থী। আমি যা জঘন্য কাজ করেছি—'

'তা নিছক আত্মরক্ষার জন্যই তোমাকে করতে হয়েছিল। আর তা না করলে আমার শুভবুদ্ধি ফিরে আসত না। ক্ষমার কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দিও না।—এই নাও তোমার রুমালটি—পরিষ্কার করে রেখেছি।'

লরেলা কিন্তু রুমালটি গ্রহণ করে না। দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করে, কিছু বলতে চেষ্টা করে। দ্বিধা আর সংকোচের বেড়া ডিঙিয়ে এক সময় বলে ফেলে—

'আমার জন্য সমুদ্রে তোমার জামাটি হারিয়েছ, সেই সঙ্গে তোমার টাকা। তোমার ক্ষতিপূরণ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবুও যদি এইটি দয়া করে গ্রহণ কর—বিক্রী করে কিছু পাবে।'

এই বলে লরেলা তার সামনে একটি নতুন চকচকে রূপোর ক্রস বাড়িয়ে দেয়। যেটি তার ভূতপূর্ব পাণি-প্রার্থী চিত্রকর তাকে এক সময় দিয়েছিল।

'এটি আমি গ্রহণ করতে পারব না।'

'এ তোমার প্রাপ্য, নাও। আমি ফিরিয়ে নেবো না।'

'ফিরিয়ে না নাও তো সমুদ্রে ফেলে দিও। তোমার কাছে আমার কিছুই প্রাপ্য থাকতে পারে না।'

একটু থেমে অ্যানটোনিও আবার বলে—'তোমার কাছে আর একটি প্রার্থনা—এবার থেকে রাস্তায় দেখা হলে দয়া করে তুমি আমার দিকে আর তাকিও না; আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হবে। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা। তোমাকে শুভরাত্রি জানাই।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে অ্যানটোনিও হাঁপায়।

তার উক্তি শুনে লরেলার বুক ভেঙ্গে একটি চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। নীরবে রুমাল এবং 'ক্রস'টি তার ঝুড়িতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে সে দরজার দিকে পা বাড়ায়।

হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তে অ্যানটোনিও লক্ষ্য করল লরেলার চোখ বেয়ে জল পড়ছে—তার পা দু'টি থরথর করে কাঁপছে।

—'লরেলা, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?'

ব্যস্ত হয়ে সে লরেলার কাছে ছুটে যায়। চাপা কান্নায় লরেলা অ্যানটোনিওর কাঁধে ভেঙ্গে পড়ে। খানিক বাদে অস্ফুট স্বরে বলে—

'তোমার এই অভাবিত সহৃদয় ব্যবহার আমি সইতে পারছি না। তুমি আমাকে প্রহার কর। অন্ততঃ গালমন্দ কর। অথবা এখনও যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসার এতটুকুও রেশ থেকে থাকে—তুমি আমাকে তোমার পায়ে আশ্রয় দাও বা যা ইচ্ছা কর শুধু আমাকে এমন ভাবে তুমি দূরে ঠেলে দিও না।'

কথাগুলো বলে লরেলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অ্যানটোনিও তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বলতে থাকে—

'এ তোমার পরীক্ষা না অনুকম্পা জানিনা তবে'...

চকিতে লরেলা তার অশ্রুসিক্ত মুখটি তুলে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—

'বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালবাসি কিন্তু তোমার প্রেমকে আমি ভয়ও করি। তাই এতদিন তোমাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছিলাম। তবু রাস্তায় দেখা হলে চোরের মত তোমার দিকে না তাকিয়ে পারতাম না।'

এই বলে লরেলা হঠাৎ অ্যানটোনিওকে চুম্বন করল—একবার নয় তিনবার। তবুও বুঝি তার তৃপ্তি হয় না।

এবার সে অ্যানটোনিওর বাহুমুক্ত হয়। লরেলা খুশীতে উচ্ছল। সে মুক্ত কণ্ঠে বলে,—

'তোমার ইচ্ছা হলে আজকের এই ঘটনা তুমি ওদের জানাতে পারো। তবে জেনো, লরেলা একজন পুরুষকেই চুম্বন করে—যাকে সে স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছে।'

'এবার তুমি শুয়ে পড়। আমাকে এগিয়ে দিতে হবে না। আমি কোন পুরুষকে ভয় করি না। একমাত্র তোমার প্রেমকেই এতদিন ভয় করতাম।' এই কথা বলে লরেলা চকিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

অ্যানটোনিও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে খোলা জানালাটির কাছে। মুখে তার এক পরম প্রশান্তির ছায়া, দৃষ্টি প্রসারিত—শান্ত সমুদ্রের ওপর।

নষ্টনীড়

বেলজিয়ান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক মরিস মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck)-এর 'পীলিয়স ও মেলিসেণ্ডী' (Pe'lle'as and Me'lisande), ১৮৯২, নাটকের গল্পরূপ।

এ্যালিমণ্ডির রাজকুমার গোলড্ একদিন গভীর জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে পথ হারাল। পথের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে একটি ঝরণার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়।

গোলড্ ভেবে পায় না, অদূরে ঐ অপরূপ রূপবতী মেয়েটি একাকী এই গভীর জঙ্গলে বসে কেন কাঁদছে? সে ভাবে, তবে কি মেয়েটিও তার মত পথ হারিয়েছে?

কাছে এগিয়ে গিয়ে গোলড্ দেখ্ল, মেয়েটির মূল্যবান বেশবাস ধূলামলিন, ছিন্ন। তার মাথার সোনার মুকুটটি সেই ঝরণার জলে কি করে পড়ে গেছে। গোলড্ ভাবে, হয়ত মূল্যবান মুকুটটি হারিয়ে সে কাঁদছে।

গোলড্ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ঘনিষ্ঠ হতে গেলে মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে—

—"খবরদার, তুমি আমাকে ছুঁয়োনা; আমার কাছে এস না।"

আশ্চর্য, মুকুটটি জল থেকে উদ্ধার করতে গিয়েও গোলড্ বাধা পায়। মেয়েটির অদ্ভুত আচরণে সে অবাক হয়।

মেয়েটি কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য তাকে অনুসরণ করতে আপত্তি করে না। গোলড্ এগিয়ে যায়, মেয়েটি তার পিছু

চলে। খানিক এগিয়ে গিয়ে সে গোলডের কর স্পর্শ করে। পুরুষের কাছে নারীর মন চিরদিনই দুর্বোধ্য।

গোলড্ জানে দাদু তার বিয়ে ঠিক করে রেখেছে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে—রাজনৈতিক প্রয়োজনে। এ কথাও তার অ-জানা নেই, দাদুর অনুমোদন ছাড়া সঙ্গের এই অপরিচিত সুন্দরীকে নিয়ে রাজপুরীতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। ভেবেচিন্তে সে রাজপুরীর অদূরে অপেক্ষা করে। সেখান থেকেই সে তার মা আর ছোট ভাইকে খবর পাঠায় ; তাদের মারফৎ প্রার্থনা করে সে দাদুর অনুমতি—রাজ-পুরীতে প্রবেশের জন্য।

পুত্রের এই আকুতি স্নেহাতুর মা উপেক্ষা করতে পারেন না। পুত্রবধূর অনুরোধ বৃদ্ধ অ্যারকেল এড়াতে পারেন না। শ্বশুরের অনুমতি পেয়ে সুন্দরীকে নববধূরূপে মা রাজপুরীতে বরণ করে তোলেন।

কিছুদিন পরের কথা।

সে-দিনটি ছিল অসহ্য গরম। সন্ধ্যাবেলায় নতুন বৌদিকে নিয়ে গোলডের ছোট ভাই পীলিয়স্ 'চশমা-ঝরণায়' বেড়াতে এল। সেই নির্জন পরিবেশে ঝরণার স্নিগ্ধ মনোরম দৃশ্য দেখে মেলিসেণ্ডী মুগ্ধ হয়। গল্প করতে করতে পীলিয়স্ বুঝল, মেলিসেণ্ডী আর গোলড্-এর প্রথম দেখা হয়েছিল এই রকম-ই কোন একটি ঝরণার পারে।

—বৌদি, তোমাদের সেই প্রথম মিলনের গল্পটা একটু বল না।

বৌদির মুখে ভাষা নেই, সে মুখে দুষ্টু হাসি খেলে যায়। আংটিটি নিয়ে সে আপন মনে খেলা করে আর পীলিয়সের দিকে মাঝে মাঝে কেমন তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পীলিয়সের অসুবিধা হয় না।

—বৌদি,……

—কি, বল।

—না কিছু না। তোমার রূপসুধা পান করছিলাম।

পীলিয়সের উক্তি শুনে মেলিসেণ্ডীর সুন্দর মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠে। সে আংটিটি নিয়ে খেলা করে। এক ফাঁকে আংটিটি তার হাত থেকে ঝরণার জলে পড়ে যায়। পীলিয়স্ তা লক্ষ্য করে না। ঠিক সেই সময় রাজপ্রাসাদের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

—বৌদি, এবার ওঠা যাক্। চল ফিরে যাই। সদর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

ওরা দু'জন বাহুলগ্ন হয়ে নীরবে এগিয়ে যায় রাজপুরীর দিকে।

রাজপুরীর সেই ঘণ্টার শব্দ শুনে গোলড্ তখন তাড়াতাড়ি শিকার থেকে ফিরছিল। তার ঘোড়া ছুটছিল উর্ধ্বশ্বাসে। হঠাৎ বনের ভিতর একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গোলড্ পড়ে যায়।

সেই গুরুতর আঘাত গোলড্ তখনও কাটিয়ে ওঠেনি। সেই সময় মেলিসেণ্ডী এল তার কাছে।

—গোলড্, এই রাজপুরীতে আমার দম আটকে আস্‌ছে। আমি এখান থেকে মুক্তি চাই; সেই কথাটিই আমি তোমাকে জানাতে এলাম। তুমি কিছু মনে করো না।

—এ কি তোমার হাতের আংটিটি কি হোল? উৎকণ্ঠা জড়িত কণ্ঠে গোলড্ মেলিসেণ্ডীকে শুধায়।

—তুমি রাগ করো না গোলড্। সমুদ্রপারে তোমার ইনিওগু এর জন্য ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে সেখানে একটি বালির গর্তে আংটিটি পড়ে গেছে,—তরল কণ্ঠে মেলিসেণ্ডী জানায়।

—সর্বনাশ, স্রোতে ধুয়ে যাবার আগে এক্ষুণি তুমি সেখানে চলে যাও। আগে আংটিটি খুঁজে নিয়ে এস সেখান থেকে, গোলড্ এর কণ্ঠে আদেশের সুর।

মেলিসেণ্ডী বিলক্ষণ জানে সে আংটি আর পাবার নয়। যা

একবার ইচ্ছা করে দূরে ঠেলে ফেলা হয়, তা আর ফিরে পাওয়া যায় না।

পীলিয়স্‌কে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতীরে একবার বেড়িয়ে আসবার সুযোগ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে না। ওরা দুজনে বেরিয়ে যায় আংটির সন্ধানে। কিন্তু সমুদ্রের পারে গিয়ে ওরা দু'জনেই ভুলে যায় আংটির কথা। নীল অশান্ত সমুদ্রের রূপ দেখে ওরা মুগ্ধ হয়। দুজনে খুশী হয় সেই নির্জন পরিবেশে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য পেয়ে…।

পীলিয়স্ ও মেলিসেণ্ডী উন্মুখ হয়ে থাকে মিলনের আশায়। গোলডের অনুপস্থিতিতে ওদের সে সুযোগ সহজ ভাবেই মিলে যায়। থাক না ছোট্ট ইনিওগু ওদের দু'জনের মাঝে,—ও যে অবোধ-শিশু, করে না ওদের মিলনে কোন বাধা সৃষ্টি। ছেলেটি শুধু মাঝে মাঝে কেমন তাকিয়ে থাকে ওদের দু'জনের দিকে।

সেদিন রাত্রেও গোলড্ বাড়ীতে ছিল না। চাঁদনি রাত। মেলিসেণ্ডী গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে তার চুল আঁচড়াচ্ছিল। পীলিয়স তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আলতোভাবে সেই সুন্দর কেশগুচ্ছ হাতে জড়িয়ে প্রশংসায় আত্মহারা হয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল গোলড্ এগিয়ে আসছে। পীলিয়স্ সেই চুল থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার অবকাশ পায় না। হাত সরিয়ে নেবার বৃথা চেষ্টাও সে করল না।

এত রাত্রে ছেলেমানুষের মত ওরকম খেলা করবার জন্যে গোলড্ ওদের দুজনকে তিরস্কার করে তার ঘরে ঢুকে যায়।

পরের দিন গোলড্ পীলিয়স্‌কে আড়ালে ডেকে বলে,—দেখ, মেলিসেণ্ডী ছেলেমানুষ তায় স্পর্শকাতর, ওর সঙ্গে একটু সতর্কভাবে মেলামেশা করবে। গত রাত্রে যেমন ভাবে তুমি আলাপ করছিলে ঠিক তেমন ভাবে বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষ করে জেনো ও শীঘ্রই মা হতে চলেছে।

গোলড্ ওদের দু'জনের অত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার তাৎপর্য

ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিছুদিন থেকে সে সংশয়ের দ্বন্দ্বে কষ্ট পাচ্ছিল। অগত্যা তাই একদিন তার ছোট্ট ছেলের শরণাপন্ন হয়। ইনিওগুকে সে অনেক প্রশ্ন করলে, প্রলোভন দেখিয়ে, আকার ইঙ্গিতে ছেলেটিকে অনেক কিছু বুঝিয়ে তার কাছ থেকে সে রহস্য উদ্ধার করতে গোলড্ চেষ্টার কসুর করল না। কিন্তু কোন ফল হল না। ছেলেটি নিতান্তই বালক, সে তার বাবার কৌতূহল মেটাতে পারে না।

গোলড্-এর অন্তর্জ্বালা বেড়ে যায়।

পীলিয়স্ স্থির করলে, এবারে তার বহু প্রতীক্ষিত ভ্রমণে সে বেরিয়ে পড়বে। যাত্রার দিন ঠিক হল। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় মেলিসেণ্ডীকে সে চুপি চুপি বলে গেল ঐ দিন রাত্রে চশমা-ঝরণার কাছে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

মেলিসেণ্ডী মাথা নেড়ে প্রতিশ্রুতি জানায়।

পীলিয়স্ বাড়ী থেকে চলে যাবার পর মেলিসেণ্ডীকে কেমন বিষণ্ণ আর উদাস বলে মনে হয়। বৃদ্ধ দাদা-শ্বশুরের অভিজ্ঞ নজর এড়িয়ে চলা তার পক্ষে সহজ নয়। অ্যারকেল একসময় মেলিসেণ্ডীকে ডেকে শুধায়,—

আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবার পর হয়ত এখানে শান্তি আসবে। কিন্তু কই শান্তি! তোমারই বা কি হয়েছে? আমি ত ভেবে পাই না—তোমার বিষণ্ণতার কারণ। গোড়াতে তো তুমি এমনটি ছিলে না।

মেলিসেণ্ডী মুখ ফুটে কিছু না বললেও বৃদ্ধ তার মনের কথার বুঝিবা কিছু আভাস পায়।

পাশের ঘর থেকে গোলড্ দাদুর সব কথাই শুনছিল। হঠাৎ খাপ খোলা তরবারি হাতে নিয়ে উন্মত্তের মত ছুটে এসে মেলিসেণ্ডীকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে। ঘটনাস্থলে অ্যারকেল থাকায় সে যাত্রায় মেলিসেণ্ডী রক্ষা পায়।

বিকাল হতেই গোলড্ অন্যদিনের মত শিকারে বেরিয়ে যায়। সে বেরিয়ে যেতে মেলিসেণ্ডী চঞ্চল হয়ে উঠে। সন্ধ্যার পর সে মন্ত্রমুগ্ধের মত আস্তে আস্তে বনের দিকে পা বাড়াল। চশমা-ঝরণার কাছে পীলিয়স্ আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল : দূর থেকে পীলিয়সকে দেখতেই মেলিসেণ্ডীর দেহমনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। ওরা দু'জনে গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়…।

কোন ফাঁকে বারটা বেজে গেছে ওরা কেউ টের পায়নি। প্রাসাদের ফটক বন্ধ হবার শব্দ কানে যেতেই দু'জনে চমকে উঠে। ওরা ভাবে, সর্বনাশ ; রাতটা ওদেরকে তাহলে রাজপুরীর বাইরেই কাটাতে হবে ? তাহলে উপায়…?

কিন্তু কোন উপায় আর কষ্ট করে ওদের ভাবতে হয় না। অদূরে দেখা গেল—গোলড্ এগিয়ে আসছে, হাতে তার উন্মুক্ত তরবারি। ঘোড়ায় চেপে সে ওদের দিকেই ছুটে আসছে। তার লক্ষ্য স্থির, চোখে মুখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে।

ওরা দু'জনে বেশ বুঝতে পারল গোলড্-এর ঐ মুক্ত তরবারির থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মরিয়া হয়ে পীলিয়স আর মেলিসেণ্ডী পরস্পর পরস্পরকে গভীর ভাবে চুমু খায়। আর ঠিক সেই অবস্থাতেই গোলড-এর হাতের তরবারি পিছন থেকে পীলিয়সকে নির্মমভাবে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে পীলিয়সের রক্তাক্ত দেহটি ঝরণার কিনারে লুটিয়ে পড়ল। সে আর উঠল না।

তারপর সেই অন্ধকারে গোলড্ উন্মত্তের মত মেলিসেণ্ডীর সংজ্ঞাহীন দেহটিকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যায়। ভোরবেলায় এক পুরানো চাকরের সাহায্যে দু'জনে প্রাসাদে প্রবেশ করে।

গোলড্-এর তরবারির সেই আঘাত মেলিসেণ্ডীর বুকও ছুঁয়ে গেছল। দেহের সে আঘাত গুরুতর হয়নি বটে তবে সে আঘাতের প্রতিক্রিয়া মনের উপর হয়েছিল মারাত্মক ভাবে। ফলে সময়ের অনেক আগেই তার গর্ভের সন্তানটি প্রসব হয়। তবুও তার সংজ্ঞা

ফিরে আসে না। ডাক্তাররা রোগীর জীবনের ভরসা দিতে পারে না। চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মেলিসেণ্ডীর এ অবস্থার জন্য গোলড্ অনুশোচনার জ্বালায় কষ্ট পায়। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে ছুটে এসে সকলের মাঝে নিজেকে অপরাধী বলে জানায়। সে দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলে,—ওরা দু'জনে অবোধ-শিশু, ওদের চুমু খাওয়াও হয়ত শিশুসুলভ-ই ছিল।

হঠাৎ মেলিসেণ্ডী চোখ মেলে তাকায়—তার দৃষ্টি শূন্য। মনে হয় যেন তার একটু তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু তার মনে পড়ে না কোন দুর্দৈবের কথা—কোন অঘটনের স্মৃতি। গোলড্-এর প্রতি নজর যেতেই তার দৃষ্টি স্থির হয়। তার মনে হল যেন গোলড্ হঠাৎ বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে।

গোলড্ ভাবে, হয়ত বুঝি মরবার আগে মেলিসেণ্ডী সত্যি কথা বলে যাবে। তাই সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ডাক্তার এবং অন্যান্য সকলকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করা হলে সে সহজ ভাবেই জানায়—পীলিয়স এবং সে নিষ্কলঙ্ক। পীলিয়সের কথা উঠতে মেলিসেণ্ডী ব্যস্ত হয়ে তার খোঁজ করে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে। তারপর সে আবার এলিয়ে পড়ে চোখ বোজে।

মরিয়া হয়ে গোলড্ চিৎকার করে ওঠে,—

মেলিসেণ্ডী, মৃত্যুর আগে অন্ততঃ একটি অনুরোধ রাখ—সত্যি করে বলে যাও—পীলিয়স্-এর সঙ্গে তোমার সম্পর্কের আসল রহস্য।

—মৃত্যু! কেন মৃত্যু, কার মৃত্যু,—শান্তকণ্ঠে মেলিসেণ্ডী জবাব দেয়। সে কণ্ঠে থাকে না কোন ভয়, না কোন সঙ্কোচ।

মেলিসেণ্ডীর উক্তি শুনে গোলড্ হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। খানিক বাদে বৃদ্ধ অ্যারকেল সদ্য প্রসূত ফুটফুটে শিশুটিকে মেলিসেণ্ডীর সামনে তুলে ধরে। কিন্তু তবুও তার চোখ মুখ থাকে ভাবলেশহীন।

খবর শুনে একদল দাসদাসী এলো মেলিসেণ্ডীকে অভিনন্দন

জানাতে, জানাতে শিশুটির উদ্দেশ্যে শুভ কামনা। তার শয্যাকে কেন্দ্র করে তারা সকলে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু সেই বিষাদের প্রতিমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোল না। শুধু তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে দু' ফোঁটা জল। সমস্ত ঘরটি নিস্তব্ধ। এক সময় মেলিসেণ্ডীর শুভ্র হাতখানা তার বুক থেকে আলতোভাবে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল।

ডাক্তার ছুটে এসে তার হাতখানি স্পর্শ করে আর্দ্রকণ্ঠে জানায়—'সব শেষ'।

তাঁতি

জর্মন সাহিত্যিক গেরহার্ট হাউপ্টমান (Gerhart Hauptmann)-এর 'দি উঈভারস্' (The Weavers), ১৮৯২, নাটকের সারাংশ।

ড্রেইজার তাঁত শিল্পের ধনী ব্যবসায়ী। স্থানীয় তাঁতিদের কর্তা।

বাড়ীর একতলাতেই তার অফিস। প্রশস্ত অফিস ঘরটিতে জাঁকিয়ে বসে তার সুযোগ্য ম্যানেজার ফীফার। সকাল হতেই এক এক করে গরীব তাঁতিরা আসে সেখানে তাদের উৎপাদনের পুঁটলি নিয়ে, বিক্রী করবার আশায়।

ম্যানেজার তার অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে দেখে তাদের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সে কিছু না কিছু একটা খুঁত বার করে, তারপর সে-জিনিসটির যা-হোক একটা মূল্য নির্ধারণ করে।

ড্রেইজার তাদের একমাত্র স্থানীয় ক্রেতা। সে ছাড়া এদের গতি নেই। ওরা নিতান্তই গরীব, পেটের ক্ষুধা দুর্জয়। তাই সেই নির্ধারিত দাম ওরা নীরবে হাতে নেয়, জানায় না কোন প্রতিবাদ। তাঁতিরা নিরীহ, কোন প্রতিবাদ করতে জানে না।

এমনি একটা কাপড়ে জড়ান পুঁটলি নিয়ে সেদিন এল বৃদ্ধ বুমার্ট। তার ঘরে খাদ্যের একটি কণাও নেই। দু'দিন থেকে তার পেটে কিছু পড়েনি। ছেলেপুলেদের ক্ষুন্নিবারণের জন্য অগত্যা সে তার পোষা প্রিয় কুকুর ছানাটি মারতে বাধ্য হয়েছে। পুঁটলি খুলে সে সদ্য মারা সেই অস্থি-চর্মসার কুকুর ছানাটি দেখায়। সে কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানায়। কিন্তু প্রভুর দয়া হল না।

ঘরের চারিদিকে তাঁতিরা ইতস্ততঃ বসে আছে, তাদের কেউ বা বসে বসে ধুঁকছে। এদের ভিতর থেকে এবার একটি বলিষ্ঠ যুবক—

বেকার—এগিয়ে এসে ম্যানেজারের সামনে তার পুঁটলি খোলে। দাম শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত কণ্ঠে বেকার বলে,—

এ কি দাম দিচ্ছেন, না ভিক্ষা? আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করতে আসিনি। ন্যায্য মূল্য দিন।

উদ্ধত তাঁতির উক্তি শুনে ম্যানেজার অবাক হয়। অগত্যা সে হয় মালিকের শরণাপন্ন। ড্রেইজার এসে তার ম্যানেজারকে সমর্থন করে, টানে তার-ই সুর। ফলে, ব্যাপার আরও জটিল হয়।

সেই হট্টগোলে একটি ছোট্ট ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ড্রেইজারের মেজাজ আরও রুক্ষ হয়। ছেলেটির ঐ অবস্থার জন্য সে তার মা বাপকেই দোষী করে। সে বলে, এত দূরের রাস্তায় এ রকম একটি ভারি বোঝা ছেলেটির মাথায় চাপিয়ে পাঠাবার জন্যই ওর এ অবস্থা হয়েছে। তাঁতিরা প্রতিবাদ করে জানায়,—'ছেলেটি অনাহারে দুর্বল। তাই…' ড্রেইজার ধমক দিয়ে ওদের থামিয়ে দেয়।

ঘরের এই উত্তেজিত পরিস্থিতিতে মালিক এবার দীপ্ত কণ্ঠে তাঁতিদের শোনায়—'আমি তোমাদের কাজ দিয়েছি। তাই তোমরা করে খাচ্ছ। তোমাদের না পোষালে ছেড়ে দাও…' সকলকে অবাক করে সে হঠাৎ ঘোষণা করল, সে দু'শো নতুন লোক নিয়োগ করবে বলে স্থির করেছে; শুধু তাই নয়, তারা বর্তমান মজুরীর হারের চেয়ে কম হারে কাজ করতে রাজী হয়েছে।

তার উক্তি শুনে তাঁতিরা স্তব্ধ হয়, হয় চিন্তিত। তারা বিষণ্ণ মনে ফিরে যায়।

বৃদ্ধ বুমার্ট তার কুকুর ছানার পুঁটলিটি নিয়ে বাড়ী ফিরল। তার সঙ্গে এল তরুণ গেজার, পরিবারের অতিথি হয়ে। বুমার্টের সংসার বলতে পঙ্গু স্ত্রী আর তাদের দুটি মেয়ে, এমা আর বার্থা এবং এমার একটি অবৈধ ছেলে। বুমার্ট নিজে আর কাজ করতে পারে না। ছোট মেয়ে বার্থা একাই তাঁত চালায়, কখনও এমা তাকে সাহায্য করে। ছোট মেয়ের সাধ্য কি এ সংসার চালায়।

অতিথি গেজার বুমার্টের সগোত্র নয়, একজন প্রাক্তন সৈনিক। সে সুদর্শন, তার পরিচ্ছদ ফিটফাট; পকেটও শূন্য নয়, লেখাপড়াও সে কিছু জানে, রাখে তুনিয়ার অল্প বিস্তর খবর। সহজেই সে হয়ে ওঠে পরিবারের আকর্ষণের বস্তু। পরিবারের দিকে সে এক বোতল মদ বাড়িয়ে দিল। উল্লসিত পরিবার তাকে ঘিরে বসে, আগ্রহভরে শোনে তার সৈনিক-জীবনের কাহিনী।

বার্থা কুকুর ছানাটির মাংস রাঁধবার তোড়জোড় করে। সেই মাংস আর মদ দিয়ে তারা করে উৎসবের আয়োজন; করে অতিথিকে আপ্যায়ন। মাংসের গন্ধ পেয়ে বৃদ্ধ বাড়ীওয়ালা অ্যান-সোর্জও এসে যোগ দেয় তাদের সেই প্রীতি-ভোজে। অনাহূত হলেও সে হল না অবাঞ্ছিত। বেচারা বুমার্ট কিন্তু খেতে পারল না। অত বছর বাদে বৃদ্ধের পেটে মাংস সইবে কেন? বৃদ্ধ বমি করে দিল। তাই দেখে অ্যানসোর্জ হয় বিরক্ত।

অতিথি গেজার তাঁতিদের তুরবস্থার কথা শুনে বেদনা বোধ করে। তাদের সেই মর্মান্তিক অবস্থার কোন পরিবর্তনের আশা ভরসা না দেখে সে হয় আতঙ্কিত। সে জানে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃঢ় ধারণা: এই তাঁতিদের কোন অভাব নেই, নেই কোন তুঃখ, না কোন অভিযোগ। গেজার তাই চিন্তিত হয়। এদের তুর্দশার প্রতিকারের কোন পথ সে খুঁজে পায় না। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়।

গেজার নিজের মনে গুন্‌গুন্ করে একটি অভিযান-গীতি গাইতে সুরু করে। সে গানে ড্রেইজারকে আঁকা হয় একটি হৃদয়হীন শোষক ও বদমাইস বলে। সে শোনাল তাঁতিদের সুপ্ত শক্তি ও ক্ষমতার কথা, তাদের বাঁচবার অধিকারের কথা। ওরা তন্ময় হয়ে শোনে সেই গান; শুনতে শুনতে বৃদ্ধ বুমার্ট আর অ্যানসোর্জ ক্রমে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। জেগে ওঠে ওদের সুপ্ত সত্তা। ওরা তুজন হঠাৎ

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে, তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করবে, প্রয়োজনে করবে তারা সংগ্রাম। এবার ওরা রাস্তায় বেরিয়ে যায়। ওদের দু'জনের উৎসাহ দেখে গেজার তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—'এগিয়ে চল, সজোর পায়ে। এগিয়ে চল সকল ভায়ে···'

বৃদ্ধ দু'জন যেন আজ হঠাৎ যৌবন ফিরে পেয়েছে। তারা দৃঢ় পায়ে, বলিষ্ঠ মনে সদর রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। কিছুদূর এগিয়ে ওরা লক্ষ্য করল, ক'জন তাঁতির ছোট্ট একটি জটলা। ওরা ওদের কাছে এগিয়ে যায়; শুনল ওরা করছে তাঁতিদের দুঃখ, দুর্দশার আলোচনা, বলছে মালিকের দুর্নীতি আর তার শোষণের কথা। প্রবীণদের সান্নিধ্য পেয়ে নবীনরা হয় উৎসাহিত। তাদের আলোচনা হয়ে ওঠে জোরাল। দেখতে দেখতে ভীড় আরও বেশী হয়।

চলার পথে ওদের আলোচনা শুনে কোন এক চাষী বলে, তাঁতিদের দুর্দশার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী, ওরা অলস, দুর্বল। চাষীর মতে সায় দেয় একজন ফরেস্টার, সে উক্তি সমর্থন করে জনৈক ব্যবসায়ী ট্যুরিস্ট। তাদের বিরুদ্ধ-উক্তিতে তাঁতিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; সমবেত কণ্ঠে তারা তীব্র প্রতিবাদ জানায়, করে আক্রমণ। ওরা পালিয়ে বাঁচে।

ঠিক সেই সময় গেজার আর বেকার এল ঘটনাস্থলে। এল তারা একদল বিক্ষুব্ধ তাঁতিদের মিছিল নিয়ে। তাদের উদাত্ত কণ্ঠে সেই অভিযান-গীত—এগিয়ে যাবার গানঃ 'এগিয়ে চল সজোর পায়ে এগিয়ে চল সকল ভায়ে'। ওরা হয়েছে এগিয়ে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত। ওরা আর ভয় করবে না, ওরা উদ্দাম। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এল ঘটনাস্থলে। নিষেধ করল ওদের সেই গান গাইতে। পুলিশ ভয় দেখাল। কিন্তু কোন ফল হোল না। তারা মানল না পুলিশের কোন অনুশাসন। বেপরোয়া বিক্ষুব্ধ দলের মিছিল এগিয়ে চলে ড্রেইজারের বাড়ীর দিকে।

ড্রেইজার তখন স্থানীয় যাজকের সঙ্গে তাসের মজলিসে মগ্ন। বাইরে জনতার বিক্ষোভের ঝড় বইছে, তাতে তার রসভঙ্গ হল। সে বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে একবার বাইরে গেল, ফিরে এসে জানাল দলের নেতা বেকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুঝি সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এমন সময় গৃহ শিক্ষক তাঁতিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় সঙ্গে সঙ্গে সে তার চাকুরীটি হারাল।

বাইরে বিদ্রোহীরা ততক্ষণে আরও ক্ষেপে উঠেছে। পুলিশের সঙ্গে হল তাদের সংঘর্ষ, হল হাতাহাতি। তাদের কবল থেকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে এল দলপতি বেকারকে। বিদ্রোহী তাঁতিরা দুর্জয়। পুলিশ প্রমাদ গোণে, হয় চিন্তিত। পরিস্থিতি দেখে ড্রেইজারের বিচক্ষণ কোচয়ান এক ফাঁকে তার উদ্‌ভ্রান্ত কর্তাকে জানিয়ে যায় পিছন দিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার জন্য তার গাড়ী প্রস্তুত, প্রস্তুত আছে তার পরিবারবর্গ ; সময় বয়ে যায়।

যাজক এতক্ষণ ড্রেইজারের ঘরে বসে বাইরের সব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। তাঁতিদের প্রতি কোনদিনই তাঁর সহানুভূতি ছিল না বটে—কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি বাইরে এসে বিক্ষুব্ধ তাঁতিদের সামনে দাঁড়ালেন। তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি কি যেন উপদেশ দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা চিৎকার করে তাঁকে থামিয়ে দিল। তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচেন।

বিদ্রোহীরা এবার ঝড়ের বেগে ড্রেইজারের সদর দরজা দিয়ে তার বাড়ীতে ঢোকে। কিন্তু তার খানিক আগেই ড্রেইজার সপরিবারে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ী ছেড়ে সরে পড়েছে। তারা ড্রেইজারের নাগাল পেল না বটে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার সাধের অফিস আর বাড়ীটি ভেঙ্গেচুরে লণ্ডভণ্ড করে বেরিয়ে এল।

পাশের গাঁয়ে ছিল প্রবীন তাঁতি হীলসে। বিদ্রোহের খবরটা

তারও কানে এল। কিন্তু তার ধার্মিক-মন সে কথা বিশ্বাস করতে চায় না। খানিক বাদেই তার এ সন্দেহ নিরসন হল বটে কিন্তু হীলসে তার সগোত্রের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণে বেদনা বোধ করে। তার পুত্রবধূটি কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে সমর্থন করে, সমর্থন করে না তার স্বামী ; সে বিশ্বাস করে বাপের আদর্শকে।

একটু বাদেই সেই অভিযান-গীত ভেসে এল তাদের কানে। তারা উৎকর্ণ হয়ে শোনে সে গান। ক্রমে এগিয়ে এল মুখর জনতা তাদের বাড়ীর কাছে। ওরা দেখল, মিছিলের পুরোভাগে গেজার আর বেকারকে। তারা আহ্বান করল বৃদ্ধ হেলসী আর তার ছেলে গোটলীরকে মিছিলে যোগ দিতে। বাপ আর ছেলে হু'জনই নিরুত্তর। কিন্তু ওদের ডাকে সাড়া দিল—পুত্রবধূ লুসী। সে নির্ভয়ে বেরিয়ে যায় ওদের সকলের মাঝে। স্ত্রী বেরোবার পরেই সেনা বাহিনীর গুলির শব্দ পেয়ে উঁকি দিয়ে গোটলীর দেখে, তার বীরাঙ্গনা স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে সৈনিকের বেওনেটের মুখোমুখি। কিন্তু স্ত্রীর মুখে নেই কোন ভয়ের অভিব্যক্তি। স্ত্রীর কাণ্ড দেখে সে অভিভূত হয় ; সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে।

বৃদ্ধ হেলসী তখনও আঁকড়ে বসে আছে তার তাঁত নিয়ে। সে তার সঙ্কল্পে অটল। বৃদ্ধ সমর্থন করবে না এ বিদ্রোহ। হঠাৎ একটি গুলি কোথা থেকে উড়ে এসে মারাত্মক ভাবে আহত করল হেলসীকে।

খানিক বাদে। ছোট্ট নাতনি কোথা থেকে ছুটে এল দাহুর কাছে মজার খবর নিয়ে—

"দাহু, দাহু দেখবে এস লোকের ভয়ে বন্দুক হাতে সৈন্যেরা কেমন ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। কি মজা ! দেখ, দেখ, ওদের ভেতর মা বাবা কেমন দাঁড়িয়ে হাসছে। এবার ওরা সকলে দল বেঁধে আমাদের গাঁয়ের ঐ বড় লোকটির বাড়ীতে ঢুকছে। বেশ জব্দ হবে পাজী লোকটা। না দাহু ?"

দাদু নিরুত্তর। সে স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নাতনির দিকে।

ছোট মেয়েটি ভেবে পায় না, আজ এই আনন্দের দিনে তার দাদু অমন করে তাকিয়ে আছে কেন? কেনই বা সে কোন কথা বলছে না তার সাথে।

—'দাদু, দাদু……'

বুভুক্ষা

নরওয়ের সাহিত্যিক ক্নুট হামসুন (Knut Hamsun)-এর 'হাঙ্গার' (Hunger), ১৮৯০, উপন্যাসের গল্প।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল।

তরুণ সাহিত্যিক একবার চোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঘুম আর হল না কিন্তু বিছানা ছেড়েও তিনি উঠলেন না।…দেখতে দেখতে আটটা বেজে গেল।

—না আর শুয়ে থাকা চলে না।

ক্ষুধার জ্বালায় এবার তাঁকে উঠতে হল। ঘরের ভেতর তিনি এটা সেটা অনেক করে খুঁজলেন। না, কোথাও কিছু খাবার পাওয়া গেল না—এক টুকরো রুটিও না।

সাহিত্যিক একবার ভেবেছিলেন, কাজের সন্ধানে সকাল বেলায় তিনি বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু সে চেষ্টা করতে গিয়ে বহুবার তিনি শুধু নির্মম ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি ভোলেন নি, তা ভোলবার নয়। তাই নতুন করে উমেদারি করতে বেরোবার উৎসাহ আজ আর তিনি পেলেন না।

কিছু কাগজ পকেটে পুরে সাহিত্যিক এক সময় বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য, আবহাওয়া নেহাৎ শত্রুতা না করলে পার্কে বসে কিছু লিখবেন—সম্ভব হলে, কাগজের জন্য দু'একটা প্রবন্ধ।

রাস্তায় বেরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন—একজন খোঁড়া বৃদ্ধ, পিঠে তার একটা ভারী বোঝা। বৃদ্ধ ধুঁকছে, তবুও এগিয়ে যাবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। লোকটির কাছাকাছি তিনি পৌঁছুলে বৃদ্ধ তাঁর দিকে করুণ ভাবে তাকাল। তারপর এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে সে

সাহিত্যিকের কাছে চুপি চুপি আধ পেনী ভিক্ষা চাইল—দুধ কিনবে।

সাহিত্যিক নিজে দু' দিন অভুক্ত। পকেটে কাণা কড়িও নেই। তিনি মনে মনে হাসলেন: বুড়ো ভিক্ষা চাইবার পাত্র আর খুঁজে পেল না।

ওকে পাশ কাটিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে একটি বন্ধকী দোকানে ঢুকলেন। গা থেকে ফতুয়াটি খুলে দোকানীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বিনিময়ে দোকানী তার হাতে দেড় পেনী গুঁজে দেয়।

রাস্তায় সেই খোঁড়া বৃদ্ধটির সঙ্গে আবার দেখা হতে তিনি তাকে আধ পেনী দিলেন। বৃদ্ধ লোকটি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। দাতা তাকে ছোট্ট একটি ধন্যবাদ জানাবারও অবকাশ দিলেন না। তিনি এগিয়ে চললেন।

রাস্তা সুবিস্তৃত। দূরে ঐ মেয়েটি তার সঙ্গী মহিলার সঙ্গে কেমন গল্প করতে করতে চলছে! মেয়েটি আনন্দে উচ্ছল। তা হবেই বা না কেন? ওদের ত আর ক্ষুধার জ্বালা নেই। মেয়েটির সঙ্গে একটু কৌতুক করলে কেমন হয়! পেটের জ্বালা না মিটুক মনের অন্নের স্বাদ একটু তো পাওয়া যাবে।

—শুনছেন, আপনার সঙ্গের বইটি হারিয়ে যাবে।

তরুণীটি চম্‌কে ওঠে। ওরা দু'জনে পা চালিয়ে সামনের একটি দোকানের শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—এই যে, দেখুন আপনার বইটি হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

মেয়েটি অবাক হয়। তার সঙ্গে কোন বই-ই ছিল না।

সাহিত্যিক কিন্তু ওদের পিছু ছাড়েন না। তা না ছাড়ুন। ওরা লোকটিকে এতক্ষণে একজন নিরীহ পাগল বলে ধরে নিয়েছে।

—না, পার্কে এসে কোন লাভ হল না। সুযোগ বুঝে মাছিগুলিও আজ বড্ড জ্বালাচ্ছে। মাছি তাড়াতে তাড়াতে যে দুপুর গড়িয়ে গেল। প্রবন্ধ লেখাটা আজ আর হ'ল না দেখছি। যাক্ গে। ক্যাশিয়ারের সেই পদটির জন্য একটা আবেদন করলে কেমন হয়?

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। আবেদন পত্রটি পাঠিয়ে দিয়েও স্বস্তি নেই। দু'দিন বাদেই সাহিত্যিক গিয়ে হাজির হলেন বড়কর্তার কাছে, উমেদারি করতে। তাঁকে দেখে কর্তা কেমন অদ্ভুত ভাবে হাসলেন। এক সময় তিনি প্রার্থীর দৃষ্টি তাঁর দরখাস্তের তারিখের দিকে আকর্ষণ করলেন।

—ছিঃ ছিঃ এ কি তারিখ দিয়েছিলাম! ১৮৪৮ সাল! এ যে আমার জন্মেরও বহু আগেকার বছর।

সাহিত্যিক হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরলেন। ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর একটি চিঠি দেখে আঁত্‌কে উঠলেন।

সর্বনাশ! এ নিশ্চয়ই বাড়ীওয়ালীর নোটিশ। তার-ই বা দোষ কি? আজ ক' মাস ধরে তাকে ভাড়া দেওয়া হয়নি। অগত্যা চিঠিটা খোলাই যাক্,—

—এও কি সম্ভব! এ যে দেখছি কাগজের সম্পাদকের আন্তরিক অভিনন্দন। অ্যাঁ, সঙ্গে আবার আধা পাউণ্ড অগ্রিম দক্ষিণাও পাঠিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তার লেখাটি নাকি অপূর্ব হয়েছে। দু' একদিনের মধ্যেই ছেপে বেরুচ্ছে। না, দুনিয়াটা তাহলে এখনও পুরোপুরি নিষ্ঠুর হয় নি।

দিন যায়। ক'দিন বাদে এক সন্ধ্যায় সাহিত্যিক একটি পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এসে গীর্জার খোলা উঠোনে বসলেন। কোন্ ফাঁকে আটটা বেজে গেছে— সেই সঙ্গে গীর্জার ফটকটিও বন্ধ হয়ে গেছে। সাহিত্যিক ভাবলেন, এবার বাড়ী ফেরা যাক্। বাড়ী মানে—কোন এক ঝালাইকরের

পরিত্যক্ত একটি ছোট্ট ডেরা। সে তাঁকে দয়া করে সম্প্রতি থাকবার অনুমতি দিয়েছে। ঐ তাঁর আস্তানা—ছুনিয়াতে একমাত্র আশ্রয়।

সাহিত্যিক উঠে দাঁড়ালেন। যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু টলে পড়ে গেলেন। আবার চেষ্টা করলেন, কোন ফল হল না। বিমূঢ় সাহিত্যিক ভেবে পান না—তাঁর কি হল, কোথায়-ই বা আছেন তিনি? হঠাৎ মনে হল যেন তাঁর জ্বর হয়েছে। কিন্তু খানিক বাদেই উপলব্ধি করলেন,—না এ তাঁর দেহের উত্তাপ নয়। পেটের অসহ্য জ্বালা—এ তার-ই দাহন। সাহিত্যিকের মনে পড়ে আজ ক'দিন থেকে তাঁর পেটে কিছু পড়েনি। ক্ষুধা! অসহ্য ক্ষুধা!

তরুণ সাহিত্যিক অসহায় ভাবে ঐখানেই বসে পড়লেন। ক্রমে তন্দ্রায় তাঁকে আচ্ছন্ন করে। তাঁর মনে হল, একটি সুন্দর মেয়ে, সেজেগুজে কার জন্য যেন দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে। আশ্চর্য, এও কি সম্ভব! সে যে তাঁরই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার বাহুলগ্ন হয়ে একটি সুসজ্জিত ঘরে এলেন। সেই নির্জন ঘরে এক সময় তার নিবিড় আলিঙ্গনে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। সুন্দরী তাঁকে চুমু খাবার জন্য লালায়িতা হয়ে ওঠে…।

বেরসিক পুলিশের ডাকে সাহিত্যিকের তন্দ্রা ছুটে যায়—তাঁর স্বপ্ন কেটে যায় বাস্তবের আঘাতে।

পুলিশের তাড়নায় এবার তাঁকে উঠতে হল। আশ্রয়ের জন্য তাঁকে থানায় আসতে হল। সেখানে তিনি তাঁর আসল পরিচয় গোপন করে জানালেন, এত রাত্রে তাঁর বাড়ী ফেরা একটু মুস্কিল। দারোগা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন অর্থাৎ তিনি ধরে নিলেন রাতের এ পথিক ছুঃখী-শ্রেণীর নয়—সাধারণ একটি তরুণ লম্পট!

তাঁকে একটি আলাদা ঘরে থাকতে দেওয়া হল কিন্তু সকালে ছুঃখী ছেলেদের সঙ্গে তাঁকে কিছু খেতে দিল না ওরা। অগত্যা প্রচুর জল খেয়ে সাহিত্যিক সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

অসহ্য খিদের জ্বালায় সাহিত্যিক প্রায় আধমরা হয়ে তাঁর গায়ের

কোটটি খুলে বন্ধকী দোকানের দিকে আবার এগিয়ে যান। কিন্তু তাঁকে হতাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরতে হল। রাস্তায় হঠাৎ তাঁর এক সহৃদয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি সাহিত্যিক-কে শুধু পেট ভরে খাওয়ালেন-ই না—সেই সঙ্গে তাঁর পকেটে পাঁচ শিলিং গুঁজেও দিলেন।

ক'দিন বাদে একটি প্রবন্ধ নিয়ে এক সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলেন সাহিত্যিক। সম্পাদক প্রবন্ধটি পড়ে খুশী হলেন কিন্তু সেটি গ্রহণ করলেন না। তিনি সাধারণ পাঠকের উপযোগী একটি নতুন লেখা লিখে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। সাহিত্যিক সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় সম্পাদক ঐ লেখার জন্য তাঁকে কিছু অগ্রিম দক্ষিণা দিতে চাইলেন। সাহিত্যিকের পেটে ক্ষুধা। কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদা বোধ সদা জাগ্রত। পাছে তাঁর দীনতা প্রকাশ পায় তাই তিনি অগ্রিম দক্ষিণা না নিয়ে সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কিছুদিন থেকে সাহিত্যিক লক্ষ্য করছেন রোজ রাত্রে কালো বোরখা পরে কে একজন মহিলা তাঁর ডেরার দিকে নিবিষ্ট ভাবে তাকিয়ে থাকেন। ঐ কোণে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি চলে যান। ব্যাপারটা রহস্যময় বটে।

এক রাত্রে সাহিত্যিক সেই মহিলার কাছে এগিয়ে গেলেন। কথা বলতে বলতে দু'জনে রাস্তায় এগিয়ে চললেন। বোরখা তুলবার পর দেখা গেল,—এ সেই মেয়ে যাঁর সঙ্গে তিনি সেদিন বই নিয়ে কৌতুক করেছিলেন। আশ্চর্য, সাহিত্যিকের মনে হোল যেন মেয়েটি তাঁর সঙ্গ পেয়ে খুশী হয়েছে।

এমনি এক রাত্রিতে সাহিত্যিক এই মেয়েটির সঙ্গে তার বাড়ীতে এলেন। তিনি জানলেন, প্রথম দিনের তাঁর সেই অস্বাভাবিক

আচরণে মেয়েটি তাঁর প্রতি ঐ দিন থেকেই আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি আরও জানলেন, মেয়েটি দুঃসাহসী—বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধানী। সঙ্গিনী সাহিত্যিকের জীবন-কাহিনী শুনে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। ঘরের ঐ সুন্দর নির্জন পরিবেশে সুন্দরী একসময় অতিথিকে প্রেম নিবেদন করলে সাহিত্যিক তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন না।

মেয়েটির সঙ্গে ঐ তাঁর শেষ দেখা।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সাহিত্যক অসুস্থ বোধ করলেন। সারাদিন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। কিন্তু লেখার তাগিদে সন্ধ্যার সময় তাঁকে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। ঘরে আলো নেই। তাই একটি মোমবাতির জন্য তিনি কাছের দোকানে এগিয়ে গেলেন--

—এ কি? দোকানীকে মোমটির জন্য আমি মাত্র এক ফ্লোরিন দিয়েছিলাম। এ যে দেখছি মোমটির সঙ্গে ও আমাকে পাঁচ শিলিং ফেরৎ দিয়েছে। ছোট্ট দোকানীটি ভুল করে দিয়েছে। —এটা নেওয়া কি ঠিক হবে? না, তা সম্ভব নয়, কিছুতেই নয়।···কেন নয়? দুনিয়াতে সকলেই কি নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিক মত মেনে চলছে? তবে কেনই বা এত বৈষম্য? কেনই বা এ ক্ষুধা?

সাহিত্যিক পাঁচ শিলিং পকেটে পুরে নিঃশব্দে ফিরে এলেন। এবার তিনি একটি হোটেলে আস্তানা নিলেন। কিন্তু দু'দিনেই তিনি আবার নিঃস্ব হলেন। হোটেলের মালিককে তিনি আশ্বাস দিলেন—নাটকটি লেখা শেষ হলেই তিনি তার প্রাপ্য সব শোধ করে দেবেন।

ক'দিন বাদে এক রাত্রে হোটেলওয়ালী তাঁর ঘরে এক নাবিককে নিয়ে এলেন। সাহিত্যিককে তিনি তাঁর বাইরের ঘরে সাময়িক

আশ্রয় দিলেন। বাড়ীর চাকরের দয়ায় তিনি অবশ্য মাঝে মাঝে খেতেও পেতেন। কিন্তু এক সন্ধ্যায় এল চরম বিপর্যয়!

বাড়ীর কর্তা বৃদ্ধ তায় বাতে পঙ্গু। অসহায় ভাবে তিনি এক কোণে শুয়ে থাকেন। হঠাৎ একদিন বাড়ীর একদল ছেলেমেয়ে বৃদ্ধকে নিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে খেলা শুরু করে। খেলা নয়, বৃদ্ধের প্রতি অমানুষিক উপদ্রব। সাহিত্যিক ছেলেদের বাধা দিলেন। তাদের সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করলেন। তা শুনে, বাড়ীর কর্ত্রী—হোটেলওয়ালী ছুটে এসে সাহিত্যিককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

—না, এ অপমান অসহ্য! আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে এখানে থাকা আর চলে না।···ভাবতে ভাবতে সাহিত্যিক জাহাজ ঘাটে এসে হাজির হলেন। ইংলণ্ডমুখী একটি মালবাহী জাহাজে এক ফালি জায়গাও তিনি পেয়ে গেলেন।

এবার তাঁর টুকিটাকি জিনিস নিয়ে যাবায় জন্য হোটেলের দিকে ফিরলেন। হোটেলের সিঁড়ির মুখে ডাক পিওনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। পিওন তাঁর হাতে একটি চিঠি দিল।

—চিঠির ঠিকানাটা দেখছি কোন মেয়ের হাতের লেখা!

চিঠিটা খুলে দেখলেন তার ভেতর এক 'পাউণ্ড'। সেই পাউণ্টি সহ চিঠিটা তুমড়ে হোটেলওয়ালীর মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে সাহিত্যিক বেরিয়ে এলেন।

পাপ-পুণ্য

ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পাল আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France)-এর 'দি ক্রাইম্ অব সিলভ্যাস্ট্রী বনার্ড' (The Crime of Sylvestre Bounard), ১৮৮১, উপন্যাসের কাহিনী।

জ্ঞানগর্ভ পুরোনো তথ্যবহুল বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে যৌবন কবে তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে গেছে সিলভ্যাস্ট্রী বনার্ড তা টের পায় নি। বইয়ের বাইরের জগতের সঙ্গে বনার্ডের বিশেষ পরিচয় নেই। তিনি অকৃতদার। বাড়ীতে আছে টেরেসী ঝি। তারই তত্ত্বাবধানে সংসার চলে স্বচ্ছন্দ গতিতে।

একদিন বনার্ড তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বসে গভীরভাবে পড়া-শুনা করছেন, এমন সময় একজন পুস্তক-বিক্রেতা ঘরে ঢুকে কয়েকটি সুলভ সংস্করণের বই দেখাল বনার্ডকে। কোন বইয়ের প্রতি বনার্ড আকর্ষণ বোধ করলেন না বটে কিন্তু লোকটির দারিদ্র্য তাঁর মনকে নাড়া দিল।

—'টেরেসী, শোন, তুমি ঐ লোকটিকে চেন?' উৎকণ্ঠা জড়ান কণ্ঠে বনার্ড ঝিকে ডেকে শুধান।

'হাঁ, লোকটি খুব দুঃস্থ, নাম কোকূজ। সে সপরিবারে থাকে ঐ দিকের একটি বহু পুরানো বাড়ীর জীর্ণ চিলে কুঠিতে; বর্ষায় সে ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে আর শীতে ওরা সে-ঘরের ভিতরে থেকেও ঠাণ্ডায় হিম হয়। ওর স্ত্রী সদ্য একটি সন্তান প্রসব করেছে। বেচারার কাঠ কেনবারও পয়সা নেই, তাই এ সময় ওর স্ত্রীর একটু আগুনও জোটে না। কেন আপনি ওর খবর জানতে চাইছেন?' এক নিঃশ্বাসে ঝি কর্তাকে বলে যায়।

—'টেরেসী, তুমি যাকে দিয়ে হোক এক্ষুনি ওদের দু' মণ জ্বালানি কাঠ পাঠিয়ে দাও, দেরী করো না।'

এ ঘটনার ক'দিন বাদে জানা গেল কোকূজ মারা গেছে। খবর পেয়ে বনার্ড একদিন নিজে গেলেন শোকার্ত নারীকে তাঁর সমবেদনা জানাতে। কষ্ট করে তাঁকে অবশ্য আর উপরে উঠতে হল না। সিঁড়ির গোড়ায় মহিলাটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়।

'হাঁ, সেদিন ঐ জ্বালানি কাঠ পাঠাবার জন্য আপনাকে এতদিন ধন্যবাদ জানাবার অবকাশ পাইনি। কিছু মনে করবেন না। এই দেখুন, আমার ছেলে। তা আপনি এ দিকে কোথায় এসেছিলেন', তরল কণ্ঠে, স্মিত মুখে তরুণীটি বনার্ড-এর সঙ্গে কথা বলে যায়।

বনার্ড সদ্য বিধবার চোখে মুখে খুঁজে পান না কোন শোকের ছায়া। তাঁর মনে হল সুন্দরীর ভক্তের সংখ্যা কম নয়। তাদেরই একজনের জন্য হয়ত সে তখন প্রতীক্ষা করছে। ভদ্রতাসূচক ছোট্ট একটি ধন্যবাদ মহিলাটিকে জানিয়ে বনার্ড সেখান থেকে বাড়ী ফিরে এলেন।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে মেয়েটির সঙ্গে বনার্ডের আর দেখা হয়নি। তিনি তাকে ভুলে গেছেন। বনার্ড নিজের কাজে ডুবে থাকেন। তাঁর জগৎ ভিন্ন, অন্য জগতের খবর রাখবার তাঁর সময় কোথায়?

দশ বছর পরের কথা।

একদিন বইয়ের একটি ক্যাটালগ ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে একটি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নামের প্রতি: 'গোল্ডেন লেজেণ্ড', ছাপা আকারে নয়, বইটি একটি ম্যানিউস্ক্রিপ্ট্ বলে উল্লেখিত। তা' হোক।

বইটি পাবার জন্য বনার্ড ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। সন্ধান করে জানলেন, বইটির মালিক জনৈক সিনর পলিৎসি। থাকেন তিনি সিসিলিতে।

সঙ্গে সঙ্গে বনার্ড তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সিসিলি থেকে চিঠি এল :

'দুঃখিত, বইটি আমি হাত ছাড়া করব না। তবে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে বইটি দেখে বা ব্যবহার করে যেতে পারেন'।

বনার্ড বুঝলেন বইটি কেনা সম্ভব নয়। অথচ সিসিলিতে যাবার পথ মোটেই আরামের নয়। সে পথ দীর্ঘ, তা বড়ই কষ্টকর। তবুও বই-পাগলা বনার্ড 'কুছ্ পরোয়া নেই' বলে একদিন সিসিলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন বইটি দেখবার জন্য।

দীর্ঘ পথ ভেঙ্গে বনার্ড এক সময়ে সিসিলিতে পৌঁছুলেন। শ্রান্ত মনে বনার্ড ভাবেন, কে জানে সিনর পলিৎসির বাড়ী এখনও কতদূর?

খানিক বাদেই সেখানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল ট্রীপফ-এর রাজকুমার আর তাঁর অপরূপ রূপবতী রাণীর সঙ্গে। জানলেন এঁরা খেয়াল খুশীমত দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ান। রাজকুমারের সখ বিচিত্র—নানা জায়গা থেকে তিনি খালি-দেশলাইয়ের বাক্স সংগ্রহ করেন। রাণী বনার্ডের কাছে তাঁদের ভবঘুরে জীবনের প্রতি একটু কটাক্ষ করলেও তিনি তাঁর স্বামীর সুখ্যাতিই করলেন।

রাণীর দিকে এক পলক তাকিয়ে বনার্ড একটু আনমনা হন। না, এঁকে কোথাও দেখেছেন বলে তাঁর মনে হয় না। অন্ততঃ বহু বছর আগে সেই বড় বাড়ীটির সিঁড়ির গোড়ায় দেখা মহিলাটির সঙ্গে রাণীর কোন সাদৃশ্য বনার্ড খুঁজে পান না।

সেখান থেকে প্রায় দশ মাইল খচ্চরের পিঠে চড়ে বনার্ড এক সময় সিনর পলিৎসির বাড়ী এসে হাজির হন। এবার তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কিন্তু স্বস্তি কোথায়? জানলেন, বইটি সেখানে নেই। মালিকের ছেলে কিছুদিন আগে প্যারীতে একটি বইয়ের দোকান খুলেছে। সিনর সে বইটি ছেলের দোকানে বিক্রীর জন্য পাঠিয়েছেন। বইটি পাঠিয়েছেন তিনি বনার্ডকে আমন্ত্রণ চিঠিটি ছাড়বার অনেক আগে।

সিনরের উক্তি শুনে বনার্ড অবাক হন। তাঁর বাড়ী থেকে ছেলেটির বইয়ের দোকানের দূরত্ব দু'মাইলও হবে না। ক্ষুব্ধ মনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিনরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন।

ফিরবার পথে সেই রাণীর সঙ্গে আবার দেখা। সিনর পলিৎসির অদ্ভুত আচরণের কথা বনার্ড তাঁকে সব খুলে বলেন। রাণী আগ্রহভরে তাঁর সব কথা শুনলেন, কিন্তু কিছু মন্তব্য করলেন না।

প্যারীতে ফিরে বনার্ড ছুটে গেলেন সেই বইয়ের দোকানে। দূর থেকে বইটি তিনি দেখলেন। কিন্তু সেটি কিনতে চাইতে দোকানদার জানাল,—বইটি এক্ষুনি বিক্রী করা হবে না, ওটি নীলামে দেওয়া হবে।

বনার্ড দমবার পাত্র নয়। নির্ধারিত দিনে এসে হাজির হলেন নীলামে। প্রথমেই তিনি বইটির মূল্য একসঙ্গে ছ'হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে চাইলেন। বনার্ড ভাবলেন তিনি আশাতীত মূল্য নির্ধারণ করেছেন, তার চেয়ে বেশী নিশ্চয়ই আর কেউ বলবে না।

কিন্তু বনার্ডকে অবাক হ'তে হয়। তাঁর পাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আরও বেশী দাম দিতে চাইল। তাঁর মনে হল লোকটি যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে বইটি কিনতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

বিষণ্ন মনে বনার্ড বাড়ী ফিরে এসে আবার নিজের কাজে মন দিতে চেষ্টা করেন। এমন সময় একটি ছোট্ট ছেলে ঘরে ঢুকে বনার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বলল,—

'নমস্কার। দয়া করে এই প্যাকেটটি নিন। এটি আমার মা আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

প্যাকেটটি বনার্ডের সামনে রেখে ছেলেটি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।

বনার্ড ছেলেটিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখবার অবকাশও পেলেন না। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বনার্ড দ্বিধাগ্রস্তভাবে প্যাকেটটি আস্তে আস্তে খুলতে প্রথমে বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটি কার্ড ঃ 'প্রীতি

উপহার,' সেটি ট্রীপফের রাণীর স্বাক্ষর বহন করছে। আরও খুলতে বেরিয়ে এল সুন্দর দামী মখমলে জড়ান সেই 'গোল্ডেন লেজেণ্ড'।

বনার্ড হতভম্ভ। ভাবছেন এও কি সম্ভব। ঠিক সেই সময় ঝি এসে কর্তার মোহ ভঙ্গ করল।

'কর্তা, মাদাম কোকূজকে বাইরে একটি দামী গাড়ীর ভিতর বসা দেখে এলাম। ওর ছেলেটিকে তো এই মাত্র আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। এতদিন পরে…' টেরেসীর বক্তব্য শেষ হল না। কর্তা তার মুখের কথা কেড়ে নেন—

'মাদাম কোকূজ? এতো দেখছি ট্রীপফের রাণী'।

বনার্ডের মাথা গুলিয়ে যায়। বিমূঢ় ভাবে তিনি ঝি'র দিকে তাকিয়ে থাকেন, মুখে তাঁর নীরব প্রশ্ন।

'না, ছেলেটি উঠতেই তক্ষুনি গাড়ীটি চলে গেল।' শান্ত কণ্ঠে ঝি জানায় মনিবকে।

আরও কিছুদিন পরের কথা। মঁসিয়ে দ্য গ্যাব্রী বনার্ডকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর পল্লীর বাড়ীতে অগোছাল গ্রন্থাগারটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে বইগুলির একটি সূচী করে দেবার জন্য। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বনার্ড আনন্দে ছুটে যান সেখানে।

সেদিন টেবিলে বসে কাজ করতে করতে বনার্ড দেখেন একটি সুন্দর ছোট্ট পরী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কেমন দুষ্টু হাসি হাসছে। সে বলছে,—'তুমি কি বোকা বলতো? ছিঃ ছিঃ দিন রাত বসে বসে তুমি এই একঘেঁয়ে কাজ কর', এই কথা বলে ছোট্ট পরীটি বনার্ডের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসে।

তন্দ্রা ছুটে যেতে বনার্ড লাফিয়ে ওঠেন। কিন্তু কোথায় পরী? বুঝতে পারলেন, ঘরের ভিতর হাওয়া ঢুকতে কালির দোয়াতটি উল্টে গিয়ে তাঁর জামাটা সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে। তা হোক্।

পরীটির দেখা পেলেন না বটে কিন্তু সেই স্বপ্নের মধুর রেশটুকু

রয়ে গেল বনার্ডের মনে। এক সময় সেই স্বপ্নের কথা মাদাম গ্যাব্রী শুনলেন বনার্ডের কাছ থেকে।

হু' দিন বাদে বনার্ড সান্ধ্য ভ্রমণ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। দেখেন, ঘরের ভিতর সুন্দর একটি ছোট্ট মেয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকিয়ে আছে, মুখে তার সেই মিষ্টি হাসি। পাশ থেকে এগিয়ে এসে মাদাম বলেন, আপনার জন্য একটি উপহার, সেই স্বপ্নে দেখা দুষ্টু পরী—তবে ওর ডানা দুটি নেই এই যা!

বৃদ্ধ বনার্ড মুগ্ধ দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকেন মেয়েটির দিকে। তারপর তাঁর ইঙ্গিতে লাজুক মেয়েটি এগিয়ে আসে বনার্ডের পাশে। বনার্ড তাকে বুকে তুলে নেন।

মমতা জড়ান কণ্ঠে মাদাম বলে যান ছোট্ট মেয়ে জেনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : জানেন, মেয়েটি বড় দুঃখী, ওর আত্মীয় স্বজন এখন আর কেউ বেঁচে নেই। মাদাম ক্লীমেণ্টাইনের নাতনী হয়েও…

ক্লীমেণ্টাইনের নাম শুনে বনার্ড আঁতকে ওঠেন। তিনি কেমন আনমনা হয়ে যান। বনার্ড মনে মনে সঙ্কল্প করেন যেমন করে হ'ক এই ছোট্ট অনাথ মেয়েটিকে মানুষ করতে হবে। তাঁকে নিতে হবে ওর সব ভার।

এই ঘটনার দু'দিন বাদে মাদাম গ্যাব্রীকে নিয়ে বনার্ড প্যারীতে এলেন বেড়াতে। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মাদামকে নিয়ে এলেন ক্লীমেণ্টাইনের কবরস্থানে। শ্রদ্ধাভরে দু'জনে ছড়িয়ে দিলেন ফুল সেই কবরের উপর। তারপর তাঁরা বসলেন সেই কবরের পাশে। শান্ত পরিবেশ। দু'জনই মৌন। এক সময় বনার্ড ভাঙ্গলেন সেই নীরবতা। 'একটা পুরনো গল্প শুনবেন মাদাম?'

—"আমি তখন যুবক। ক্লীমেণ্টাইনের মা গত হয়েছেন। ওর বাবার শরীরও ভাল নয়, মাঝে মাঝে পেটের অসহ্য ব্যথায় কষ্ট পায়। বাপ আর মেয়ে একদিন আমার বাবার বাড়ীর ভাড়াটে হয়ে এল। দিন যায়। তখন আমি অত্যন্ত লাজুক ছিলাম তাই মুখ ফুটে

ক্লীমেণ্টাইনকে কিছু বলতে সাহস পাইনি। ক্লীমেণ্টাইন কিন্তু বুদ্ধিমতী ছিলেন। আমার মনের কথা বুঝতে ওঁর অসুবিধা হয়নি। আমি নিজে থেকে ওকে বলবো বলে ভাবছি। আমার দুর্ভাগ্য। ঠিক সেই সময় একদিন হঠাৎ একটি তুচ্ছ রাজনৈতিক কারণকে কেন্দ্র করে ওঁর বাবার সঙ্গে আমার কাকার হল তুমুল ঝগড়া। ব্যস্, পরের দিন ক্লীমেণ্টাইনকে নিয়ে ওঁর বাবা কোথায় যে চলে গেলেন··· তারপর ক্লীমেণ্টাইনের সঙ্গে আর কোনদিন আমার দেখা হয়নি।—" আবেগ জড়ান কণ্ঠে বৃদ্ধ বনার্ড এই পর্যন্ত বলে থেমে যান। খানিক বাদে মাদামকে প্রশ্ন করেন, "এবার বলুন—এই অনাথ শিশুটিকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি ?"

"বর্তমানে একজন রিসিভার জেনীর অভিভাবক। তার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে।"—সমবেদনার কণ্ঠে মাদাম জানান।

রিসিভারের সাহায্যে বনার্ড প্রতি বৃহস্পতিবার জেনীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পান। এখন ছুটির দিনে শিক্ষয়িত্রী নিজেই নিয়ে আসেন জেনীকে বনার্ডের বাড়ীতে। তিনি বনার্ডের সঙ্গে মিশতে চান অন্তরঙ্গ ভাবে। একদিন তিনি বনার্ডের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করতেও দ্বিধা করেন না। সে-প্রস্তাব শুনে বনার্ড চম্‌কে উঠেন। নির্লিপ্ত কণ্ঠে তিনি মহিলাটিকে বলেন ঃ

'মাপ করবেন, আপনি কি আজ অসুস্থ বোধ করছেন ? আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব কি ?'

জেনীকে নিয়ে শিক্ষয়িত্রী আহত হৃদয়ে হোস্টেলে ফিরে আসেন। পরের দিন থেকে বনার্ড জেনীর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পান না। শিক্ষয়িত্রীর এই আচরণের বিরুদ্ধে জেনীর তথাকথিত অভিভাবকের কাছে নালিশ করেও কোন ফল হয় না। দিন যায়। কোন এক বর্ষার দিনে বনার্ড কৌশলে জেনীকে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে একেবারে ম'সিয়ে গ্যাব্রীর বাড়ী এসে হাজির হন।

বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটা আপোষ মীমাংসা করবার উদ্দেশ্যে রিসিভারের খোঁজে গিয়ে গ্যাব্রী জানতে পারেন যে জেনীর সম্পত্তির সবটুকু শুষে খেয়ে রিসিভার কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

এবার আইনসঙ্গত ভাবে বনার্ড জেনীর অভিভাবক হন। জেনীকে নিয়ে তিনি নিজের বাড়ী ফিরে এলেন।

হেনরী গেলিশ একজন তরুণ গবেষক। একদিন সে তার প্রবন্ধ নিয়ে এল বনার্ডের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। ঘরে ঢুকে ছাত্রটি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুন্দরী জেনীর দিকে। সে ভুলে যায় তার আসল প্রয়োজনের কথা। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে বনার্ডের কাছে প্রস্তাব করে জেনীর পাণি-প্রার্থী হিসাবে, নাই বা থাক জেনীর যৌতুক দেবার কোন সঙ্গতি।

বনার্ড জানেন, নব দম্পতির অর্থের প্রয়োজন। তাই স্থির করলেন, তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাগারটি বেচে জেনীকে দেবেন যৌতুক। সাধের গ্রন্থাগারের প্রতিটি বইই তাঁর প্রিয়। তার মধ্যে একটি বইয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। সে আকর্ষণ দুর্জয়। তাই বিক্রীর দিন গ্রন্থাগার থেকে কম্পিত হস্তে তিনি সযত্নে সরিয়ে রেখে দিলেন সেই বিশেষ বইটি।

ওদের দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বনার্ড-এর জীবনের প্রতি থাকে না আর কোন মোহ। সহর ছেড়ে তার উপকণ্ঠে এক ছোট্ট নিরিবিলি পল্লী অঞ্চলে এসে তিনি আশ্রয় নেন।

বছরে দু'বার করে জেনী আর তার স্বামী বৃদ্ধ বনার্ডের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ওদের একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছিল। কিন্তু তা অকালে ঝরে গেছে।

বনার্ড কিন্তু শিশুর দোলনাটি এখনও সেই আগেকার জায়গাতেই যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। আনমনা ভাবে রোজ দু' একবার দুলিয়ে

দেন সেই দোলনাটি। কখনও বা বনার্ড নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে ভাবেন, ওদের দু'জনেরই বয়স অল্প, ওরা যৌবনপুষ্ট, জেনীর কোলে আবার আসবে ছেলে। সেই শিশুর মধুর হাসিতে মধুময় হবে ওদের সংসার, তখন দুলে উঠবে এই দোলনাটি।

শেষরক্ষা

স্প্যানিস নাট্যকার ইয়াসিন্তো বেনাভেন্তে (Jacinto Benavente)-এর 'বণ্ডস্ অব ইণ্টারেস্ট' (The Bonds of Interest), ১৯০৭, নাটকের গল্পরূপ।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ইতালীর কাহিনী—

লেণ্ডার এবং ক্রীসপীন অন্তরঙ্গ বন্ধু। উভয়ের মাথাই শঠ বুদ্ধিতে পুষ্ট। দু'জনের মধ্যে ক্রীসপীন কিছুটা বাস্তববাদী।

এক সময় কি করে এই মানিক জোড় কোন এক আজব দেশে এসে হাজির হল। সেই বিদেশ বিভূঁয়ে দু'জনের পকেটই শূন্য। তবুও তারা ঘাবড়াবার পাত্র নয়।

ক্রীসপীন বন্ধুকে জানায়,—আসলে জগৎ শুধু তাদের মত দীন-হীন লোকদের নিয়ে নয়; বড়লোকদেরও একটি ভিন্ন দুনিয়া আছে—সেখানে নেই কোন অভাব, অভিযোগ বা কোন হাহাকার। ভাগ্যের সন্ধানে কি করে সে জগতে মাথা গলান যায়।

বন্ধুর উক্তি শুনে লেণ্ডার লাফিয়ে উঠে বলে, 'আরে—এর জন্য তুমি এত ভাবছো? তুমি একটি পাসপোর্ট চাও, এই তো? তা আমি জানতাম। আমার সঙ্গে কয়েকটি বিশিষ্ট লোকের পরিচয় আছে। তাদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছি। এগুলি নিয়ে আমরা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সহজেই দেখা করে বাজীমাৎ করতে পারি। বন্ধু, এবার হাত মেলাও।'

—'তোমার যেমন বুদ্ধি···' বন্ধুর কথা ক্রীসপীন ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে দেয়। গম্ভীর ভাবে সে বলে—

'তোমার বুদ্ধি রাখ। আমার কথা শোন। তোমাকে কোন এক

বিশিষ্ট অভিজাত লোকের ভূমিকায় একটু অভিনয় করতে হবে। মনে রাখবে, তুমি কোন এক বিশেষ জরুরী কাজে এ সহরে এসেছো। তোমার সফর রহস্যময়; খুব কম কথা বলবে, তুমি চলবে গম্ভীর ভাবে। আমি হব তোমার অনুগত বিশ্বস্ত ভৃত্য। সব কিছু আমিই করব। তুমি শুধু আমার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে যাবে। আমি যেমন বলব তুমি ঠিক তেমনি ভাবে চলবে। ব্যস্, তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।

লেণ্ডার বলে, তথাস্তু!

সে দিন রাতের অন্ধকারে 'জয় গুরু' বলে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু চলবে কি করে, দু'জনের পেটেই তখন ক্ষুধার আগুন জ্বলছে।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ওরা দেখতে পায় একটি চলন-সই হোটেল। ক্রীস্পীন লেণ্ডারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে খুব জোরে জোরে সেই হোটেলের কড়া নাড়তে সুরু করে। তাতেও কোন সাড়া না পেয়ে এবার সে দরজার উপর ঘন ঘন লাথি মারে। হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুলে হোটেলের মালিক বেরিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে ক্রীসপীন তাকে প্রথমে অকথ্য ভাষায় গালি দেয় তারপর উত্তম মধ্যম।

মালিক হতভম্ব। বেচারী কিছু বলবারও অবকাশ পায় না।

—'ব্যাটা নচ্ছার, পাজী কোথাকার। তোমার দরজার বাইরে এই সম্ভ্রান্ত জমিদার কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে? তোমার এতবড় আস্পর্ধা! দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।' লেণ্ডার বুঝতে পারল তার ওষুধে কাজ হয়েছে।

—কসুর মাপ করবেন, হুজুর। দয়া করে ভিতরে আসুন, হুজুর। আমি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে ম্যানেজার হোটেলের শ্রেষ্ঠ ঘর দু'টির দিকে এগিয়ে যায়; তাদের জন্যে সে বিশেষ খাবারের আদেশ দেয়।

অনেকদিন পরে পেট ভরে সেই সুখাদ্য খেয়ে দুই শঠের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। নিশ্চিন্ত আরামে হোটেলে ওদের দিন কাটে।

ক'দিন বাদে সেই হোটেলের দোরে এসে হাজির হল এক কবি আর মিলিটারীর এক ক্যাপ্টেন—আশ্রয়ের আশায়।

ম্যানেজারের বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওরা সঙ্গতিহীন। সে তাদের সাফ জানিয়ে দেয় ঠাঁই নেই।

দূর থেকে ক্রীস্পীন সব কিছু লক্ষ্য করছিল। ওদের দু'জনের দুরবস্থা দেখে ওর কেমন মায়া হল—ওরা দু'জন যে তাদেরই সগোত্র। এগিয়ে এসে ক্রীস্পীন চোখ রাঙ্গিয়ে ম্যানেজারকে বাধ্য করল সেই কবি আর ক্যাপ্টেনকে আশ্রয় দিতে, খাদ্য দিতে।

—'ম্যানেজার, ওদের বিলের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না; সে দায়িত্ব আমার দয়ালু মনিবের', গম্ভীর কণ্ঠে ক্রীস্পীন ম্যানেজারকে জানায়।

তার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে নতুন অতিথি যুগল কৃতজ্ঞ। বিনিময়ে ক্রীস্পীনকে তারা বন্ধুত্বের আশ্বাস দেয়।

'ক্রীস্পীন, তুমি অযাচিত ভাবে এদের দু'জনকে সাহায্য করলে কেন', লেণ্ডার শুধায়।

'জান, জীবনসংগ্রামে মসী আর অসি-র একান্ত প্রয়োজন। ওদের দু'জনকে সাহায্য করলাম এদের গরজে নয়, আমাদের স্বার্থে।' বুদ্ধিমানের মত ক্রীস্পীন বন্ধুকে জানায়।

ডোনা সীরিনা সহরের একজন বিশিষ্টা অভিজাত মহিলা। বিধবা মহিলাটি থাকেন সহরের আর এক প্রান্তে। তার সঙ্গে থাকে কলোম্বাইন, তার অনুগতা ঝি, সঙ্গীও বটে। ঘটনাচক্রে মহিলাটির অবস্থা ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু তার প্রভাব কম নয়।

ঝি একদিন মহিলাটিকে জানাল, বাকীতে আর কেউ কোন জিনিস দিতে চাইছে না ; বাড়ীর চাকর, বাবুর্চিরাও আজ নোটিশ দিয়েছে। তারা সকলেই তাদের বহুদিনের বাকী টাকার জন্য জোর তাগিদ দিচ্ছে।

খবর শুনে শ্রীমতী ডোনা গম্ভীর হন। তাঁর বলবার কিছুই নেই। তাঁর আর্থিক দুরবস্থার কথা তাঁর চেয়ে কারুর বেশী জানবার কথা নয়।

কিন্তু মুস্কিল হল, শ্রীমতী ডোনা ঐ দিনই তাঁর বাড়ীতে ব্যয়বহুল একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন ধনকুবের সিনর পলিচিনেলি ও তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী একমাত্র মেয়ে সীলভিয়া এবং মান্যগণ্য আরও ক'জন। উদ্দেশ্য, এই সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁর কোন আত্মীয় বা বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে সীলভিয়ার বিয়ের ঘটকালি করে ভদ্রভাবে কিছু অর্থ উপার্জন করা। এ আয়োজন পূর্ব-পরিকল্পিত, হঠাৎ হয়নি।

কবি হারলিকুইন কলোম্বাইনের প্রেমিক। সে কলোম্বাইনকে আশ্বাস দিয়েছিল সীলভিয়ার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচিত করতে সে তার মনিবকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

নির্দিষ্ট দিনে কলোম্বাইন তার প্রেমিকের দেখা পেল না। তার স্থানে দেখল এক অপরিচিত পুরুষ। কলোম্বাইনকে দেখে সেই পুরুষটি এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দেয়—হারলিকুইনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে, তার নাম ক্রীস্‌পীন।

ক্রীস্‌পীন জানাল, তার প্রভু একজন বিশিষ্ট জমিদার। তিনি যদি এই প্রীতি-সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হন, তাহলে ক্রীস্‌পীন কলোম্বাইনের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। সে আরও জানাল—তার প্রভুও সীলভিয়ার অনুরাগী, তার পাণি-প্রার্থী ; প্রভুর সঙ্গে সীলভিয়ার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলে তিনি শ্রীমতী ডোনাকে দেবেন আশাতীত দক্ষিণা, তাঁর ঘটকালির জন্য।

সব শুনে কলোম্বাইন খুশীমনে তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ক্রীস্পীনের মাধ্যমে সে সেই প্রভুকে জানায় সাদর অভ্যর্থনা।

সত্যিই ব্যবস্থার কোন ত্রুটী হল না। নির্ধারিত অনুষ্ঠান সমারোহে শুরু হয়। ক্রীস্পীনকে সঙ্গে নিয়ে লেণ্ডার এক সময় এসে হাজির হল সেই উৎসবে। ধূর্ত ক্রীস্পীন এসেই শ্রীমতী ডোনার হাতে গুঁজে দেয় একটি অঙ্গীকার-পত্র; তাতে বলা হয়েছে, বিয়ের শেষে লেণ্ডার তাঁকে দেবে একটি মোটা টাকার দক্ষিণা। এ ছাড়া আরও অর্থ তাঁকে দেওয়া হবে লেণ্ডারের ভাবী শ্বশুরের মৃত্যুর পরে।

শ্রীমতী ডোনা লেণ্ডারের পরিচয় জানেন না। তবু তার কাছ থেকে আশাতীত অর্থের প্রতিশ্রুতি পেয়ে অপরিচিত লেণ্ডার হয়ে ওঠে তাঁর পরম প্রিয়, আত্মার আত্মীয়। ছুটে গিয়ে তিনি লেণ্ডারকে জানান সাদর অভ্যর্থনা, ভাব দেখান যেন তিনি এতক্ষণ তারই জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন।

ক্রমে উৎসব জমে ওঠে। সকলের চোখে-মুখে সেই একই প্রশ্ন: কে এই ভাগ্যবান রহস্যময় পুরুষ, যে সকলের অজান্তে সীলভিয়ার হৃদয় জয় করেছে। তবুও কনের কৃপণ বাপ ছাড়া সকলেই তাদের মধুর মিলনের সম্ভাবনায় খুশী হয়।

প্রথম দর্শনেই সীলভিয়া সুদর্শন লেণ্ডারের প্রেমে পড়ে গেল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। কনের মা মেয়ের পছন্দ অনুমোদন করে, সমর্থন করে না স্বামীর স্থূল বুদ্ধিকে। মা মেয়েকে দেয় এগিয়ে যাবার উৎসাহ।

ক্রীস্পীন ভেবে পায় না এই মিলনের একমাত্র বাধা কনের বাপকে কি করে সে বাগে আনবে। তাই সে তার কাছে সব ব্যাপারটা অস্পষ্ট রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

লেণ্ডারের সঙ্গে বিয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও ক্রীস্পীন নিশ্চিন্ত হতে পারে না। সে ভাবে, যত গোল ঐ কৃপণ বাপকে নিয়ে।

হঠাৎ ক্রীস্‌পীনের মাথায় এক কূটবুদ্ধি খেলে যায়। সে স্থির করে, যেমন করে হোক কনের বাপের বিরুদ্ধে বদনাম ছড়াতে হবে। সে সকলকে জানিয়ে দেবে, ঐ বাপ লেণ্ডারকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে ; বাপ হয়ে সে করছে তার মেয়ের সঙ্গে শত্রুতা।

এ দিকে মানিকজোড় আজব দেশে আসা অবধি পাওনাদারদের একটি কানাকড়িও দেয়নি। ফলে, তারা এখন বিরক্ত করছে। ও দিকে শ্রীমতী ডোনাও বিয়ে সেরে ফেলবার জন্য ঘন ঘন তাগিদ দিচ্ছেন। শুভ কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার জন্য সীলভিয়াও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। শুধু কি তাই ? শ্রীমতী ডোনা আরও জানিয়েছেন, দেরী হলে সব কিছু পণ্ড হবার আশঙ্কা আছে ; মেয়ের বাপ নাকি উকিল লাগিয়েছে—লেণ্ডারের সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জন্য।

সব শুনে ক্রীস্‌পীন ভাবে, সর্বনাশ !

এই গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে সীলভিয়া নিজেই একদিন এসে হাজির হয় লেণ্ডারের কাছে। সীলভিয়াকে দেখে লেণ্ডার হয় অপ্রস্তুত। মিথ্যার জাল ছড়িয়ে এরকম ভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করায় সে নিজেকে অপরাধী বলে বোধ করে। লেণ্ডার সঙ্কুচিত হয়ে সীলভিয়াকে জানায় অভ্যর্থনা। ঠগ হলেও প্রিয়তমাকে প্রবঞ্চনা করতে তার মন সায় দেয় না। বিমূঢ় লেণ্ডার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সব কিছু তাকে খুলে বলতে শুরু করে,—

ঠিক এমনি সময়ে বাইরে বিক্ষুব্ধ পাওনাদারদের চেঁচামেচিতে সে বাধা পায়।

ক্রীস্‌পীন ছুটে এসে ওদের দু'জনকে দুদিকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় ওদের সামনে। মারমুখী জনতা সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর। তারা চায় প্রভু-ভৃত্যকে জেলে পুরতে, চায় ছিনিয়ে নিতে তাদের যা-কিছু সব।

ক্রীস্‌পীন কিন্তু তার সঙ্কল্পে অটল, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলে,—দয়া করে আমার একটি কথা আপনারা

শুনুন ঃ আমাদের দু'জনকে মেরে বা শাস্তি দিয়ে আপনাদের কতটুকু লাভ হবে জানি না ; সে বিচার আপনাদের উপর। তবে তাতে করে আপনাদের প্রাপ্য টাকা পাবেন কি ? নিশ্চয়ই পাবেন না। আমি বলছি, আপনাদের এবং আমাদের পরস্পরের স্বার্থের খাতিরে আগে এদের দু'জনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে। আপনারা সকলে মিলিত ভাবে সাহায্য করুন। তাহলে লেণ্ডারের হাতে আসবে প্রচুর অর্থ এবং তখন আপনারা প্রত্যেকেই নিজের প্রাপ্য টাকা পুরোপুরি পেয়ে যাবেন। অন্যথায় এক কানাকড়িও না।

তার উক্তিতে যেন সাপের মাথায় ধূলো পড়ে। বিক্ষুব্ধ পাওনা-দাররা সকলে শান্ত হয়। ক্রীস্‌পীনের প্রস্তাবের মধ্যে সকলে খুঁজে পায় আশ্বাসের সুর। সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কনের বাপের উপর। জোর করে তারা আদায় করল এ বিয়েতে তার সম্মতি ; সে রাজী হল লেণ্ডারকে যথেষ্ট অর্থ দিতে, যৌতুক হিসাবে।

তবুও লেণ্ডার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে প্রিয়তমাকে জানাতে চায় তার আসল পরিচয়।

কিন্তু লেণ্ডারের সব সংশয় দূর করে দেয় সীলভিয়া। স্নিগ্ধকণ্ঠে সে জানায়,—তুমি সকলের স্বার্থের বন্ধন ; তোমার মধুর ব্যবহারে ওরা সকলে খুশী, আমিও মুগ্ধ। তোমার প্রেমে আমি ধন্য, মা খুশী। সব পরিচয় মিথ্যা ; সত্যি শুধু তোমার এই প্রেমের বন্ধন—জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধন। সে বন্ধন অস্বীকার করবার আমার শক্তি কোথায় ? প্রিয়তম, তোমার সেই প্রেমের গরবে আমি গরবিণী। তুমি দূর কর তোমার এই মিথ্যা সঙ্কোচ। আমাকে তুমি গ্রহণ কর।

বাহুলগ্ন হয়ে ওরা দু'জনে এগিয়ে যায় সীলভিয়ার মা আর বাবার কাছে—প্রার্থনা করে তাদের আশীর্বাদ।

চাষী

পোল্যাণ্ডের অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক ল্যাডিস্‌লাস রেমঁ (Ladislas Reymont)-এর 'দি পেজন্‌টস্ (The Peasants), ১৯০২-০৯ চার খণ্ড উপন্যাস-মালার সংক্ষিপ্তসার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কথা। তখন শরৎ কাল।

পোল্যাণ্ডের লীপ্‌কা পল্লী অঞ্চলের চাষীরা তাদের ফসল কাটায় ব্যস্ত। যেমন করে হোক শীত আসবার আগেই সব ফসল ঘরে তুলতে হবে।

মেথীয়াস্ লীপ্‌কা পল্লীর একজন বনেদী চাষী। একদিন কেমন ক'রে সে জমিদারের একটি গরু বাগিয়ে এনেছিল। কিন্তু গরুটি তার বরাতে সইল না; ক'দিন বাদে গরুটি হঠাৎ দু' একবার দাপাদাপি করে মরে গেল। খবর পেয়ে সব চাষী ভাই মেথীয়াসের বাড়ী এসে গরুটিকে ঘিরে ভীড় জমাল। গরুটির মৃত্যুতে তার পুত্রবধূ হংকাই যেন আঘাত পেল বেশী। এ যেন তার পুত্রশোক।

সেই রাত্রেই মেথীয়াস্ জানল, তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে: তার অবৈধ প্রেমের ফলে স্থানীয় জনৈকা ঝি-র মেয়ের কোলে একটি ছেলে এসেছে; পরের দিন আদালতে তার বিচার হবে।

খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ সে ছুটে যায় মোড়লের বাড়ীতে, তদ্বির করতে। মোড়ল তার বন্ধুকে অভয় দেয়। মেথীয়াস্ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

—তা, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বর্গতা হয়েছে তো বেশ

কিছুদিন হয়ে গেল ! তুমি আবার বিয়ে করছ না কেন,—রসিকতার সুরে মোড়ল শুধায় তাকে।

—কি যে বল, আমার বয়স হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তবে ঐ ডমিনিকোভার অগ্‌না মেয়েটি কিন্তু বেশ! শুনেছি, উত্তরাধিকার সূত্রে ওর বিধবা মার থেকে মেয়েটি তিন একর জমিও পাবে। সলাজ উত্তরে জানায় মেথীয়াস্।

মোড়লের কপট উৎসাহ পেয়ে পরের দিন সে এসে হাজির হ'ল ডমিনিকোভার বাড়ীতে,—

কি গো তোমরা কেমন আছো ? মেয়েকে কবে বিয়ে দিচ্ছো ? তোমরা আমার আপনজন। তা আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই জানিও।—এত কথা বলেও মায়ের মনোভাব কিছু বুঝতে না পেরে মেথীয়াস্‌কে বাড়ী ফিরে আসতে হয়।

ক'দিন বাদে সুযোগ পেয়ে সে অগ্‌নাকে ক'টি সুন্দর রিবন উপহার দিতে এগিয়ে যায়। মেয়েটি কিন্তু সে-উপহার হাত পেতে নিল। শুধু তাই নয়, আশ্চর্য, তাকে মেথীয়াস্ বিয়ের প্রস্তাব করতে অগ্‌না মৌন-সম্মতিও জানাল। মেয়েদের মন দুর্বোধ্য !

বিয়ে ঠিক হল। মেথীয়াস্ তখনও পর্যন্ত জানে না, তার ছেলে অ্যাণ্টেক্ তার ভাবী পত্নীর সঙ্গে গোপন প্রেমে জড়িত। স্থির হল বিয়ের যৌতুক হিসাবে তিন একর জমি মেথীয়াস্ পাবে আর বিয়ের পর সে অগ্‌নার নামে ছ'একর জমি লিখে দেবে। এই সিদ্ধান্তে অ্যাণ্টেক্ জ্বলে উঠে প্রতিবাদ জানাল। সে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করল। ফলে, বাপের সংসার ছেড়ে তাকে সপরিবারে শ্বশুরের জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় নিতে হয়।

অগ্‌নার সঙ্গে মেথীয়াসের বিয়ে হয়ে গেল, আড়ম্বরের কোন ত্রুটি হ'ল না। বিয়ের আনন্দের উচ্ছ্বাসে মেথীয়াসের অনুরাগী জাত-ভাই কুবা জমিদারের খাস জমিতে অনধিকার ভাবে শিকার

করতে গিয়ে পায়ে বন্দুকের গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়। হাসপাতালে যাবার ভয়ে কুবা তার ক্ষত পা-টি নিজের হাতেই কেটে ফেলে; কিন্তু ঐ কাটা থেকে অবিরাম রক্ত বেরোবার ফলে সে খানিক বাদেই মারা গেল।

দেখতে দেখতে শীত এসে গেল। নেকড়ের দল হতভাগা চাষীদের ঘরের আনাচে কানাচে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরতে থাকে। বেচারা অ্যান্টেককে এবার পেটের জ্বালায় তাদের গরুটিকে বেচতে হল। তাকে নিতে হল কাঠের গোলায় মজুরের কাজ। মেথু এই গোলার ফোরম্যান। সেও অগ্‌নাকে ভালবাসে, তাই সে অ্যান্টেকের প্রতিদ্বন্দ্বী—তার শত্রু। অ্যান্টেকের পেটের ক্ষুধা দুর্জয়। তাই শত্রুর অধীনে তাকে কাজ করতে হয়।

একদিন কাজ করতে করতে অ্যান্টেক হঠাৎ টের পেল, মেথু তার শোবার ঘরে অগ্‌নাকে নিয়ে প্রেম করছে। আর যায় কোথায়! রাগে উন্মত্ত হয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে সে এমন প্রচণ্ড ভাবে মেথুকে ঐ-অবস্থায় আঘাত করল যে সঙ্গে সঙ্গে মট্ মট্ করে তার পাঁজরের পাঁচ ছ'টা হাড় ভেঙ্গে গেল। বেচারা যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে গড়িয়ে গিয়ে নীচে নর্দমার ভিতর মুখ থুবড়ে পড়ল। সে আর উঠল না।

ক্রিস্‌মাসের সময় অগ্‌নার কোলে মেথীয়াসের ছেলে এল, তাই বাড়ীতে বয়ে গেল আনন্দের ঢেউ। সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যে গভীর রাত্রে অ্যান্টেক অগ্‌নার সঙ্গে ক্ষণিক মিলনের সুযোগ পেল। সে অগ্‌নাকে বলল, বাড়ীর খড়ের গাদাটির পিছনে তার সঙ্গে গোপনে দেখা করবার জন্য। অগ্‌না খুশী মনে অ্যান্টেকের অনুরোধ রক্ষা করে।

ক'দিন বাদে কাজের উপলক্ষে মেথীয়াস্‌কে একটু বাইরে যেতে হয়। বাপের এই অনুপস্থিতির সুযোগ থেকে ছেলে নিজেকে

বঞ্চিত করল না। সে অগ্‌নার সঙ্গে অবাধ মিলনের সুযোগ পায়। অপ্রত্যাশিতভাবে বাপ ফিরে এসে অবাঞ্ছিত অবস্থায় ওদের দু'জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে আর কি!

দিন যায়। এক রাত্রিতে অ্যাণ্টেক্ কোন এক কুখ্যাত হোটেলে অগ্‌নাকে নিয়ে স্ফূর্তিতে মত্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে মেথীয়াস্ ছুটে এসে অগ্‌নাকে সেখান থেকে এক রকম টেনে নিয়ে যায়। অগ্‌না ওরকম ভাবে চলে যাবার পর অ্যাণ্টেকের নেশা অনেকটা কেটে গেল। হোটেল থেকে ফিরবার পথে সে দেখতে পেল তার স্ত্রী হংকা অত রাত্রে বরফের উপর প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। স্ত্রীর অবস্থা দেখে ওর বাকী নেশাটুকু কেটে যায়। বেচারীর জন্য অ্যাণ্টেক্ মমতা বোধ করে, তার হয় অনুশোচনা।

হোটেল থেকে ফিরে এসে কর্তার কাছ থেকে অগ্‌না ঝি-র মত ব্যবহার পায়; পায়না সে আর কর্ত্রীর মর্যাদা।

ইতিমধ্যে অ্যাণ্টেক্ তার কাজটি হারিয়েছে। স্বামীর দুরবস্থা দেখে হংকাকে অগত্যা ভিখারীদের সঙ্গে গভীর জঙ্গলে শুকনো কাঠের সন্ধানে বেরুতে হয়। একদিন সন্ধ্যায় সে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরবার সময় তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়ে। ভাগ্য ভাল, তার শ্বশুর সে পথ দিয়ে তখন যাচ্ছিল। তার সাহায্যে সে-যাত্রায় হংকা উদ্ধার পেল। পুত্রবধূর দুঃখ দেখে মেথীয়াস্ বেদনা বোধ করে। যাবার আগে হংকাকে সে বার বার বলে যায়, পরের দিন থেকে তার বাড়ীতে থাকবার জন্য।

সেই রাত্রে মেথীয়াসের বাগানে অ্যাণ্টেক্ আর অগ্‌না গোপনে আবার মিলিত হল। অত রাত্রে বাগানে লোকের শব্দ শুনে মেথীয়াসের মনে কেমন সন্দেহ জাগে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে ওদের সামনে সে এক গুচ্ছ খড়কুটো জ্বালাল। ওরা পালাবার

পথ পায় না। তখন বাপ বেটার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বেগতিক বুঝে অ্যাণ্টেক পালিয়ে বাঁচে। বাপ বৃথা তার পিছু ছোটে। পিছনে পড়ে থাকে সেই জ্বলন্ত খড়ের গুচ্ছ, তাই থেকে চারিদিকে ক্রমশঃ আগুন ছড়িয়ে পড়ে ; সারা পল্লী বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

এই ঘটনার পর অ্যাণ্টেক্‌কে সকলে এড়িয়ে চলে। পুত্রবধূ হংকা এখন বৃদ্ধ শ্বশুরের কাছেই থাকে। অগ্‌নাও তার আশ্রিতা বটে কিন্তু সে অ্যাণ্টেক্‌কে ভুলতে পারে নি ; সুযোগ পেলেই সে তার সঙ্গে গোপনে দেখা করে। মেথীয়াস্‌ টের পেলেও তা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামায় না।

এরপর সেই পল্লীতে ঘটল এক অঘটন। খবর এল বাইরের কোন এক জমিদার এসে জোর করে জঙ্গল থেকে চাষীদের গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। মেথীয়াসের নেতৃত্বে চাষীরা সব মিলিত ভাবে এগিয়ে যায় তাকে বাধা দিতে।

দূর থেকে অ্যাণ্টেক্‌ সুযোগের অপেক্ষা করছিল ; ভাবছিল, এই গোলমেলে পরিস্থিতিতে সে তার বাপকে মেরে ফেলবে। কিন্তু যখন সে দেখল তার বৃদ্ধ বাপ বিদেশী কাঠুরিয়ার হাতে আহত হয়েছে, উন্মত্তের মত সে ছুটে গিয়ে কুড়ালের এক ঘায়ে সেই কাঠুরিয়াকে একেবারে শেষ করে দিল। তারপর সে নীরবে সকলের সঙ্গে আহত বাপকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

এল বসন্ত। কিন্তু গ্রামবাসীদের মনে আনন্দ নেই। জঙ্গলের সেই মারামারির অপরাধে বন্দী চাষীরা তখনও জেল থেকে কেউ মুক্তি পায়নি। তাই এদের কোন জমি চাষও হয়নি। মেথীয়াস্‌ এখন পঙ্গু। সে ঘরে বসে অলস দৃষ্টি মেলে জমির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ইস্টারের ক'দিন বাদে হংকার কোলে একটি ছেলে এল। কিন্তু ছেলের বাপ অ্যাণ্টেক্‌ তখনও জেলে, তাই শিশু ছেলেটির নামকরণ সে ফিরে না আসা পর্যন্ত স্থগিত থাকে।

ক'দিন বাদে সব বন্দী-চাষীরা মুক্তি পেল, পেল না শুধু অ্যান্টেক্। চাষীদের ঘরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়, যায় না শুধু মেথীয়াসের শূন্য ঘরে ; বসে বসে সে শুধু চাপা নিঃশ্বাস ফেলে।

হঠাৎ এক রাত্রিতে বৃদ্ধ মেথীয়াস্ কি করে তার সব জরা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল ; সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার জমির দিকে,—যে জমিতে পড়েনি লাঙল। কে করবে চাষ, কে দেবে তাকে সে-আশ্বাস!

ঐ গভীর রাত্রে বৃদ্ধ মেথীয়াস্ আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় তার জমির মাঝখানে। করুণ ভাবে সে তাকিয়ে থাকে যতদূরে তার দৃষ্টি যায়, হোক না কেন সে দৃষ্টি অতি ক্ষীণ। চাষের সময় বয়ে যায়। এবার বৃদ্ধ নুয়ে জমির চারদিকে ঘুরতে থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সে ফসল বুনছে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে রাত্রির শেষে সে এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেই জমির মাঝখানে। মেথীয়াস্ আর উঠল না।

বসন্তের পর এল গ্রীষ্ম। চাষীদের দুর্দশাও সেই সঙ্গে বাড়ল। মেথীয়াসের বিপুল জমিকে কেন্দ্র করে সুরু হল তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ। বাইরের লোকের লোলুপ দৃষ্টিও পড়ে সে জমির ওপর। কিছু জর্মন এল জমিদারের খাস জমি দখল করতে, কিন্তু প্রজারা রুখে দাঁড়াতে ওরা পালিয়ে যায়। এবার জমিদারের শুভ বুদ্ধি হল। সে তার কিছু জমি প্রজাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়।

অগ্‌নার মা, ডমিনিকোভার বয়স হয়েছে। হঠাৎ জমি নিয়ে ছেলে সিমনের সঙ্গে তার বিবাদ শুরু হয়। চাষীরা তাতে খুশী হয়। সে ঝগড়ায় তারা জোগায় ইন্ধন। তাদের উস্কানিতে সিমন তার স্ত্রী নস্টকাকে নিয়ে ঘর ছাড়ল। ওরা দু'জনে বাঁধল নতুন বাসা। এদিকে অগ্‌না তখন মোড়লের সঙ্গে প্রেম করছে, সেই সুযোগে একদিন সে মোড়লের সরকারী তহবিলে হাত বাড়াল।

অ্যান্টেক্ জেল থেকে মুক্তি পেল। সে স্থির করল এবার

বাপের জমিতে মন দেবে। অগ্‌নাকে সে ভোলেনি। কিন্তু চাষের চিন্তা আর সাইবেরিয়ার বিভীষিকায় তার মন সদা-আতঙ্কিত। প্রেম করবার ওর অবকাশ কোথায়?

গ্রীষ্মের ছুটিতে একটি ছাত্র এল তার এই গাঁয়ের বাড়ীতে। আশ্চর্য, অগ্‌নার নজর পড়ে এবার সেই সরল ছেলেটির ওপর। সে ফাঁক পেলেই ছেলেটির সঙ্গে গোপনে মিলতে চায়, জানায় সে তাকে কুৎসিত ইঙ্গিত। চাষীরা শিউরে ওঠে। একদিন ওরা অসহ্য হয়ে অগ্‌নার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে ওকে পল্লী থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিল ঃ খবরদার, তোমার টিকি যেন এ গাঁয়ে আর কখনও না দেখা যায়।

অগ্‌না এসে গোপনে আশ্রয় নিল নস্টকার কুটিরে। ক'দিন বাদে সেই গ্রীষ্মের কোন এক দুপুরে এক ফকির এসে হাজির হল নস্টকার দ্বারে। গৃহিণী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। অগ্‌নার মঙ্গল কামনা করে ফকির তার ঝোলা থেকে বের করে দেয় ছোট্ট একটি ওষধি। নস্টকা ভক্তিভরে তা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে। সন্ধ্যা নেমে আসতে এক অলৌকিক মধুর সঙ্গীতে চারিদিক মুখর হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, অদ্ভুত ফকিরটি ঈশ্বরের নামে এবার নস্টকাকে আশীর্বাদ করে কোথায় মিলিয়ে যান। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সেণ্ট জোয়ান

বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ' (George Bernard Shaw)-এর 'সেণ্ট জোয়ান' (Saint Joan), ১৯২৪, নাটক অবলম্বনে লিখিত।

মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বিদায় করবার জন্যই রবার্ট তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

রবার্ট ভেবে পান না মেয়েটি কি পাগল না মাথা খারাপ! তিন দিন ধরে তাঁর দোরে অনর্থক হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। আজগুবি আব্দার তার : তাকে ঘোড়া দিতে হবে, টাকা দিতে হবে, দিতে হবে সৈন্য। শুধু কি তাই, তার নিজের ব্যবহারের জন্য মেয়েটিকে সৈনিকের পোষাকও নাকি দিতে হবে! সামান্য চাষীর মেয়ে, সে পরতে চায় কি না সৈনিকের পোষাক!

সে অঞ্চলের লোকগুলোর কথা ভেবে রবার্ট আরও অবাক হন। আশ্চর্য, মেয়েটি যেন ওদের সকলকে যাদু করেছে। তাদের কাছে মেয়েটি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী। তারা বলে, সে দেবদূতের সঙ্গে কথা বলে। তাদের ধারণা, মেয়েটিকে সন্তুষ্ট না করায় এ অঞ্চলের হাঁসমুরগীগুলো নাকি ডিম পাড়া বন্ধ করেছে, গরু দুধ দেয় না ; ঘোড়াগুলোও মুখে দানা নেয় না ক'দিন থেকে।

মেয়েটির আস্পর্ধার সীমা নেই। শুধু অর্লিয়েন্স থেকে নয়— ফ্রান্স দেশ থেকে সে শক্তিশালী ইংরেজদের তাড়াতে চায়। চার্লস্ ডাফিনকে রাজসিংহাসনে বসাবারও স্বপ্ন দেখে মেয়েটি!

রবার্ট জানেন মেয়েটি এসব বুলি আওড়িয়ে বেড়ায় আর লোক-গুলোও বোকার মত তাই বিশ্বাস করে তাকে দেবীর আসনে বসিয়েছে।

সব দেখেশুনে রবার্টের গা জ্বলে যায়। যাহোক্, মেয়েটির এ অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দেবেন না রবার্ট। বিদেশী ইংরেজের হাজার রকমের উৎপীড়নে এমনিতেই তিনি দিশাহারা, তার ওপর এই পাগলামি!

অঞ্চলের সর্বময় কর্তা হয়েও ক'দিন থেকে রবার্ট ডিম এবং দুধের মুখ দেখেন নি। ভৃত্য তার জীবন পণ করেও প্রভুর জন্য তা সংগ্রহ করতে পারে নি।

নানা কারণে তাঁর মন বিগড়ে আছে। রবার্ট স্থির করেছেন, ঐ নগণ্য চাষার মেয়েটির সঙ্গে তিনি কিছুতেই দেখা করবেন না।

শেষ পর্যন্ত বন্ধু পলের অনুরোধে রবার্ট মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিলেন। রবার্ট ডেকে পাঠালেন তাকে ধমকে তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু মেয়েটি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে লোরেন ভূমিখণ্ডের সামন্ত রবার্ট উপলব্ধি করলেন,—মেয়েটির সব দাবীই তিনি মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও মনে করে বসেছেন, মেয়েটি হয়ত সত্যিই অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী, ফ্রান্সের এই দুর্দিনে ঈশ্বরই তাকে পাঠিয়েছেন।

রবার্ট একাকী বসে অদ্ভুত মেয়েটির কথা ভাবছিলেন। সেই সময় তার ভৃত্য উল্লসিত ভাবে ছুটে এসে মনিবকে জানায়,—

'প্রভু, অবাক কাণ্ড! সব হাঁসমুরগীগুলো একসঙ্গে অনেক অনেক ডিম পাড়ছে; গরুগুলোও এখন দুধ দিচ্ছে। আর আপনার প্রিয় ঘোড়াগুলোকে দানা দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

ভৃত্যের উক্তি শুনে মেয়েটির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে রবার্টের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তাঁর মুখে ভাষা নেই। তিনি নীরবে ভৃত্যের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকেন।

ভৃত্য চলে যেতে রবার্ট আবার তাঁর ভাবনায় ডুবে যান,—এই সেই জোয়ান অব আর্ক! একজন সাধারণ চাষীর মেয়ে। বয়স

আর কত হবে? আঠারো বছরও সে পার হয় নি। সে মূর্খ। কিন্তু কি আশ্চর্য তার চোখ দু'টি—সে চোখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা। হয়ত সে দেবদূতই হবে!

ফ্রান্সে তখন দারুণ দুর্দিন। রাজা থেকেও নেই। চারিদিকে অশান্তি আর অরাজকতা। সামন্তকুল ভয়ে লোভে এবং পরাজয়ের দুর্বলতায় আক্রমণকারী ইংরেজের হাতে প্রায় সমস্ত দেশটাই তুলে দিয়েছে। তখন এই অষ্টাদশী মেয়েটির কণ্ঠে দেশবাসী শুনতে পেল আশার বাণী,—

'এ দেশ আমাদের, ফরাসীদেশবাসীর। দেশকে স্বাধীন করাই আমার ব্রত—ঈশ্বর উপাসনা। এই মর্মে আমি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছি।'

শুধু তাই নয়, সে অসি-হাতে সৈনিকের পোষাকে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এল সবার সামনে—আক্রমণকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান নিয়ে—

'তোমরা ওঠো, জাগো। আমার সঙ্গে অর্লিয়েন্স দুর্গ আক্রমণ করে তা পুনরুদ্ধার কর। তারপর প্যারিস থেকে দেশের শত্রু ইংরেজদের তাড়াও।'

তার উক্তি শুনে অনেকে তাকে উন্মাদ বলে বিদ্রূপ করল। কিন্তু স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকজন বীর এসে দাঁড়ালেন তার পিছনে। এদের মধ্যে পলেঞ্জী ছিলেন অগ্রণী।

রবার্টের কাছ থেকে কিছু সৈন্য, একটি পরিচয়পত্র এবং সামান্য অর্থ নিয়ে জোয়ান তার দলটি নিয়ে এগিয়ে চলল সিনন নগরের দিকে—ডাফিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

রাজসিংহাসনে অনভিষিক্ত হলেও চার্ল্‌স্ ডাফিনই ছিলেন তার উত্তরাধিকারী—ফ্রান্সের ভাবী রাজা, সপ্তম চার্ল্‌স্।

ডাফিন ছিলেন স্বভাব-ভীরু, তুর্বল, ব্যাক্তত্বহীন এবং ঋণগ্রস্ত। তিনি ছিলেন বিশপ, সামন্তরাজ এবং নাইটদের কৃপার পাত্র। অসহায় ডাফিন তখন তাঁর তুর্ভাগ্যকে প্রায় মেনে নিয়েছেন। লোকের মুখে মুখে তাঁর কানেও পোঁছেছিল এই অদ্ভুত মেয়েটির অলৌকিক মহিমার খবর, তাঁকে সিংহাসনে বসাবার মেয়েটির দৃঢ় সংকল্পের কথা।

সিনন নগরীর তুর্গপ্রাসাদে মুকুটহীন রাজা চার্ল্‌স্‌ তখন লর্ড বিশপ, লর্ড চেম্বারলেন এবং অন্যান্য সামন্ত, নাইট ব্যারনদের নিয়ে দরবারে বসেছেন। সেই সময় জোয়ান সম্বন্ধে রবার্টের লেখা পরিচয়-পত্রটি চার্ল্‌সের হাতে এসে পোঁছল।

সে-চিঠিটি পড়ে চার্ল্‌স্‌ জোয়ানের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন কিন্তু এ সাক্ষাতের প্রস্তাবে বিশপ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। চেম্বারলেন এবং আরও তু'একজন সামন্তরাজ বিশপকে সমর্থন করে। বিশপ চার্ল্‌স্‌কে দৃঢ় কণ্ঠে জানান্—

'এ সাক্ষাৎ অসম্ভব। সে একজন নগণ্য চাষীর মেয়ে। তায় নারী হয়ে সে পুরুষের পোষাক পরে, নারী হয়ে সে যুদ্ধ করতে চায়। সে কি দেবদূত ? ওর যাত্থ ছাড়া এ আর কিছু নয়।'

ক্ষীণকণ্ঠে চার্ল্‌স্‌ বিশপকে প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করেন।

ডাফিনের উক্তিতে বিশপ আবার জ্বলে ওঠেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন—'মেয়েটি একটি বাতুল। তা না হলে সে অর্লিয়েন্সের ঐ সুরক্ষিত তুর্গ অবরোধ করতে চায়; ফ্রান্স থেকে শক্তিশালী ইংরেজদের তাড়াতে চায়!'

বিশপের ধমক খেয়ে ডাফিন নিজেকে অসহায় বোধ করেন। যাহোক্ লে হায়ার-এর চেষ্টায় জোয়ান ডাফিনের সঙ্গে দেখা করতে অনুমতি পায়। একান্তে ওদের তু'জনের মধ্যে আলাপ আলোচনা করবারও কোন বাধা থাকে না।

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জোয়ান ডাফিনকে জানায়—

'ঈশ্বরের আদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমি অর্লিয়েন্সের দুর্গ অবরোধ করব; শত্রুকে আমাদের দেশ থেকে তাড়াব। তুমি অনুমতি দাও—তুমি যে আমাদের রাজা।'

—'না, না। আমি রাজা নই। আমি শুধু ডাফিন। আমি যুদ্ধ চাই না। আমি চাই শান্তি, সুখ—চাই শুধু আরাম।'

'চার্লি, আমি এসেছি তোমাকে উদ্ধার করতে। সাহসে বুক বাঁধ। আমি তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাব। বিশ্বাস কর,—আমি এসেছি ঈশ্বরের আজ্ঞায়, তাঁরই আদেশ বহন করে।'

'ওঃ কেবল ঈশ্বর আর ঈশ্বর! অসহ্য। তার চেয়ে বলতে পার, কি ভাবে লোহাকে সোনা করা যায়, কি করে আমি পর্বতপ্রমাণ ঋণ হতে মুক্ত হতে পারি?—তুমি পার, পারে তোমার ঈশ্বর?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার চেয়েও বড় জিনিস আমি করতে পারি। আমি এই অসহায় ডাফিন-কে ফ্রান্সের রাজা করব। সেজন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

'না, না—আমি রাজা হতে চাই না। আমি দুর্বল, কপর্দকহীন।'

এবার বিমূঢ় চার্ল্‌সের হাত ধরে তাঁকে অদূরের শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে জোয়ান নতজানু হয়ে তাঁর সামনে বসে উত্তেজিত কণ্ঠে আবার বলতে শুরু করে—

'চার্লি, আমি বলছি—যে মাটির বুকে পুষ্ট হয়ে আমরা এতবড় হয়েছি, সে দেশ তোমার। তুমি আমাদের রাজা। এস, তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাও। সেই পরমাত্মার কাছে তুমি আত্ম-সমর্পণ কর। তাঁর কাছে তোমার রাজ্য সঁপে দাও। দেখবে, তুমি শান্তি পাবে, দেশবাসীর মনেও শান্তি ফিরে আসবে; এ দেশ সমৃদ্ধ হবে। আমাদের সৈন্যেরা ঈশ্বরের আদেশে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করবে। তখন শত্রুরা এদেশ ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না।'

মেয়েটির উক্তি শুনে চার্ল্‌সের অন্তরসত্তা জেগে ওঠে। বীরদর্পে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চার্ল্‌স্ দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—

'জোয়ান, আমি আদেশ দিচ্ছি—আজ থেকে তুমি আমার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা কর।'

চার্ল্‌সের ঘোষণা শুনে বিশপ চেম্বারলেনের দল হয় হতভম্ব।

ততক্ষণে তার তরবারি উন্মোচন করে চার্ল্‌সকে অভিবাদন জানিয়ে জোয়ান ছুটে বেরিয়ে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে সৈন্যসামন্তগণকে আহ্বান জানায়।

জোয়ানের নেতৃত্বে সৈন্যসামন্তের দল এগিয়ে যায় অর্লিয়েন্সের দিকে। তাদের সকলের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি।

স্বদেশপ্রেমিক বীর সেনাপতি ডেনিস-এর বহুদিনের সংকল্প: যে কোন উপায়ে তিনি অর্লিয়েন্সের দুর্গ পুনরুদ্ধার করবেন। কিন্তু লয় নদীর উত্তাল তরঙ্গ আর তুমুল ঝড় দুর্জয়। ঐ প্রতিকূল আবহাওয়ায় দুর্গ আক্রমণ করা অসম্ভব। তাই তাঁর বাহিনী নিয়ে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন অনুকূল আবহাওয়ার জন্য।

লয় নদীর কূলে দীর্ঘদিনের অপেক্ষায় ডেনিস হয়ে ওঠেন ক্লান্ত, তাঁর বাহিনী ভেঙ্গে পড়ে হতাশায়। অনুকূল আবহাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেও ডেনিস দ্বিধা করেন না। কোন ফল হয় না। ক্রমে ডেনিস দিশাহারা হয়ে ওঠেন।

এমন সময় জোয়ান এসে হাজির হল সেই লয়ের উপকূলে। তার বাহিনী তখনও এসে সেখানে পৌঁছায় নি।

ডেনিস জোয়ানকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। জোয়ানের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, তার সামরিক বুদ্ধিমত্তা এবং দুঃসাহসের পরিচয় জেনে ডেনিস চমৎকৃত হন। ডেনিসের বিস্ময়ের বুঝি শেষ নেই। আশ্চর্য, জোয়ান তার সঙ্গে অনুকূল হাওয়াও নিয়ে এসেছে। সেখানে জোয়ান পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অশান্ত নদী কখন শান্ত হয়ে গেছে!

এই অঘটন দেখে ডেনিস হল স্তম্ভিত। জোয়ানের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে ডেনিসের মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না। দুর্ধর্ষ সেনাপতি এবার জোয়ানের নেতৃত্ব বরণ করে নেন মুক্ত প্রাণে।

মুষ্টিমেয় ক'জন সৈন্য নিয়ে তাদের জাহাজ তরতর করে গিয়ে পোঁছল অর্লিয়েন্স দুর্গের দক্ষিণ দিকে। ভয়ঙ্করী মূর্তি, কণ্ঠে তার রণহুঙ্কার—বাঘিনীর মত জোয়ান ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর।

জোয়ানের রণকৌশল আর বিক্রম দেখে উভয়পক্ষের দক্ষ সৈনিকরা হয় হতবাক্। হঠাৎ একটা মারাত্মক তীর ছুটে এসে জোয়ানের গলায় বেঁধে। আর্তনাদ করে জোয়ান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু শত্রুদের অবাক করে ক্ষণিকের মধ্যে আবার উঠে দুর্গ-প্রাকার ভেদ করে ঐ উঁচু পাঁচিল বেয়ে জোয়ান একাকী এগিয়ে যায় শত্রুব্যূহের মধ্যে—হাতে তার শ্বেত পতাকা।

অবাক কাণ্ড! তার হাতের সেই পতাকাটি দেখে সব ইংরেজ সৈন্যেরা কেমন নিস্তেজ হয়ে যায়—তাদের শিথিল হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে।

এবার জোয়ানের ইঙ্গিতে তার সৈন্যেরা সেই বিভ্রান্ত ইংরেজ সৈন্য আর সেনাপতিদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় লয়ের সেতুটির ওপর।

আশ্চর্য, শত্রুদল সেই সেতুর ওপর জড়ো হতে হঠাৎ গোটা সেতুটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। শত্রুরা কেউ পালাবার পথ পায় না। অনেকেই সে আগুনে পুড়ে মরল, বাকী সব লয় নদীর বুকে সলিল সমাধি হয়।

এমনি ভাবে জোয়ানের নেতৃত্বে ইংরেজরা শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত এবং পরাজিত হয়। অলৌকিক ভাবে সে অর্লিয়েন্সের দুর্গ পুনরুদ্ধার করে।

ক্রমে জোয়ানের বাহিনী জাঁজিন, মাঁঙ্গ এবং বোজান্সি অঞ্চল-গুলিও একে একে শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত করে।

এবার জোয়ানের সাহায্যে ডাফিন ফ্রান্সের রাজাসংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। ডাফিন হলেন সপ্তম চার্ল্‌স্‌।

চার্ল্‌সের রাজ্যাভিষেকের উৎসবে চারিদিক যখন আনন্দমুখর,

জোয়ান নিভৃতে প্রার্থনায় মগ্ন। তার মনে শান্তি নেই। জোয়ান তখন প্যারিস অবরোধের স্বপ্ন দেখে।

এই সময় ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশে আবার দুষ্টগ্রহ উঁকি দেয়।—জোয়ানের প্রভাবে বিশপের একচ্ছত্র আধিপত্য ম্লান হয়েছিল। ফলে জোয়ানের বিরুদ্ধে তার মনে একটা চাপা আক্রোশ ছিল। এদিকে চার্ল্‌স্ সিংহাসনে বসে তাঁর আত্মমর্যাদা বোধ জাগে। তিনি তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হয়ে ওঠেন। জোয়ানের অতটা প্রতিপত্তি চার্ল্‌সের মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হয়। জোয়ানকে এখন তাঁর মনে হয় অবান্তর। ইতিমধ্যে সামন্ত রাজাদের অস্তিত্ব জনসাধারণ প্রায় ভুলেই গেছল। জোয়ানের বিরুদ্ধে তাদেরও চাপা অসন্তোষ কম ছিল না। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও জোয়ানের অসাধারণ বীরত্বে সেনাপতিদের মনেও তার প্রতি হিংসা জেগেছিল বৈ কি? তাই জোয়ানের প্যারিস অবরোধের প্রস্তাবে কেউ সাড়া দিল না।

বার্গাণ্ডি শিবিরের ধূর্ত ইংরেজ সামন্তরাজ ওয়ারউইক এতদিন এই সুযোগের-ই প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা জেনে তাঁর মুখে ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে। তিনি জানেন বার্গাণ্ডি আর গ্যাসকনির লোকগুলো আত্মবিস্মৃত, তাদের মধ্যে একতা নেই, নেই বুদ্ধি-বিবেচনা বা ন্যায়-নীতির বালাই।

মনে মনে ওয়ারউইক সংকল্প করেন—ওর দেশবাসীদের দিয়েই তিনি প্রমাণ করবেন,—জোয়ান একটি ডাইনি। সে সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী, সবচেয়ে বড় কথা সে ধর্মদ্রোহী। ওয়ারউইক জানেন, বিশপ-ই হবে তাঁর ষড়যন্ত্রের প্রধান সহায়ক!

ওয়ারউইকের চক্রান্তে তার দেশবাসীর হাতে জোয়ান একদিন

বন্দী হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। চার্চ তার বিচার করবে।

রুয়েন নগরীর দুর্গপ্রাসাদে ক্যাথলিক বিচারসভা বসেছে—জোয়ানের বিচার হবে। চারিদিক লোকারণ্য।

বিচারকদের আসন থেকে রাজা চার্ল্‌স্ জোয়ানকে সতর্ক করে দেন—'এখনও তুমি চার্চের কাছে অপরাধ স্বীকার কর। তোমার পাপের শাস্তি কি ভয়ঙ্কর তা তুমি জান না।'

নির্ভীক জোয়ান শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়,—

'জানি, দেবদূত আমাকে বলেছেন—তোমরা ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে চার্চের নামে আমাকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারতে চাও।'

'আঃ আবার সেই দেবদূত! আমি দেশের রাজা। কেন, আমার সঙ্গে তারা কথা বলতে পারে না?'

চার্ল্‌সের উক্তি শুনে জোয়ানের মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। দৃঢ় কণ্ঠে সে জানায়—

'তাঁরা তোমার কাছেও নিশ্চয়ই আসেন। দুঃখের বিষয় তুমি কখনও তাঁদের বাণী শুনবার চেষ্টা কর না। তোমরা চার্চে গিয়ে পাদরী বা বিশপের মুখে শোনা কতগুলো বাঁধাধরা বুলি পোষা কাকাতুয়ার মত আওড়াও। মনে কর, খুব আরাধনা করলে। কিন্তু তা নয়…'

তার বলা শেষ হল না। বিচারক উত্তেজিত হয়ে জোয়ানকে প্রশ্ন করেন,—

'জানো, তোমাকে কেন বন্দী করা হয়েছে?'

'জানি। তোমরা আমাকে শাস্তি দিতে চাও। কারণ, আমি চার্ল্‌স্‌কে রাজা করেছি, দেশের হয়ে আমি অর্লিয়েন্সের দুর্গ জয় করেছি—আমি রাজধানী পুনরুদ্ধার করতে চাই, চাই দেশ থেকে ইংরেজ-শত্রু তাড়াতে ঃ এই আমার অপরাধ!'

'থাক্, তোমাকে অত কথা বলতে হবে না। আমাদের শেষ প্রশ্ন—তুমি চার্চকে মানবে কি না?'

বিনীত ভাবে জোয়ান জানায়,—

'নিশ্চয়ই। চার্চকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সে-চার্চ যদি বলে, আমি যা করছি বা বলছি সে সব ঈশ্বরের আদেশে নয়, তবে আমি বিদ্রোহ করব।'

জোয়ানের উক্তি শুনে বিচারকমণ্ডলী চমকে ওঠেন। বিচারক নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে জোয়ানকে উপদেশ দেন—

'এখনও এই পবিত্র বাইবেল ছুঁয়ে স্বীকার কর—এসব তোমার যাদুবিদ্যা। তুমি ধর্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী। আসলে তুমি একটি ডাইনি। নয়ত……'

'ভাবছো, মৃত্যুর ভয়ে আমি মিথ্যা কবুল করব। জেনে রাখো, আমি যা করেছি বা বলেছি সবই ঈশ্বরের আদেশে—দেশের মঙ্গলের জন্য।'

বিভ্রান্ত বিচারক উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে জানান—

'জোয়ান, তোমার দণ্ড হ'ল মৃত্যু—ক্রসে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে।'

বিচারকের রায় শুনে জোয়ান আর্তনাদ করে ওঠে। তখন ধূর্ত বিশপ এগিয়ে যান জোয়ানের কাছে। বিশপ জোয়ানকে মুক্তির আশ্বাস দেন—চার্চের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের স্বাক্ষরপত্রের বিনিময়ে।

মুক্তির আশ্বাসে জোয়ান স্বীকারোক্তিটিতে স্বাক্ষর দেয়। কিন্তু যখন সে জানতে পারল মুক্তির নামে তাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়েছে অপরাধী সাব্যস্ত করে সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। উন্মাদের মত জোয়ান চীৎকার করে ওঠে—'মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চকের দল।' তারপর সেই স্বীকারোক্তিটি ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে জোয়ান নির্ভীক ভাবে বলে,—

'আমি প্রস্তুত। কোথায় তোমাদের সেই আগুন। আমাকে নিয়ে চলো সেখানে।'

বিচারক দাঁড়িয়ে চার্চের নামে, ক্যাথলিক ধর্মের নামে তাঁর শেষ আদেশ জানান,—

'এই ডাইনিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। আজ-ই ওকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হোক।'

সেই আদেশ শুনে জোয়ান নতজানু হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়। তারপর সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সেই নির্মম মৃত্যু বরণ করতে।

... ...

বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং কূটচক্রান্তের ষড়যন্ত্রে সেদিন জোয়ানকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু পঁচিশ বছর পরে দেশবাসীকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল—যখন তার মাতা এবং ভাইয়ের আবেদনে নতুন করে তদন্তের ফলে জোয়ানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য ও অন্যায় বিচারের তথ্য প্রকাশ পায়—জোয়ানের নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়; সে ডাইনি নামের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়।

তারও প্রায় চার শত বছর পরে জোয়ানকে দেবী বলে ঘোষণা করা হ'ল। জোয়ান অব আর্ক হলেন "সেণ্ট জোয়ান"। পৃথিবীর লোকে তাঁকে পূজা করার অধিকার পেয়ে হ'ল ধন্য।

মা

ইতালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা-সাহিত্যিক গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (Grazia Deledda)-এর 'দি মাদার' (The Mother), ১৯২০, উপন্যাসের কাহিনী।

অনাথ শিশু মারিয়া যা হোক করে আশ্রয় পেল তার এক মাসীর বাড়ীতে। মাসীর সংসারে ছোট্ট মেয়েটি অনাদরে মানুষ হয়; উঞ্ছবৃত্তি করে তার অন্ন জোটে। তবুও মারিয়া কৈশোর পেরিয়ে এক সময় যৌবনে পা দিল।

মারিয়াকে ঘরে বাইরে সংসারের অনেক কিছু কাজ করতে হয়। বাড়ীর অদূরে মিল থেকে ময়দা আনাও তার দৈনন্দিন একটি কাজ। মারিয়া ভেবে পায় না, কিছুদিন থেকে মিলের ঐ কুৎসিত চেহারার বুড়ো মজুরটি ওর দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকে কেন? যাক্ গে। সে ময়দার ঠোঙ্গাটি হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ী ফিরে আসে।

দিন যায়। বুড়ো সুযোগের অপেক্ষা করে। খদ্দেরের ভীড় না থাকলে সে মারিয়ার পিছু নেয়। রাস্তার ঝোপ জঙ্গলের কাছে এলেই এদিক ওদিক তাকিয়ে সে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। অসহায় মারিয়া তাকে বাধা দেবার শক্তি পায় না। রুক্ষ বুড়োর শুকনো মুখের আঘাতে তার কোমল মুখখানি হয় লাঞ্ছিত। আহত দেহ মন নিয়ে মারিয়া বাড়ী ফিরে আসে। তবুও তাকে আবার ময়দার জন্য যেতে হয়। বুড়োও সুযোগ পায়। এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। কিন্তু মাসী এ ঘটনা জানতে পেরে মারিয়ার মিলে যাওয়া বন্ধ করে দিল। মারিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ক'দিন বাদে বুড়ো অধৈর্য হয়ে একদিন এসে হাজির হল মারিয়ার বাড়ীতে। সে সরাসরি মাসীর কাছে তার প্রস্তাব পেশ করে...

লোকটির আস্পর্ধা দেখে মাসী জ্বলে উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ বুড়োর হাতেই মাসী মারিয়াকে সঁপে দিল।

বুড়োর নিজের কোন চাল, চুলো ছিল না। তাই বিয়ে হবার পরও মারিয়া মাসীর বাড়ীতেই থাকে। রোজ একবার করে সে স্বামীর সঙ্গে সেই মিলে দেখা করে আসে। মজুরের হাত সাফাইর কল্যাণে এখন অবশ্য ময়দার জন্য মারিয়াকে আর মূল্য দিতে হয় না। লোকটিও জংলীর মত আর তার পিছু পিছু আসবার তাগিদ বোধ করে না।

বিয়ের ক'মাস বাদে বুড়ো মারা গেল। সে মুক্তি পেল বটে কিন্তু তার বন্ধনে জড়িয়ে রেখে গেল মারিয়াকে। কিছুদিন পরেই তার ছেলে এল মারিয়ার কোলে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মারিয়া ভুলে যায় তার সব দুঃখ, সব গ্লানি। মা ছেলেকে কেন্দ্র করে কল্পনার জাল বোনে।

ছেলের মুখে অন্ন যোগাবার জন্য মারিয়া দাসীবৃত্তি করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু দুঃখী মাকে নতুন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। যে বাড়ীতেই সে কাজ করতে যায় সে বাড়ীর প্রভু ও ভৃত্যের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মারিয়ার উপর। তারা তার শ্রমের সঙ্গে আরও কিছু চায়। আবার কেউ বা তাকে প্রলোভন দেখায়ঃ আহা তুমি অত কষ্ট করো কেন? তুমি এস না আমার বাড়ীতে; তোমার খুশীমত যা হোক কিছু কাজ করো। তোমার ছেলের যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। এসব উক্তির ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না মারিয়ার।

মারিয়া অসহায় বোধ করে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তবুও মারিয়া মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে, না তা সে হতে দেবে না। ভাবী পাদ্রীর মার দেহকে সে কিছুতেই অপবিত্র হতে দেবে না। ছেলের অমঙ্গল সে ভাবতে পারে না।

মায়ের যত্নে পল ধীরে ধীরে বড় হয়। সে মিশ্‌নরি স্কুলে ভর্তি হল। বিশপের দয়ায় মারিয়ারও সেখানে কাজ জুটে গেল।

দেখতে দেখতে পলের শিক্ষা শেষ হয়। সে যাজক হল। এবার পলের উপর আদেশ হয়, আর্‌ নামক দূর পল্লীতে যাবার জন্য। খবর শুনে মারিয়া ভাবে এ ঈশ্বরের অনুগ্রহ। সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ব্যস্ত হয়ে মারিয়া তাদের যাত্রার আয়োজন করে।

আর্‌ পল্লীতে তাদের তরুণ যাজকের সাদর অভ্যর্থনার আয়োজন দেখে গর্বে মারিয়ার বুক ফুলে ওঠে। দুঃখী মায়ের স্বপ্ন এতদিনে সার্থক হল। এতগুলি লোকের ধর্মগুরু তার পল।

মারিয়া জানল, পলের আগের যাজকটি ছিল একজন মদ্যপ, ছিল জুয়াড়ী; জানত সে অনেক তুক্‌ তাক্‌। সে ছিল একজন দুষ্ট যাদুকর। অনিষ্টের ভয়ে তার বিরুদ্ধে বিশপের কাছে কেউ কোনদিন নালিশ করে নি। যাবার আগে সে জানিয়ে গিয়েছে, সে তার কোন উত্তরাধিকারীকে সহ্য করবে না। সব শুনে মারিয়া আতঙ্কিত হয়। তার রোষদৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্য, ভয়ে ভয়ে মারিয়া বাড়ীর দরজার সামনে একটি 'ক্রুশ' স্থাপন করল।

কিছুদিন থেকে মারিয়া লক্ষ্য করছে, পল তার ঘরে একটি সুন্দর আরশি টাঙিয়েছে; রোজ রাত্রে সে সুগন্ধি সাবান দিয়ে স্নান করে সেই আরশির সামনে বসে যত্ন করে প্রসাধন করে। ছেলের মতিগতি দেখে মা চিন্তিত হয়। উৎকর্ণ হয়ে সে একাকী বসে থাকে পাশের ঘরে। পল তার রাতের যাজনিক টহলের নাম করে বেরিয়ে যায়।

এমনি করেই দিন যায়। মারিয়ার মনে শান্তি নেই। সে রাত্রেও পল প্রসাধন করে ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল। সেদিন মারিয়া নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। লজ্জা সংকোচের মাথা খেয়ে সেও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল ছেলের পিছনে পিছনে। রাতের অন্ধকারে ছেলের গতি অনুসরণ করে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল।

খানিক বাদে পল একটি বাড়িতে ঢুকতে মারিয়া আঁৎকে ওঠে। সে ভাবে, একি! পল এ কোন বাড়ীতে ঢুকল? এ যে অরক্ষণীয়া এগ্‌নেস্‌-এর বাড়ী; এখানে তো মেয়েটি ছাড়া আর কেউ থাকে না। এত রাতে পল ঢুকল ওর বাড়ীতে? সর্বনাশ! মারিয়া বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। সেও পলের পেছন পেছন বাড়ীতে ঢুকতে চেষ্টা করে। কিন্তু মারিয়া রাস্তা খুঁজে পেল না। মারিয়া ভেবে পায় না পল নিমেষে কি করে বাড়ীর ভেতর অদৃশ্য হল। তবে কি কোন গোপন রাস্তা··· মারিয়া আর ভাবতে পারে না। গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে সে বাড়ী ফিরে এল।

সেদিনও পল গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে আস্তে আস্তে তার ঘরে ঢুকল। দেখল, পাশের ঘরে মা তখনও বসে বসে ঝিমুচ্ছেন, চোখে মুখে তাঁর উৎকণ্ঠা।

—একি মা, তুমি এখনও শুতে যাওনি? মা, কিছু মনে করো না,—ক'রাত্রি থেকে আমাকে একটি রোগীকে দেখতে যেতে হচ্ছে। তাই, ফিরতে একটু দেরী হয়ে যায়, তরল কণ্ঠে পল বলল।

কিন্তু মার কণ্ঠ গর্জে উঠে: পল, ভুলে যেও না—তুমি একজন যাজক। ছিঃ ছিঃ সত্যি কথা বলবার সাহসটুকুও তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি এতদূর স্বার্থপর হবে আমি ভাবিনি। তুমি শুধু নিজেকেই অপবিত্র করছ না, সেই সঙ্গে এগ্‌নেস্‌কেও কলুষিত করছ। শোন, এক্ষুণি তুমি ঐ মেয়েটির সংশ্রব ত্যাগ না করলে আমাকেই দূরে চলে যেতে হবে। ভেবে দেখ। কাল আমাকে তোমার সিদ্ধান্ত জানিও। রাত হয়েছে, এখন শুতে যাও।

মার উক্তি শুনে পল টলতে টলতে কোনরকমে তার বিছানায় এসে আশ্রয় নিল। কাতর ভাবে সে প্রার্থনা জানায়,—প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা কর, শক্তি দাও। তুমি বলে দাও আমার পথ।

কপালে মার হাতের স্পর্শ পেয়ে সকালে পলের ঘুম ভাঙ্গে।

তাড়াতাড়ি সে তৈরি হয়ে নেয় ; তাকে প্রার্থনা সভায় যেতে হবে। বেরুবার আগে সে মার হাতে একটি চিঠি দিল। সংক্ষিপ্ত, ছ'লাইনে লেখা সে চিঠি—

'এগ্‌নেস্, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ভুলে যেও।'

চিঠিটা তুমি ওর হাতে পৌঁছে দিও। আনত মুখে পল চিঠিটা মার হাতে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

—তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

মা খুশীতে উচ্ছল। সে ভেবে দেখল না ছেলের মনের কথা, তাকাল না একবার তার মুখের দিকে।

আনমনা ভাবে পল প্রার্থনা সভার বেদীর উপর গিয়ে দাঁড়াল। তার বক্তব্য বলতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তার মুখের ভাষা কে যেন কেড়ে নিয়েছে। ভক্ত শ্রোতাদের ভীড় কমে যায়। দেখতে দেখতে তারা অদৃশ্য হল।

প্রার্থনা সভার শেষে একটি মহিলা তার ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে এল পলের কাছে, তার বিধানের আশায়। মা জানায়, মেয়েটি তার অত্যন্ত খামখেয়ালী, বদমেজাজী ; নিশ্চয়ই কোন অপদেবতা ভর করেছে ওর উপর।

শুনে পল মহিলাটির কু-সংস্কারের প্রতি কটাক্ষ করে শিশুদের একটি প্রিয় নীতি-গর্ভ রূপক কাহিনী শোনায়। মেয়েটি আগ্রহ ভরে শোনে ; সে হাসে, সহজ ভাবে কথা বলে। মহিলা এবং উপস্থিত লোকদের ধারণা হল, পল নিশ্চয়ই একজন অলৌকিক শক্তিধর, অপ-দেবতার যম। পল্লীবাসীরা ঐদিনই ঘটা করে তাকে অভিনন্দন জানায়। উৎসবের শেষে ছ'চার জন অতি উৎসাহী তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী এল।

পল ভাবে, মন্দ হল না ; এদের সাহচর্যে আজ সে এগ্‌নেসের কথা

ভুলে থাকার চেষ্টা করবে। ওর বাড়ী যাবার তাগিদ আর বোধ করবে না। কিন্তু খানিক বাদে তারা চলে যায়। থেকে গেল শুধু ভক্ত এন্টিওকস্।

এন্টিওকস্ পলের শিষ্য হতে চায়, চায় সে যাজক হতে। সে পলের সাহায্যপ্রার্থী। ছেলেটি সে বিষয়ে ওর মার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য পলকে অনুরোধ করে।

এ যে কঠিন পথ। ত্যাগের···। ক্লান্ত কণ্ঠে পল এন্টিওকসের মার সঙ্গে সবে কথা বলতে শুরু করেছে ; ঠিক এমনি সময় এগ্‌নেসের একটি চাকর ছুটতে ছুটতে এল পলের কাছে। সে জানাল, এগ্‌নেস্ পড়ে গিয়েছে, তার নাক মুখ দিয়ে অবিরাম রক্ত বেরুচ্ছে। তাঁকে এগ্‌নেস্ এক্ষুণি যেতে বলেছে।

খবর শুনে পল ভুলে গেল তার মার কঠিন আদেশ, ভুলে গেল লোকনিন্দা, তার নিজের অস্তিত্ব। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সে ছুটে চলল এগ্‌নেসের বাড়ীতে।

তোমার এ কি চেহারা হয়েছে ? তোমার ক্ষত কোথায় ? ব্যাকুল ভাবে পল শুধায় এগ্‌নেসকে।

—আমার ক্ষত দেখবার দৃষ্টি নেই তোমার। সে কথা থাক্। কাল রাত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, আমাকে বিয়ে করে শীঘ্রই অন্য কোথাও চলে যাবে বলে। তারপর আজ তোমার এই অদ্ভুত চিঠি। এর অর্থ আমি জানতে চাই। —শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় এগ্‌নেস্।

দ্বিধাজড়িত ভাবে পল বলে, তুমি ভুল বুঝো না ; আমি তোমাকে ভালবেসেছি ঠিক কথা, হয়ত কথাও দিয়েছিলাম। কিন্তু মুস্কিল··· কিন্তু সে তার কথা শেষ করতে পারে না।

উত্তেজিত এগ্‌নেস্ বলে, আমার মত অন্য কোন মেয়ের সর্বনাশ তুমি করেছ কিনা জানি না, জানবার প্রয়োজন নেই। আমি চাই, আজ রাতের মধ্যে তুমি এ পল্লী ছেড়ে চলে যাও। নতুবা কাল

সকালে গীর্জার প্রার্থনা সভায় আমি তোমার কু-কীর্তি সকলের কাছে ফাঁস করে দেব।

এগ্নেস্, শোন……

অভিমানিনী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আহত পল তাকে কিছু বলবার সুযোগ পেল না। বিষণ্ণ মনে সে বাড়ী ফিরে এল।

সকাল বেলা। গীর্জায় তার আসন্ন বিপদের কথা পল মাকে জানায়। মারিয়া প্রমাদ গোনে। সে চিন্তিত হয়। তবুও তারা দু'জন যথারীতি গীর্জায় যায়। সেখানে এগ্নেস্কে উপস্থিত না দেখে মা ও ছেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ একটি মহিলার ভীত কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল। পল ছুটে এসে দেখল তার মা মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে; তার দেহ নিস্পন্দ; পাশে দাঁড়িয়ে আছে এগ্নেস্।

এগ্নেস্ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পলের দিকে। পলের দু'চোখ জলে ভরে আসে।

হারানো প্রেম

নরওয়ের ঔপন্যাসিক শ্রীমতী সীগ্রীড উণ্ডসেট্ (Sigrid Undset)-এর 'ক্রীস্টীন লেভ্রান্‌সদাতার' (Kristin Lavransdatter), ১৯২০-২২, উপন্যাসটির গল্পরূপ।

চতুর্দশ শতাব্দী। নরওয়ের ঐতিহাসিক কাহিনী—

ক্রীসৃটীনের পিতা এবং মাতা উভয়েই ছিলেন সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশোদ্ভূত। পিতা লেভ্রানস্-এর খাস জমিদারি ছিল স্কগ্-এ, আর দাদামশাই-এর ছিল জুরানগার্ড-এ। শ্বশুর মশাই মারা যাবার পর উত্তরারিকার সূত্রে সেই জুরানগার্ড-এর জমিদারিও এল লেভ্রানস্-এর হাতে। সোনায় সোহাগা!

স্কগ্-এ জন্ম হলেও ক্রীসৃটীনের শৈশব কাটে জুরানগার্ড-এ। তার শৈশব কাটে পরম আনন্দে, রাজসিক আরামে।

ক্রীসৃটীনের পরের বোন উলভ্‌হিগু দুর্ভাগ্যক্রমে তিন বছর বয়সে পঙ্গু হয়ে যায়। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হল না। কিন্তু কোন ফল হয় নি। মেয়ের চিকিৎসার জন্য অগত্যা ডাকা হয় জাদুকরী মাদাম অ্যাস্‌হিগুকে। অল্পদিনের মধ্যেই মাদামের সঙ্গে ক্রীসৃটীনের বেশ ভাব জমে ওঠে।

ক্রীসৃটীন ষোল বছরে পা দিয়েছে। তার দেহ রূপ-যৌবনে বিকশিত। লেভ্রানস্ মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন ড্যাইফ্রিনের জমিদারের সৌম্যদর্শন ছেলে সিমনের সঙ্গে।

আর্নি ছিল ক্রীসৃটীনের ছেলেবেলার খেলার সাথী, অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বিয়ে ঠিক হবার পর আর্নির জন্য ক্রীস্‌টীনের মনটা কেমন করে। বাল্যবন্ধুর সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করবার জন্য একদিন সন্ধ্যায় ক্রীস্‌টীন চুপি চুপ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

ক্রীস্‌টীনের বাড়ী ফেরবার পথে ঘটল এক অঘটন। রাতের অন্ধকারে আর্নির প্রতিবেশী এক ছন্নছাড়া যুবক বেনীটিন পিছু নেয় ক্রীস্‌টীনের। খানিক এগিয়ে বেনীটিন তার কাছে অশোভন প্রস্তাব করে। তার উক্তি শুনে ক্রীস্‌টীন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। কিন্তু দুষ্ট বেনীটিন নাছোড়বান্দা। লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে সে আরও এগিয়ে এসে হাত বাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ক্রীস্‌টীন চিৎকার করে উঠে,—'খবরদার, বদমাইস।'

কে কার কথা শোনে! বেনীটিন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের ওপর। দু'জনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হল কিছুক্ষণ। এক ফাঁকে ক্রীস্‌টীন সেই পশুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটে পালিয়ে বাঁচে। অক্ষত দেহ নিয়ে ক্রীস্‌টীন পালিয়ে এল বটে, কিন্তু সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া তার মন এড়াতে পারে না।

দু'দিন বাদে বান্ধবীর এই অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সেই দুর্বৃত্তের হাতে আর্নি তার প্রাণ হারায়। তার-ই জন্য বন্ধুর এই অপমৃত্যুতে ক্রীস্‌টীন আরও মর্মাহত হয়। সেখানে থাকতে তার আর ভাল লাগে না। সে চায় একটু দূরে সরে গিয়ে এই অঘটনের স্মৃতি ভুলে থাকতে। তাই সে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করে,—কোন কনভেণ্টে অন্তত এক বছর কাটাবার জন্য।

পিতার অনুমতি পেয়ে ক্রীস্‌টীন নন্‌এস্টার-এর কনভেণ্টে এসে ভর্তি হল। তার গৃহসঙ্গী হয় ইনগেবজর্গ, নতুন বান্ধবীও বটে।

একদিন দুই বান্ধবী একটি বুড়ো চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে

যায় অস্‌লো সহরের উদ্দেশ্যে কিছু কেনাকাটা করবার ইচ্ছায়। বনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ওরা এক সময় সেই চাকরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময় একদল অশ্বারোহী আগন্তুকের সঙ্গে ওদের আলাপ হয়। এদের মধ্যে হুসাবি-র জমিদার অ্যারল্যাণ্ডও ছিলেন।

ক্রীস্‌টীনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতে অ্যারল্যাণ্ড ঘোড়া থেকে নেমে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ক্রীস্‌টীন জানল আগন্তুক তার পরিচিত মাদাম অ্যাস্‌হিণ্ডের ভাগ্নে। ওরা দুজনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। খানিক বাদে শুভেচ্ছা জানিয়ে দু'দল আবার দুদিকে এগিয়ে যায়।

ক'দিন বাদে। সেণ্ট মারগারেটের উৎসবে ক্রীস্‌টীন এবং অ্যারল্যাণ্ডের আবার মিলনের সুযোগ হয়। সেই রাত্রে ওরা পরস্পর পরস্পরকে দেখে বুঝতে পারে যে ওরা দু'জনে দু'জনকে গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে পরের দিন সকালে একসময় ক্রীস্‌টীন তার বান্ধবীকে আগের রাত্রের ঘটনা সব খুলে বলে। শুনে বান্ধবী চমকে উঠে বলে—

'তুমি বলছো কি, ক্রীস্‌টীন! তুমি যে সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছো। অ্যারল্যাণ্ডের বাইরের চেহারাটা দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছো ; ওর ভিতরের কদর্য রূপটার খবর তো রাখ না। তুমি জান না, ঐ এলিন ছিল বিবাহিত। অ্যারল্যাণ্ড ওকে ওর স্বামীর ঘর থেকে চুরি করে এখানে নিয়ে এসেছিল। অ্যারল্যাণ্ড ওকে আজও বিয়ে করে নি। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ নচ্ছারের দু'টি ছেলেকে এলিনের জন্ম দিতে হয়েছে।'

বান্ধবীর কথা ক্রীস্‌টীনের মন স্পর্শ করে না। সে উন্মুখ হয়ে থাকে প্রেমিকের সঙ্গে আবার দেখা হবার আশায়। ক'দিন বাদে গ্রীষ্মের ছুটি নিয়ে এল সে-সুযোগ।

ছুটিতে স্কগ্-এ বেড়াতে এলো ক্রীস্টীন। খবর পেয়ে অ্যারল্যাণ্ডও সেখানে ছুটে এলো। গোপন মিলনে ওদের অসুবিধা হয় না। অ্যারল্যাণ্ড প্রেম নিবেদন করে, ক্রীস্টীন তাকে করে আত্মদান।

এল শীতকাল। দু'জনে আরও অন্তরঙ্গ হয়। মিলনের আনন্দে ওরা উচ্ছ্বসিত।

বসন্তের হাওয়া নিয়ে আসে দু'জনের হৃদয়ে উত্তাল প্রেম-তরঙ্গ। প্রেমিক যুগল আর অপেক্ষা করতে পারে না। এ লুকোচুরির খেলা তাদের আর ভাল লাগে না।

ক্রীস্টীন একদিন এসে হাজির হয় তার বাগ্‌দত্ত সিমনের কাছে। ক্রীস্টীন তাকে খুলে বলে অ্যারল্যাণ্ডের প্রতি তার গভীর অনুরাগের কথা। সে জানায়—

—'সিমন, তুমি কিছু মনে ক'রো না; ভেবে দেখো আমাদের এ প্রেমহীন বিয়ে সুখের হতে পারে না। আমি বলি, তুমি আমাকে ভুলে যাও—অন্য মেয়েকে বিয়ে করো।' ক্রীস্টীনের কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিমনকে বলতে হয়—'তাই হবে।'

ক্রীস্টীনের মা-বাবাকেও অগত্যা সিমন আর ক্রীস্টীনের এই অদ্ভুত প্রস্তাব মেনে নিতে হয়।

এই ঘটনার ক'দিন বাদে। অ্যারল্যাণ্ডের আত্মীয়রা এল লেভ্রানস্-এর কাছে—অ্যারল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্রীস্টীনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাব শুনে লেভ্রানস্ চটে লাল হয়।

এ বিয়েতে তাঁর অনুমতি না পেয়ে অ্যারল্যাণ্ড এবং ক্রীস্টীন স্থির করে ওরা দু'জনে পালিয়ে যাবে—সুইডেন-এ। মাসী মাদাম অ্যাস্‌হিণ্ড-এর বাড়ীতে থেকেই ওদের যাত্রার আয়োজন হয়। খবর পেয়ে অ্যারল্যাণ্ডের রক্ষিতা এলিন সময় মত এসে হাজির হয়

সেখানে। কিন্তু আশ্চর্য! ক্রীস্টীনের ওপর তার মনে এতটুকু ঈর্ষার লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

গোড়া থেকেই ক্রীস্টীনের প্রতি এলিনের অনুরাগ দেখে অ্যারল্যাণ্ডের মনে কেমন সন্দেহ জাগে। তার অনুমান মিথ্যা হয় নি। সেদিন ক্রীস্টীনের উদ্দেশ্যে এলিন চুপি চুপি সবে বিষ ঢালছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যারল্যাণ্ড পেছন থেকে খপ করে তার হাতটি ধরে ফেলে। এ রকম বিশ্রীভাবে ধরা পড়ে এলিন আত্মহত্যা ক'রে সেই গ্লানিকর জীবন থেকে মুক্তি পায়। এ দুর্ঘটনার পর ওদের সুইডেন-এ আর যাওয়া হয় না। ক্রীস্টীন তার মা-বাবার কাছে ফিরে যায়।

ইতিমধ্যে ক্রীস্টীনের পঙ্গু বোনটি মারা গেছে। ক্রীস্টীনের মুখেও হাসি নেই। মেয়ের বিষণ্ণতার কারণ পিতার বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে জন্য লেভ্রানস্-এর মনেও সুখ ছিল না। ঠিক এমনি সময়ে অ্যারল্যাণ্ডের তরফ থেকে আবার লোক আসে সেই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

নানা কারণে লেভ্রানস্-এর মনে শান্তি ছিল না। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাই তিনি এবার সম্মতি দেন। কিন্তু বিয়ের দিন লেভ্রানস্ উপলব্ধি করলেন, ক্রীস্টীনকে নতুন করে অ্যারল্যাণ্ডের হাতে তুলে দেবার কোন যুক্তি ছিল না। এ বিয়ে লোক-দেখান মাত্র। বিয়ের আগেই যে ক্রীস্টীন অ্যারল্যাণ্ডের সন্তানের মা হতে চলেছে।

বিয়ের পর ক্রীস্টীন চলে যায় অ্যারল্যাণ্ডের খাস জমিদারি হুসার-এ। সেখানে সব কিছুর বিশৃঙ্খলার প্রতি তার নজর পড়ে। তার বুঝতে অসুবিধা হয় না, এর জন্য দায়ী অ্যারল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত উদাসীনতা আর তার অবহেলা।

বিবাহিত জীবনের পনের বছরের মধ্যে ক্রীস্টীন সাতটি সন্তানের জন্ম দেয়। এই সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মা ব্যাকুল হয়ে

ওঠে। তার ইচ্ছা হয় সন্তানদের জন্য কিছু সঞ্চয় করা, জমিদারির আয় বাড়াতে। কিন্তু খামখেয়ালি স্বামী তার 'নাম' নিয়ে ব্যস্ত। জমিদারির প্রতি নজর দেবার তার সময় কোথায়? তাই ক্রীস্‌টীনের সে সাধ আর পূর্ণ হয় না।

ক্রীস্‌টীনের ভূতপূর্ব বাগ্‌দত্ত সিমন বাস করত পাশের গাঁয়ে, সঙ্গে থাকত তার একটি অবৈধ মেয়ে। এতদিন সে বিয়ে করে নি। সে এখন বিয়ে করল ক্রীস্‌টীনের ছোট বোন রেমবর্গকে। বিয়ের পরের বছর ক্রীস্‌টীনের পিতা মারা গেলেন। পিতার দু'বছর আগে মা স্বর্গতা হয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে জুরান-গার্ড-এর জমিদারি এল ক্রীস্‌টীনের হাতে।

সারা দেশে তখন অশান্তির ঢেউ বইছিল। ইতিমধ্যে ষষ্ঠ ম্যাগ্‌নাস্‌ নামে একটি নাবালককে সুইডেন ও নরওয়ের সিংহাসনে বসান হয়। অন্তর্বর্তীকালের জন্য আর্লিং নরওয়ের শাসক পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ম্যাগ্‌নাসের ষোল বছর বয়স হলে আর্লিং সেই পদ থেকে সরে যান। ফলে সমস্ত নরওয়ে-তে আইন আর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকে না। দেশের সেই অরাজক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অ্যারল্যাণ্ড নরওয়ের সিংহাসনে অন্য আর একজনকে বসাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

অ্যারল্যাণ্ডের বরাত মন্দ। সে রাজদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার হ'লো। হয়ত ক্রীস্‌টীনের ভাগ্যের জোরে তার প্রাণদণ্ড হ'লো না। সে মুক্তি পেল বটে কিন্তু সেই গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসাবে সমস্ত জমিদারি অ্যারল্যাণ্ডকে হারাতে হ'লো।

সপরিবারে অ্যারল্যাণ্ড এবার জুরানগার্ডে চলে এল। কিন্তু এখানে এসেও জমিদারির প্রতি সে উদাসীন থাকে—চাষ আবাদের জন্য গ্রাহ্য করে না। এদিকে ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছে—তাদের

ভবিষ্যৎ ভেবে ক্রীস্‌টীনের ঘুম হয় না। সে অ্যারল্যাণ্ডকে মিনতি করে বলে—

—দেখ, আমাদের এতগুলি সন্তান। অন্তত ওদের জন্য তুমি একটু চিন্তা কর। সম্পত্তি বাড়াবার চেষ্টা কর। এখানের জমিতে সোনা ফলে। আর কিছু না করো, অন্তত কৃষিকাজে একটু মন দাও।

কাকস্য পরিবেদনা! ক্রীস্‌টীনের সঙ্গে একদিন অকারণ ঝগড়া করে সংসার ছেড়ে অ্যারল্যাণ্ড চলে যায় হুগেন-এ, মাদাম অ্যাস্‌হিণ্ড-এর বাড়ীতে।

অ্যারল্যাণ্ড ও রকম ভাবে চলে যাওযাতে ক্রীস্‌টীন আঘাত পেল বৈকি! কিন্তু সাতটি নাবালকের জননীর সে অনুশোচনা নিয়ে বসে থাকলে সংসার চলবে কি করে? বিশ্বস্ত ভৃত্য উল্‌ফ-এর সাহায্য নিয়ে ক্রীস্‌টীন কৃষিতে মন দেয়; সাধ্যমত জমিদারি তদারক করে।

আবার শীত এল। এই সময় কোন একদিন দুই মাতালের ঝগড়া মেটাতে গিয়ে ক্রীস্‌টীনের ভগ্নীপতি সিমন গুরুতর ভাবে আহত হয়ে মারা যায়। মৃত্যুর আগে সে ক্রীস্‌টীনকে অনুরোধ করে,—

—ক্রীস্‌টীন, আমার সময় হয়ে এলো। কথা শোন, তোমাদের দু'জনের বয়স হয়েছে, ছেলেরাও বড় হয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া পুষে রাখা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেখানে তুমি নিজে গিয়ে স্বামীকে ফিরিয়ে আনো।

সিমনের শেষ অনুরোধ ক্রীস্‌টীন ভোলে নি। একদিন সে চলে যায় হুগেন-এ। ক্রীস্‌টীন স্বামীকে মিনতি করে তাকে ক্ষমা করতে, অনুরোধ করে ফিরে যেতে তার সঙ্গে। কিন্তু কোন ফল হয় না। গোঁয়ারের গোঁ ভাঙ্গে না। সেই গ্রীষ্মটা ক্রীস্‌টীন স্বামার কাছেই কাটায়—মাঝে মাঝে তাকে অনুরোধ জানায়, ফিরে যাবার জন্য।

ব্যর্থ হয়ে ক্রীস্টীনকে সেখান থেকে একা-ই ফিরে আসতে হয়। অ্যারল্যাণ্ড তার সঙ্গে আসে না।

কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে ক্রীস্টীন জানল, সে একা আসেনি; আর একটি সন্তানকে গর্ভে নিয়ে সে ফিরেছে। সে সন্তানের জন্ম হলে ছেলেদের দিয়ে স্বামীকে খবর জানাল। অ্যারল্যাণ্ড তবুও এল না জুরানগার্ডে। অবাঞ্ছিত ছেলেটি তিন মাসের বেশী বাঁচল না।

কিছুদিন বাদে বিশপ এলেন একদিন সে অঞ্চলে। খবর শুনে ভৃত্য উল্‌ফ-এর স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে নালিশ করে তাঁর কাছে—

—'প্রভু! আপনি বিচার করুন—আমার স্বামী আজ ক'বছর ধরে সংসার তুচ্ছ করে জমিদার গিন্নী ক্রীস্টীনের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে ডুবে আছে। আমার দুর্দশার অন্ত নেই…।'

শুনে বিশপ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এ খবর ক্রীস্টীনেরও জানতে বাকি থাকে না।

ক্রীস্টীনের উদ্ধত ছেলে লেভরেন একদিন কাউকে না-জানিয়ে ধূমকেতুর মত এসে হাজির হয় পিতার কাছে। অ্যারল্যাণ্ড অগত্যা ছেলের সঙ্গে ফিরে আসে ক্রাস্টীনের কাছে। কিন্তু বাড়ীর উঠোনে ঢুকতেই পিতা আর পুত্রদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। ঝগড়ার থেকে হয় হাতাহাতি। ফলে অ্যারল্যাণ্ড গুরুতর ভাবে আহত হয়ে মারা যায়।

বছর শেষে সে অঞ্চলে এলো এক কাল-ব্যাধি। ক্রীস্টীনের ষষ্ঠ ছেলে মুনান এ ব্যাধির বলি হল। বাকি থাকে ছ'ছেলে। তারা সকলেই সাবালক হয়েছে। ভাগ্যের সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়ার উদ্যোগ করে।

আইভার ও স্কুলে দুই যমজ ভাই দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে চাকুরি নিয়ে চলে যায়। তারপর আইভার একজন সম্ভ্রান্ত তরুণী বিধবাকে বিয়ে করে সংসার থেকে হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। নিকুলাস

এবং বজোরগাল্ফ যাজক বৃত্তি গ্রহণ করে। গুতে চতুর ছেলে। সে দেখে শুনে ধনী জমিদারের একমাত্র উত্তরাধিকারী মেয়ে জোফ্রিড-এর প্রেমে পড়ে। ক'দিন বাদে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেখানে তাদের একটি ছেলে হবার পর দেশে ফিরে এসে দু'জনে বিয়ে করে ঘর বাঁধে। উদ্ধত লেভরেন একদিন নিজেকে বিশপের পায়ে সঁপে সুদূর আইসল্যাণ্ডে চলে যায়।

১৩৪৯ সাল। ক্রীস্‌টীন আশ্রয় নেয় এক আশ্রমে। সেখানে আসবার দু'বছর পরের কথা। ক্রীস্‌টীনের পুত্র স্কুলে একদিন এলো সেই আশ্রমে মার সঙ্গে দেখা করতে। ছেলের থেকে ক্রীস্‌টীন জানল, সে অঞ্চলে মহামারী প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছে। দেখতে দেখতে সেই কালরোগ সারা শহর গ্রাস করে। ক্রীস্‌টীনের দুই যাজক ছেলে নিকুলাস এবং বজোরগাল্ফ কালব্যাধির বলি হয়। ক্রীস্‌টীন নিজেও সেই রোগ থেকে নিস্তার পায় না। দু'দিন অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে ক্রীস্‌টীন মহাকালের কোলে আশ্রয় নেয়। সে মুক্তি পায়।

যাদু-পাহাড়

জর্মন সাহিত্যিক টমাস মান (Thomas Mann)-এর 'ম্যাজিক মাউন্‌টেন' (The Magic Mountain), ১৯২৪, উপন্যাসের সারাংশ।

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সে ভালভাবেই পাশ করেছে। এখন হ্যান্‌স্ ক্যাস্টরপ দস্তুরমত একজন ইঞ্জিনিয়ার। তবুও যেন তার মনে স্ফূর্তি নেই।

পরীক্ষার আগে থেকেই হ্যান্‌স-এর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। পড়াশুনার চাপে তা আরও খারাপ হয়েছে। কিছুদিন থেকে কোন কিছুতে সে বড় একটা উৎসাহ পাচ্ছে না।

ডাক্তার তাকে কোন পাহাড়ে তিন সপ্তাহকাল বিশ্রাম করবার পরামর্শ দিলেন। হ্যান্‌স আর দেরী করল না— যাত্রা করল সুইজার-ল্যাণ্ডের একটি স্বাস্থ্যাবাসের উদ্দেশ্যে।

স্বাস্থ্যাবাসটি লোকালয় থেকে অনেক উঁচুতে—সুইজারল্যাণ্ডের আল্‌পস পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে পৌঁছত না দুনিয়ার দৈনন্দিন জীবনের কোলাহল, বা কোন সমস্যা।

দু'দিন যেতে হ্যান্‌স উপলব্ধি করে, সেখানে নেই কোন কাজের তাড়া—শুধু গল্প আর খেলার জীবনধারা। সেখানে ঘড়ির কাঁটায় সময় নির্ধারিত হয় না; সে পরিবেশে দিনপঞ্জীও হয়ে যায় অর্থহীন।

য়ুরোপের প্রায় সব দেশ থেকেই লোক এসেছে এ স্বাস্থ্যাবাসে, সুস্থ হবার আশায়। হ্যান্‌স-এর এক সৈনিক ভাই—যোয়াসীম জীমসেনও আছে এখানে ক'বছর ধরে আরোগ্যের আশায়।

স্বাস্থ্যাবাস নয়, যেন যাদুপুরী! রোগীরা ভাবে—এটা বুঝি আরোগ্যনিকেতন।

ক্রমে হ্যান্‌সের সঙ্গে আলাপ হল স্বাস্থ্যাবাসের অধিকর্তা—ডাক্তার বেহরেন্সের সঙ্গে, আলাপ হল অন্যান্য রোগীদের সঙ্গে। সে জানল ডাক্তার নিজেও রোগগ্রস্ত।

হ্যান্‌স লক্ষ্য করল খাবার সময় সকলে ছোট ছোট দল হয়ে বসে। অধিকর্তা নিজেও কোন একটি দলে বসেন। রাশিয়ানদের জন্য হু'টি স্বতন্ত্র টেবিল—তার একটিকে বিশেষ সুনজরে দেখা হয় না।

ঐ টেবিলটাতে সাধারণতঃ যে দম্পতিটি জাঁকিয়ে বসে, তারা থাকতো হ্যান্‌স-এর লাগোয়া ঘরটিতে। আসলে ঘর একটি, মাঝখান দিয়ে হাল্কা পার্টিশন। পাশের ঘরে দম্পতির প্রেমালাপ এবং তার উচ্ছ্বাসের প্রতিটি শব্দ হ্যান্‌স স্পষ্ট শুনতে পায়—তা সেই হাল্কা পার্টি-শনের বাধা মানে না। দিনের বেলাতেও তাদের সেই প্রেমোচ্ছ্বাস হ্যান্‌স-এর অসহ্য লাগে।

সুন্দরী রাশিয়ান তরুণী ক্লাভিডারও এই স্বাস্থ্যাবাসের একজন রোগিণী। হ্যান্‌স তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। কিন্তু প্রতিবার দরজাটায় ও রকম একটা বিশ্রী শব্দ করে ক্লাভিডারের ঘরে ঢোকাটা হ্যান্‌স-এর ভাল লাগে না। সে শব্দ তার কাছে হয় বিরক্তিকর।

সেতেমব্রীনি ছিল ইতালিয়ান দার্শনিক এবং একজন দরদী লেখক। এ রোগীটির সঙ্গে হ্যান্‌স-এর আগেই আলাপ হয়েছিল। সেতেমব্রীনির মাধ্যমে হ্যান্‌স এবার পরিচিত হয় ইহুদী ন্যাপথার সঙ্গে। ন্যাপথা ছিল একজন সংশয়াত্মক পূর্ণবাদী।

সেতেমব্রীনি এবং ন্যাপথা ছিল অভিন্নহৃদয়। নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে ওদের দিন কাটে।

প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। হ্যান্‌সকে এবার ফিরে যেতে হবে। কিন্তু তার শরীরের কোন উন্নতি হয়নি। বরং এখানে এসে

সে যেন আরও একটু দুর্বল বোধ করে। তার মনে হয়, যেন রোজ একটু জ্বরও হয়। হ্যান্‌স চিন্তিত হয়।

পরীক্ষা করে ডাক্তার জানায় হ্যান্‌স-এর সন্দেহ মিথ্যা নয়। তার শরীরে যক্ষ্মার বীজ দেখা গেছে। তাই তিন সপ্তাহ পূর্ণ হয়ে গেলেও হ্যান্‌স-এর ফিরে যাওয়া হয় না। স্বাস্থ্যাবাসে রোগী হিসাবে হ্যান্‌স থেকে যায়।

হ্যান্‌স ভাবে, মন্দ কি! ক্লাভিডার তো আছে এখানে। ক্রমে শ্রীমতীর উপর তার আসক্তি বেড়ে যায়।

ইতিমধ্যে ডাক্তারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তরুণ হ্যান্‌স একদিন তুষার-ঝড়ের মধ্যেই 'স্কী' করতে বেরিয়ে যায়। ফলে তার শরীর আরও খারাপ হয়।

দিন যায়। হ্যান্‌স এখন স্বাস্থ্যাবাসটিকে নিজের বাড়ী বলেই মনে করে—যেমন মনে করে অন্য সকল রোগীরা। সেখানে কোন কাজের তাড়া নেই, নেই কোন দায়িত্ববোধ। হাতে অফুরন্ত সময়। সারাদিন শুধু গল্প আর গল্প। ইতিমধ্যে সে সেতেমব্রীনি ও ন্যাপথার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছে।

সৈনিক ভাই যোয়াসীম একটু নীরস প্রকৃতির, চিন্তাশক্তিও তার বিশেষ নেই। হ্যান্‌স জানে তাকে এখানে এখন কিছুদিন থাকতে হবে। তাই ভাই থেকে সে বেশী ঘনিষ্ঠ হয় সেতেমব্রীনি ও ন্যাপথার সঙ্গে। সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হতে সে চায় সুন্দরী ক্লাভিডার সঙ্গে।

সেতেমব্রীনি আর ন্যাপথা দু'জনে গভীর ভাবে আলোচনা করে নানা বিষয়ে। তারা আলোচনা করে—নন্দনতত্ত্ব, ঈশ্বরবাদ। তাদের সে আলোচনায় রাজনীতি এবং জ্যোতির্বিদ্যাও বাদ যায় না। হ্যান্‌স তাদের সে আলোচনায় যোগ দেয়। এমনি করে ওদের সময় কাটে।

এল কার্নিভাল। এই সময় স্বাস্থ্যাবাসের অনুশাসন শিথিল

হয়। রোগীরা মুক্ত বিহঙ্গের মত সেখান থেকে সব বেরিয়ে পড়ে। খেয়াল খুশী মত তারা ঘুরে বেড়ায়। উন্মুক্ত পরিবেশে সকলের মন একটু হাল্কা হয়।

হাল্কা হয় হ্যান্‌স-এর মনও। এই সময় হ্যান্‌স ক্লাভিডার কাছে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়। তার প্রস্তাব শুনে শ্রীমতী হেসে লুটিয়ে পড়ে।

—'হ্যান্‌স, সত্যিই তুমি কি ছেলেমানুষ! ভুলে যেও না—এ রোগীদের স্বাস্থ্যাবাস। এখানে হৃদয়বৃত্তির অবকাশ নেই। আমি দুঃখিত, তোমার এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।'

পরের দিন ক্লাভিডার রাশিয়ায় ফিরে চলে যায়। সে চলে যায় স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে, হ্যান্‌স-এর প্রেম দলিত করে।

ক্লাভিডার চলে যেতে হ্যান্‌স কেমন মুষড়ে পড়ে। সারাদিন সে ফোনোগ্রাম চালিয়ে গান শোনো, আর জীবন্মৃত হয়ে পড়ে থাকে। স্বাস্থ্যাবাসে থেকেও সে নিজের চারদিকে আর একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলে।

এ দিকে যোয়াসীমের ধারণা সে এখন সুস্থ হয়েছে। সে তার রেজিমেণ্টে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু ডাক্তার তাকে জানায়—এখনও তাকে ছ'মাস থাকতে হবে।

অধৈর্য সৈনিক কিন্তু একদিন ডাক্তারের সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করে স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে ফিরে যায় তার বাহিনীতে।

যোয়াসীমের আচরণে ডাক্তার মনে মনে ক্ষুণ্ণ হন। গম্ভীর কণ্ঠে হ্যান্‌সকে ডেকে তিনি বলেন,—'ইচ্ছা করলে আপনিও এখান থেকে চলে যেতে পারেন।'

ডাক্তারের মনোভাব বুঝতে হ্যান্‌স-এর অসুবিধা হয় না। সে স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে না।

আশ্চর্য! দু'দিন যেতে যোয়াসীম বেশী অসুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসে এই স্বাস্থ্যাবাসে। ক্রমে তার অবস্থা বিপজ্জনক হলে তার

মাকে খবর পাঠান হয়। মার দুর্ভাগ্য! ছুটে এসেও তিনি ছেলেকে শেষবারের মত দেখতে পান না।

এ ঘটনার দু'দিন বাদে শ্রীমতী ক্লাভিডারও আবার ফিরে এল এখানে। এবার তার সঙ্গে এল একজন প্রৌঢ় ওলন্দাজ—অনেকটা তার দেহরক্ষী হিসাবে।

ক্লাভিডারকে ফিরে আসতে দেখে হ্যান্‌স খুশীতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। দু'দিনের মধ্যেই সে ওলন্দাজটির সঙ্গে মিতালি করে। প্রৌঢ় বুঝতে পারে ক্লাভিডার প্রতি হ্যান্‌স-এর দুর্বলতার কথা। কিন্তু তাতে হ্যান্‌স-এর অসুবিধা হয় না। ওলন্দাজটি মারা যাওয়া পর্যন্ত তাদের দু'জনের বন্ধুত্ব অটুট থাকে।

আরও কিছুদিন পরের কথা। স্বাস্থ্যাবাসে এল একটি তরুণী—নতুন রোগিণী। সকলের মাঝে তরুণীটি একদিন ঘোষণা করে, যে-কোন মৃত লোকের আত্মাকে সে এখানে ডেকে আনতে পারে; তাকে দিয়ে সে কথা বলাতেও পারে।

তার উক্তি শুনে হ্যান্‌স কৌতুক বোধ করে। সাগ্রহে হ্যান্‌স এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে অনুরোধ জানায়—মৃত যোয়াসীমকে ডাকতে। রোগীরা মেয়েটিকে ঘিরে বসে।

কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক ডাক্তার এ প্রচেষ্টায় আপত্তি জানাতে তাদের সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়।

সেই সময় কি একটা সামান্য তুচ্ছ কারণে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু—ন্যাপথা এবং সেতেমব্রীনির মধ্যে তর্ক শুরু হয়। ক্রমে তাদের সে তর্ক মারাত্মক রূপ নেয়।

দু'জনেই খুব উত্তেজিত। হঠাৎ দু'জনেই পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানায়। উভয়েই প্রস্তুত। সেজন্য স্থান এবং কাল নির্ধারিত হতেও দেরী হয় না। রোগীরা চমকে ওঠে।

নির্ধারিত সময়ে দু'জনেই তৈরী হয়ে নেয়। কিন্তু হঠাৎ ইতালিয়ান

দার্শনিক সেতেমব্রীনি জানায়, সে শূন্যে গুলি ছুঁড়বে—প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি নয়। শুধু কথায় নয়, কাজেও সে তাই করে।

ফলে, ন্যাপথার পৌরুষে লাগল। সে হাতের রিভলভারটি ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের কপালের দিকে তুলে ধরল।

উপস্থিত রোগীরা দুই বন্ধুর আচরণ দেখে কৌতুক বোধ করে।

হঠাৎ 'গুম্' করে একটি শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাপথার রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার দেহের রক্তের ধারায় শুভ্র তুষার রাঙ্গা হয়ে ওঠে।

সকলে স্তম্ভিত হয়। তারা সকলে নির্বাক, শুধু ভাবে—স্বাস্থ্যাবাসে এও কি সম্ভব!

হ্যান্স-এর মনে পড়ে আজ থেকে সাত বছর আগে সে এসেছিল এই স্বাস্থ্যাবাসে। এসেছিল সে অতিথি হয়ে, মাত্র তিন সপ্তাহকালের জন্য। তখন কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল—এই স্বাস্থ্যাবাসটি এককালে হবে তার ঘর।

এই দীর্ঘদিনে সে দেখেছে প্রতিষ্ঠানের কত পরিবর্তন আর তার নব নব রূপ। দেখেছে সে রোগীদের জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার ছবি আর মৃত্যুর বিভীষিকা।

মাঝে মাঝে হ্যান্সের মনে হয়, বুঝি তার ব্যক্তিসত্তা স্বাস্থ্যাবাসটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে, নেই তার আলাদা অস্তিত্ব।—যা আছে তা শুধু তার নিরর্থক মায়া মাত্র। সে আজ উপলব্ধি করেছে,—মিনিট বা বছরের মাপকাঠি দিয়ে সময় নির্ধারণ করা তার কাছে অর্থহীন। তার মূল্যায়ন হয় কর্মময় দুনিয়ায়, এ স্বাস্থ্যাবাসে নয়।

একদিন খবরের কাগজ বয়ে নিয়ে এল এই উঁচু পাহাড়টিতেও সেই দারুণ সংবাদ: য়ুরোপের চারিদিকে যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ)

দামামা বেজে উঠেছে। সে খবর জেনে সারা স্বাস্থ্যাবাসটি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিছু রোগী বাড়ী ফিরে যায়। কিছু থেকে যায় নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডে। যুদ্ধের খবর হঠাৎ জাগিয়ে তোলে হ্যান্‌সকে তার আচ্ছন্নভাব থেকে। জেগে ওঠে তার অন্তরের সুপ্ত-সত্তা। কেটে যায় তার জীবনের দুঃস্বপ্ন! সে ভুলে যায় প্রিয়তমা ক্লাভিডার-কেও।

হাসিমুখে হ্যান্‌স এগিয়ে যায় তার পুরানো বন্ধু—সেতেমব্রীনির কাছ থেকে বিদায় নিতে। মুগ্ধ নয়নে বন্ধু তাকিয়ে থাকে হ্যান্‌স-এর মুখের দিকে। হ্যান্‌স-এর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে দৃঢ় প্রত্যয় আর সঙ্কল্পের আভাস।

দীর্ঘ সাত বছর পর স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে হ্যান্‌স বেরিয়ে পড়ে বৃহত্তর জীবনের জরুরী আহ্বানে—দেশের ডাকে। সে নাম লেখাল জার্মান সেনাবাহিনীতে।

তার কাঁধে বন্দুক, কণ্ঠে শুবার্টের গানের কলির গুঞ্জন, হ্যান্‌স এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

রাজপথ

আমেরিকান সাহিত্যিক সিনক্লেয়ার লুইস (Sinclair Lewis)-এর 'মেইন স্ট্রীট' (Main Street), ১৯৩০, উপন্যাস অবলম্বনে।

শ্রীমতী ক্যারল মিলফোর্ড আদর্শবাদী তরুণী ; সমাজ বিজ্ঞান, বিশেষ করে পল্লী উন্নয়নের কাজে অনুরাগী।

এ পর্যন্ত যতগুলি সহর তার নজরে পড়েছে শ্রীমতী ক্যারলের মনে হয়েছে—সহরের নামে সেগুলি শুধু কতগুলি নোংরা ঘিঞ্জি পল্লীর জটলা মাত্র। সেখানে নেই কোন শ্রীর বালাই, আছে রুক্ষ মরুভূমির হাতছানি।

সেই ছোট ছোট সহরগুলিকে সতেজ এবং শ্রীমণ্ডিত করে গড়ে তুলতে মাঝে মাঝে তার প্রবল ইচ্ছা জাগে। সাধ থাকলেও সে জানে তার একক শক্তিতে তা সম্ভব নয়।

তবুও সেই দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে তার অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা কখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

মেনিসোটার কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীমতী ক্যারল স্নাতক উপাধি লাভ করল। উপাধি নয় তো, ক্যারলের মনে হল যেন সে বিশ্বজয়ের হাতিয়ার লাভ করল।

শ্রীমতীর বিশ্বাস, এবার তার স্বপ্ন সার্থক হবে। তার মহান আদর্শকে সামনে রেখে মনে মনে সে নানা পরিকল্পনায় মেতে ওঠে।

এমন সময় গফার সহরের নিবাসী ডাক্তার উইল কেনীকট-এর সঙ্গে তার একদিন পরিচয় হয়। ডাক্তার উইলের মুখে তার সহরের অকুণ্ঠ সুখ্যাতি শুনে শ্রীমতী কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

সে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে উইলের মুখের দিকে। উইল বলে যায়—

'হাঁ, আমাদের গফার সহরটির কথাই আপনাকে বলছিলাম। সেখানে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। আর আপনার মত একজন গুণী নারীকে পেলে শুধু আমি নই, আমাদের গোটা সহরটি ধন্য হবে।'

সব শুনে শ্রীমতী ক্যারল শুধু গফার সহরটির জন্যই নয়, ডাক্তার উইলের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করে।

ছু'দিন বাদে শ্রীমতী ক্যারল উইলের সঙ্গে হাত মেলাল। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল তারা।

বিয়ের পর উইল শ্রীমতী ক্যারলকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল নিজের সহর গফারের উদ্দেশ্যে।

ওরা ছু'জনে গাড়ীতে চেপে বসল। ট্রেনটি ছাড়ল।

শ্রীমতী ক্যারলের আনন্দ ধরে না। নতুন জীবনের আশা। সে ঘর বাঁধবে সেই আদর্শ-সহরে।

গাড়ী এগিয়ে চলে। শ্রীমতী অলস দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

গাড়ী ছুটে যায়। চলার পথে ছু'ধারে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে ছোট ছোট সহর। তাদের ঐ একই রূপঃ সেই কদাকার বেঢপ চেহারার নোংরা কতগুলি বস্তির জটলা। তার পরিবেশ রুক্ষ।

তাই দেখে শ্রীমতীর চিত্ত বিকল হয়। সে এক একবার শিউরে ওঠে। সে ভাবতে পারে না, সেখানের লোকগুলি কি করে দিন কাটায়।

শ্রীমতী ওখানকার লোকগুলির জন্য বেদনা বোধ করে। তাদের ছুরবস্থার কথা ভেবে সে হয় মর্মাহত।

মাঝে মাঝে সে উইলকে ব্যস্ত হয়ে তথাকথিত সেইসব সহর এবং তার জনগণের কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে।

তার সেই সব প্রশ্নে উইল কিন্তু কান দেয় না। নির্লিপ্ত কণ্ঠে সংক্ষেপে সে জবাব দেয়—

'ওরা সব সুখেই আছে।'

শ্রীমতীর সন্দিগ্ধ মন সে জবাবে তুষ্ট হয় না। সে গফার সহরটির কল্পনা করে নেয় চলার পথের অনুরূপ কোন একটি সহরের মতো।

এক সময় তাদের ট্রেনটি এসে গফার সহরে পৌঁছল।

শ্রীমতী ক্যারল ভাবে, তার অনুমান মিথ্যা হয়নি। সহরটিতে পা দিতে তার মন ভেঙ্গে পড়ে। সে উপলব্ধি করে—সহরটি সেই একই ছাঁচে ঢালা, আকারে হয়ত বা একটু বড় হবে।

স্থানীয় লোকগুলিকে শ্রীমতীর মনে হয় স্থূল এবং একঘেঁয়ে। তাদের চাল চলন তার কাছে লাগে অসহ্য ; তারা তাদের চাষের জমির মতই যেন নীরস। তাদের বেশবাসের মধ্যেও সে খুঁজে পায় না এতটুকুও বৈচিত্র্যের আভাস।

উইলের পৈতৃক বাড়ীটি ছিল পুরানো ধাঁচের। সে বাড়ীতে পা দিয়ে শ্রীমতী হতাশ হয়। আশ্চর্য, উইল তাকে জানায়--এ বাড়ীটি তার নাকি পরম প্রিয়। তার কাছে এটির তুলনা নেই।

শ্রীমতী ক্যারলের সম্মানে উইল একটি প্রীতি-ভোজের আয়োজন করে। তাতে নিমন্ত্রিত হয় সহরের সব সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং নারী। উদ্দেশ্য ঃ তাদের সকলের সঙ্গে স্ত্রীকে পরিচিত করা।

শ্রীমতী লক্ষ্য করল, সে সব পুরুষদের আলোচনার বিষয়বস্তু ঃ মোটর গাড়ী, ট্রেনের আসা-যাওয়ার সময়, নয় তো তাদের সোনার সহরটিকে কেন্দ্র করে। সে অবাক হয়—এর বেশী তারা ভাবতে পারে না।

আর মেয়েদের একঘেঁয়ে জটলা ঃ সেলাই, রান্না আর মুখরোচক পরচর্চা—যার মধ্যে কোন মাধুর্যই শ্রীমতী খুঁজে পায় না।

এক ফাঁকে মেয়েদের কথাবার্তার ভিতর থেকে শ্রীমতী ক্যারল জানল, সে সহরে মহিলাদের জন্য আছে ছ'টি ক্লাব—তাদের একমাত্র প্রাণকেন্দ্র !

ক'দিন বাদে শ্রীমতী ক্যারল হাজির হল একটি ক্লাবে। সেখানে গিয়ে সে ভাবখানা দেখাল যেন ক্লাবের সভ্যরা কিছু জানে না। সে কটাক্ষ করল গ্রন্থাগারিকের কাজের রীতির প্রতি। তাকে অযাচিত উপদেশ দিতেও সে কিছুমাত্র দ্বিধা করল না।

গ্রন্থাগারিকের উপযুক্ত জবাবে শ্রীমতী নিজেকে সামলে নিতে বাধ্য হয়। সে বাড়ী ফিরে আসে।

ক্রমে শ্রীমতী হয়ে ওঠে দুঃখ-বিলাসিনী। কোন কিছুই তার ভাল লাগে না—ভাল লাগে না সে সহরের আবহাওয়া, তার চারিদিকের পরিবেশ। সে আনন্দ পায় না তার স্বামীর সঙ্গলাভেও।

দিন যায়। শ্রীমতী ক্যারল বাড়ীতে দাসী রাখল অভাবিত বেতন দিয়ে। তাই দেখে শুধু উইল নয়, প্রতিবেশীরাও অবাক হয়।

একদিন সে বাড়ীতে এক প্রীতি-ভোজের আয়োজন করে প্রাচ্য দেশের ঢংয়ে। তা করুক। কিন্তু সেই সম্মিলনে নিমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতি উপেক্ষা করে সে তার পাদুকা দু'টি খাবার টেবিলের নীচে ছুঁড়ে ফেলে তার অশোভন চাপল্য প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না।

তাই দেখে মহিলারা সকলে তার দিকে ভ্রূকুটি করে ওঠেন। তাঁরা শ্রীমতীর সামাজিক শিষ্টতাবর্জিত আচরণ দেখে ক্ষুব্ধ হন।

অতঃপর শ্রীমতী ক্যারল তার স্বামীর পৈতৃক বাড়ীটির সংস্কার সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে—পুরানো বনেদি বাড়ীর অতীত ঐতিহ্য সব সে মুছে ফেলে দেয়।

শ্রীমতী ক্যারল পরে একদিন মহিলাদের দ্বিতীয় ক্লাবটিতে যোগ দেয়। উদ্দেশ্য, সে ক্লাবের মারফৎ স্থানীয় মহিলাদের সমাজ উন্নয়ন কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

শ্রীমতী সকলের কাছে আবেদন করে সহরের গরীবদের কষ্ট লাঘব করার জন্য একটি তহবিল খুলবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে সকলে প্রতিবাদ করে—সেখানে সত্যিকারের কোন অভাবী লোক নেই।

শ্রীমতী এবার প্রস্তাব করে—চাঁদা তুলে আধুনিক রুচিসম্মত একটি নতুন হল-ঘর তৈরী করবার জন্য। কিন্তু পুরানোটি বর্তমান থাকতে নতুন করে আর একটি গড়ে তোলার দুঃস্বপ্ন দেখতে তাঁরা রাজী নন।

ইতিমধ্যে উইল শৈলাবাসের উপযোগী একটি ছোট্ট বাড়ী কেনে। অগত্যা শ্রীমতী সহরের অসহ্য আবহাওয়ার থেকে দূরে সরে গিয়ে সেই নতুন বাড়ীটিতে আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি পায়।

এল শরৎকাল। শ্রীমতীকে আবার সহরে ফিরে আসতে হয়।

এবার তার দৃষ্টি পড়ল স্বামীর ওপর। সে জানল, উইল সহরে সর্বজনপ্রিয় একজন ডাক্তার। সে কথা জেনে শ্রীমতী ক্যারল যেন একটু গর্ব বোধ করে। সে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে।

কিন্তু লোকটিকে শ্রীমতীর অদ্ভুত বলে মনে হয়। তার কাজ যত কঠিনই হোক না কেন উইল তা কর্তব্য বলে মনে করে। কাজের সুখ্যাতির জন্য সে কিছুমাত্র লালায়িত হয় না। পেশাকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবেই সে নিয়েছে।

কিছুদিন যেতে ক্যারল আরও উপলব্ধি করল—তার প্রেম লোকটিকে স্পর্শ করে না। সে জানল, তার স্বামীর কোন রোমান্স বোধ নেই।

তাই অগত্যা তাকে আবার মহিলাদের ক্লাবে বেশী যাতায়াত করতে হয়।

সে মহিলাদের সাহিত্য, শিল্প এবং নাটকের প্রতি অনুরাগী করে তুলতে চেষ্টা করে। এবারও তাকে হতাশ হতে হয়।

ওদের বিয়ের তিন বছর পরের কথা।

শ্রীমতী ক্যারল একদিন জানল, সে মা হতে চলেছে। ক্রমে সহরের সকলে সে কথা শুনল। এবার তারা শ্রীমতীকে তাদেরই একজন বলে গ্রহণ করে নেয়।

ছেলে কোলে এলে শ্রীমতী স্থির করে শিশু-পুত্রটি একটু বড় হলে এই সহরের আওতা থেকে বহুদূরে কোথাও রেখে তাকে সে মানুষ করবে।

ছেলেকে নিয়ে সব সময় সে ব্যস্ত থাকে; সময় কি করে কেটে যায় শ্রীমতী টের পায় না। তাই সহর সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার আর অবকাশ সে পায় না।

এবার একটি নতুন বাড়ী তৈরী করতে সে উদ্‌গ্রীব হয়। কিন্তু সে বাড়ীর প্যাটার্ন সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে সে কিছুতেই একমত হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বাড়ীটি আর হয়ে ওঠে না।

ইতিমধ্যে সহরের রুচিবান তরুণ-দর্জীর সঙ্গে শ্রীমতী ক্যারলের পরিচয় হয়। প্রথম দর্শনে শ্রীমতী তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। ফলে সুযোগ পেলেই সে দর্জীর সঙ্গে গোপনে দেখা করে।

একদিন উইল স্ত্রীকে জানায়—

'দেখ, দর্জীর সঙ্গে তোমার এই অবাঞ্ছিত ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সহরে কিন্তু কথা হচ্ছে।'

স্বামীর অভিযোগ শুনে শ্রীমতী ক্যারল লজ্জা পায়। সে ঐ লোকটির সঙ্গে আর দেখা করবে না বলে উইলের কাছে প্রতিশ্রুত হয়।

এ ঘটনার পর দর্জীটি অবশ্য সহর ছেড়ে কোথায় চলে যায়।

আরও কিছুদিন পরের কথা। উইল স্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করে—'চল কিছুদিন ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে ঘুরে আসি।'

শ্রীমতী ক্যারল ভাবে গফার সহরের বৈচিত্র্যহীন জীবন থেকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পালাবার সুযোগ বটে! সে স্বামীর প্রস্তাব খুশী মনে গ্রহণ করে।

প্রায় তিন মাস হল ওরা ক্যালিফোর্ণিয়াতে এসেছে। বহুদূরে পড়ে আছে সেই অবাঞ্ছিত গফার সহরটি। আশ্চর্য, শ্রীমতী ক্যারল ভেবে পায় না, তবুও কেন সেই সহরের অসহ্য গ্লানিকর জীবনের জ্বালা সে অনুভব করে প্রতিক্ষণে; কেন সে এখানে এসেও বোধ করে না কিছুমাত্র বৈচিত্র্য, এতটুকুও আনন্দ!

হঠাৎ স্বামীর প্রতি নজর পড়তেই সে রহস্য তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করল—উইল নিজেই গফার সহরটির একটি জ্যান্ত প্রতিমূর্তি—তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে তো সে মুক্তি পায়নি। তাই তো এই বিড়ম্বনা!

সহরে ফিরে এসে শ্রীমতী ক্যারল মনে মনে স্থির করে, এবার স্বামীর আওতা থেকে দূরে কোথাও তাকে পালাতে হবে।

স্বামীর সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্কের পর শ্রীমতী ক্যারল তার ছেলেটিকে নিয়ে একদিন ওয়াশিংটনে চলে যায়।

কিছুদিন বাদে ওয়াশিংটন সহরটিও সেই একঘেঁয়ে গফার সহরেরই প্রতিচ্ছবি বলে ক্যারলের মনে হয়। সেখানকার লোকজন বা রাস্তার ভিতর এতটুকুও বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব সে খুঁজে পায় না।

মাঝে মাঝে তার মনে হয় যেন গফার সহরের রাজপথটিও বুঝি কেউ এই সহরে এনে বসিয়ে দিয়ে সেটি আকারে বড় করে দিয়েছে।

তাই এখানে এসেও ক্যারল আবার মুষড়ে পড়ে অথচ তার এই অনুভূতি স্বামীকে জানাবার কথাও সে ভাবতে পারে না।

আরও এক বছর পরের কথা। উইল গেল ওয়াশিংটনে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে।

এতদিন বাদে পিতাকে দেখে ছোট্ট ছেলেটি আনন্দে নাচতে শুরু করে। কখনও বা সে পিতাকে জাড়য়ে ধরে। শ্রীমতী বুঝতে পারে—এবার তার গফার সহরে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সপরিবারে উইল নিজের সহরে ফিরে আসে।

আশ্চর্য, এবার কিন্তু গফার সহরটিকে শ্রীমতী ক্যারলের অদ্ভুত ভাল লাগে। ভাল লাগে তার সব সহরবাসীকে—জনগণকে মনে হয় তার আপন জন বলে। বিগত দিনের বিতৃষ্ণার কথা একবারও তার মনে জাগে না।

শ্রীমতী ক্যারল মহিলাদের ক্লাবে এবার সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে সহজ ভাবে। এখন তার কথায় ফুটে ওঠে না এতটুকু ব্যঙ্গ বা দম্ভের আভাস। তার আলাপ আর আচরণে থাকে গভীর অন্তরঙ্গতা এবং সহানুভূতির ব্যঞ্জনা।

মহিলারা সকলে তাকে জানায় সাদর অভ্যর্থনা। তারা তাকে গ্রহণ করে তাদেরই একজন পরম বান্ধবী বলে। আজ তাকে বাদ দিয়ে কেউ সে সহরের জীবন ভাবতে পারে না।

এতদিন বাদে শ্রীমতী ক্যারলের জীবন হয়ে ওঠে মধুময়। সে পায় শান্তির স্বাদ। আজ গফার সহরটিকে তার মনে হয় যেন বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত।

মুগ্ধদৃষ্টিতে শ্রীমতী ক্যারল তাকিয়ে থাকে সহরের সুবিস্তৃত রাস্তাটির দিকে—যে রাস্তার কাছে ম্লান হয়ে যায় তার আগেকার দেখা সব রাজপথগুলি।

ফরসাইট পরিবার

ইংরেজী সাহিত্যের লেখক জন গলস্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy)-এর 'ফরসাইট সাগা' (The Forsyte Saga), ১৯০৬, ২০, ২১, উপন্যাস মালার সংক্ষিপ্তসার।

১৮৮৬ সালের জুন মাস। জোলিঅন ফরসাইটের নাতনী জুন-এর সঙ্গে স্থপতি ফিলিপ বোসিনে-এর বিয়ে ঠিক হয়। বাগ্‌দত্ত ফিলিপকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ফরসাইট-এর বাড়ীতে এক প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন হয়।

এই ঘরোয়া আনন্দ উৎসবে ফরসাইট পরিবারের সকলেই উপস্থিত হয়। জোলিঅন-এর ধনী ভাইপো সোমস্‌ ফরসাইট আর তার সুন্দরী স্ত্রী আইরিন-ও যোগ দেয়। সেখানে উপস্থিত থাকে না জুনের বাবা। কোন এক সময় সে এক গৃহ-শিক্ষিকাকে নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মারা যাবার পর মেয়েটিকে বিয়ে করে সে এই পরিবার থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। সে এই পরিবারের কলঙ্ক; তাই সে এই প্রীতি-সম্মিলনে অবাঞ্ছিত।

সমারোহে উৎসব শুরু হয়। সকলের অলক্ষ্যে আইরিন ও ফিলিপ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এক সময় সেই প্রশস্ত হল ঘরটির কোণের দিকে এগিয়ে গিয়ে ফিলিপ মুগ্ধদৃষ্টিতে আইরিনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—অমন করে তাকিয়ে কি দেখছেন, মধুর কণ্ঠে আইরিন শুধায় ফিলিপকে।

—দেখছি তোমার অপরূপ রূপ।

—কি যে বলেন! আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম—জুনের

ভাগ্য যে-কোন তরুণীর মনে ঈর্ষা জাগাবে, আনতমুখে আইরিন বলে।

—সত্যি বলছেন? ফিলিপের কণ্ঠে উৎসাহের সুর।

তু'জন সেদিকে এগিয়ে আসতে ওদের রসভঙ্গ হয়।

দীর্ঘদিন কেটে গেছে। পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ নেই। অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন বৃদ্ধ ছেলেকে ভুলতে পারে না। স্নেহাতুর জোলিয়ন নিজে গিয়ে একদিন হাজির হলেন সেই ত্যাজ্যপুত্রের কাছে। সেখানে গিয়ে দেখলেন তার তু'টি সন্তান হয়েছে; ছেলে জলি আর মেয়ে হোলি। বাপ বুঝলেন সাধারণ কেরানীবৃত্তি করে তার ছেলের পক্ষে এই সংসার স্বচ্ছল ভাবে চালানো সম্ভব নয়। জোলি-অনের কেমন মায়া হয়। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি তার উইল বদলে ফেলেন: এবার জুন পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পাবে আর এতদিনের বঞ্চিত ছেলে পাবে বছরে এক হাজার পাউণ্ড; বাকি সব কিছুর উত্তরাধিকারী হয় ছেলে। আগের মতো তিনি জুনকে সব সম্পত্তি দেন না।

সোমস্ ফরসাইট এবং আইরিনের বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। লোকচক্ষুর অন্তরালে তু'জনে এক সঙ্গে ঘর করছিল এই যা। ক্রমে আইরিনের কাছে সে জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। একদিন সোমস্‌কে তার বিয়ের আগেকার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে।

অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াবার জন্য সোমস্ স্ত্রীকে একটি সুন্দর পল্লী-আবাস তৈরী করে দিতে প্রতিশ্রুত হয়। আইরিন ভাবে, মন্দ কি। সে জানায়—তথাস্তু।

সেই বাড়ীর জন্য 'রবিন হিলে' জায়গা কেনা হয়। বাড়ীটি তৈরীর ভার পড়ে স্থপতি ফিলিপের উপর, সেটির নক্সাও শেষ পর্যন্ত তৈরী

হয় তারই ইচ্ছামত। কাজ শুরু হয়। হিসাবের চেয়ে বেশী খরচ হওয়ার জন্য ইতিমধ্যে একদিন ফিলিপের সঙ্গে সোমস্-এর ঝগড়া হয়ে যায়। তবুও কাজ এগিয়ে যায় দ্রুতগতিতে।

নতুন বাড়ীটি দেখবার জন্য সোমস্-এর কাকার সঙ্গে আইরিন একদিন এল 'রবিন হিলে'। সেখানে পৌঁছে বৃদ্ধ স্নুইথীন একদিকে গিয়ে বিশ্রাম করে। সেই ফাঁকে নির্জন পরিবেশে আইরিন এসে ফিলিপের সঙ্গে মিলিত হয়। ফিলিপ তাকে প্রেম নিবেদন করে, আইরিন তাকে আত্মদান করে।

এ ঘটনার পর থেকে ওরা ছ'জনে ছ'জনকে গভীর ভাবে ভালবাসে। আইরিনের পক্ষে সোমস্-এর সঙ্গে ঘর করা অসহ্য হয়ে ওঠে। সে আলাদা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে। সেখানে ফিলিপ আর আইরিনের গোপন মিলনে অসুবিধা হয় না। আইরিনের প্রেমসুধা পান করে ফিলিপ তার বাগ্‌দত্তা জুনকে ক্রমে ভুলে যায়।

বৃদ্ধ জোলিঅন তার নাতনীর বিষণ্ণতার কারণ খুঁজে পান না। হাওয়া বদলের জন্য তিনি জুনকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে যান। কিন্তু তবুও জুনের কোন পরিবর্তন না দেখে দাছুর মনে সন্দেহ জাগে। তাই তিনি ছেলেকে চিঠি দেন ঃ ফিলিপের সঙ্গে দেখা করে তার খবর জানাবার জন্য। তাতে কোন ফল হয় না।

এক সময় 'রবিন হিলের' সৌখিন পল্লী-আবাসটি শেষ হয়। খরচ হয় বিস্তর, তাতে সোমস্-এর ঋণ হয় অনেক। বাড়ীটি সোমস্-এর সাধ্যের অতিরিক্ত খরচে বানিয়েছে বলে সে ফিলিপের নামে আদালতে নালিশ করে। আইরিন মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। সে প্রকাশ্যে জানায়, সে ঐ বাড়ীতে কোনদিন বাস করবে না ; সেখানে সে পাও বাড়াবে না।

বিচারের দিন ফিলিপ আদালতে উপস্থিত হয় না। সোমস্ সহজ ভাবেই সে মামলায় জিতে যায়। আদালতে জেতে বটে কিন্তু সোমস্ নিজের কাছে হেরে যায়। বাড়ী ফিরে দেখে তার ঘর শূন্য—আইরিন নেই।

বিচারের দিন আইরিন চলে গেছল ফিলিপের বাড়ীতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা এক সঙ্গে কাটায়। ফিলিপ জানে আগের দিন রাত্রে সোমস্ তার স্বামীর দাবী জোর করে আদায় করে নিয়েছিল আইরিনের কাছ থেকে। সে কথা শুনে তার মনটা খুশী হয় না।

আইরিনের উক্তি শুনে ফিলিপের মনে কেমন সন্দেহ জাগে। সে ভাবে তবে কি আইরিন ছলনাময়ী! আস্তে আস্তে সে এক সময় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কুয়াশা ঢাকা লণ্ডনের সুবিস্তৃত পথ। সে পথ দিয়ে চলতে চলতে ফিলিপ হঠাৎ চলন্ত গাড়ীর নীচে পড়ে প্রাণ হারায়। কে জানে এ কি দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা!

ফিলিপ মারা যাবার পর আইরিন বাড়ী ছেড়ে আস্তানা নেয় ছোট্ট একটি ফ্লাট বাড়ীতে। সেখানে গানের মাস্টারি করে সামান্য রোজগার করে সে নিজের খরচ চালায়।

জুনের অনুরোধে বৃদ্ধ জোলিঅন 'রবিন হিলের' বাড়ীটি কিনে নেন। সোমস্ ঋণমুক্ত হয়।

ক'বছর পরের কথা। গ্রীষ্মকাল। একদিন আইরিন চুপি চুপি এল 'রবিন-হিলে' বৃদ্ধ জোলিঅনের কাছে। বৃদ্ধ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সুন্দরী নারীর জয় সর্বত্র। অল্প সময়ের মধ্যেই আইরিন জোলিঅনের হৃদয় জয় করে। দু'দিন বাদে আইরিন ফিরে যেতে চায়। তা শুনে বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন,—

—সে কি কথা? এতো তোমারি বাড়ী! আমি রক্ষক মাত্র। আরও ক'দিন থাক।

জোলিঅনের অনুরোধে আইরিন প্রায় পুরো গ্রীষ্মকালটা সেখানে

কাটিয়ে বৃদ্ধের মনকে খুশীতে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। আবার আসবার আশ্বাস জানিয়ে আইরিন একদিন চলে যায়। আইরিনের প্রতীক্ষায় বৃদ্ধ জোলিঅন দিন গোনে। কিন্তু ক'দিন বাদেই বৃদ্ধ মারা যায়।

ওদিকে আইরিন বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর সোমস্‌ ফরসাইট অর্থ উপার্জনে মন দেয়। কিন্তু সে অর্থ ভোগ করবে কে? তাই ক'দিন যেতে অর্থের সঙ্গে সে কামনা করে সন্তান—উত্তরাধিকারী। সে স্থির করে, আবার সে বিয়ে করবে ফরাসী তরুণী এ্যানেটকে।

এই সময় তার বোন উইনিফ্রেডের এক পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে: তার স্বামী কোন এক স্প্যানিশ নর্তকীর প্রেমে পড়ে উইনিফ্রেডের সব কিছু চুরি করে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যায়। বিপদে পড়ে বোন ভাইয়ের শরণাপন্না হয়। ওদিকে আইরিন তখনও সোমস্‌কে আইনত ত্যাগ করেনি।

বিয়ে স্থির করে সোমস্‌ যায় আইরিনের কাছে, যদি সে স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ করে। কিন্তু সোমস্‌ সেখানে গিয়ে আইরিনের জন্য আকর্ষণ বোধ করে। সে অনুরোধ করে স্ত্রীকে তার সঙ্গে ফিরে আসবার জন্য। কোন ফল হয় না। আইরিন তার সঙ্কল্পে অটল।

অগত্যা সেখান থেকে ফিরবার আগে সোমস্‌ একজন গোয়েন্দা নিয়োগ করে আইরিনের চলাচলের উপর নজর রাখবার জন্য।

বৃদ্ধ জোলিঅন অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। মারা যাবার আগে তিনি আইরিনের নামেও একটি বিশেষ উইল করে গেছলেন—সে সম্পত্তির ট্রাস্টি করে গিয়েছিলেন তাঁর বিপত্নীক পুত্রকে।

কিছুদিন পর সোমস্‌ ফিরে আসবার জন্য আইরিনকে আবার অনুরোধ করাতে সে ট্রাস্টি জোলিঅন-এর ছেলের শরণাপন্ন হয়। সোমস্‌কে এড়াবার জন্য আইরিন চলে যায় প্যারীতে। ক'দিন বাদে ছোট জোলিঅনও প্যারীতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়।

প্যারীতে যাবার দু'দিন পর ছোট জোলিঅন জানলে তার ছেলে জলি বুয়ার যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে। খবর শুনে সে ফিরে আসে। এ দিকে তার মেয়ে হোলি সোমস্-এর ভাগ্নে ভল ডাত্রীর প্রেমে পড়ে। কিন্তু জলির প্ররোচনায় ভলও বুয়ার যুদ্ধে চলে যায়। ভলের সঙ্গে হোলির আর বিয়ে হল না। আহত হৃদয়ে হোলি তার দিদি জুনের সঙ্গে রেডক্রসে সেবিকা হিসাবে যোগ দেয়।

এই সময় সোমস্-এর ভগ্নীপতি মণ্টি ডাত্রী ধূমকেতুর মত একদিন আবার ফিরে আসে। সে নর্তকীর মোহমুক্ত হয়েছে। ফিরে এল সে রিক্তহস্তে। কেলেঙ্কারি আর বাড়তে না দিয়ে উইনিফ্রেড স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়।

শেষ চেষ্টার জন্য সোমস্ প্যারীতে এসে আবার হাজির হল আইরিনের কাছে। ভয় পেয়ে আইরিন ছুটে ছোট জোলিঅন-এর আশ্রয়ে পালিয়ে যায়।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে। এই সময় সোমস্-এর উকিল ওদের অভিযুক্ত করে অবৈধ প্রেমের অপরাধে। প্রেমিক যুগল স্থির করে তারা বিদেশে কোথাও পালিয়ে যাবে। যাত্রার আয়োজন শুরু হয়। ঠিক সেই সময় খবর এল জলি আফ্রিকার অভিযানে এণ্ট্রিক জ্বরে মারা গেছে। আত্মজের মৃত্যুতে জোলিঅন মনে আঘাত পায়। ওদিকে আইনসঙ্গত ভাবে সোমস্ এবং আইরিনের বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সোমস এ্যানেটিকে বিয়ে করেছে। এবার জোলিঅন আর আইরিনের মিলনে কোন বাধা থাকে না।

ফরসাইট পরিবারের সব ঘরে অশান্তি আর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যেই ভল ও হোলির বিয়ে হয়ে যায়।

ক'দিন বাদে আইরিন ছোট জোলিঅন-কে একটি ছেলে উপহার দেয়। মা-বাবার স্নেহ আর যত্নের মধ্য দিয়ে ছোট্ট জন ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে।

এ্যানেটিও তু'দিন বাদে মা হতে চলেছে। সোমস্-এর আনন্দ ধরে না। কিন্তু প্রসবের সময় মা এবং তার গর্ভের সন্তানের প্রাণ একই সঙ্গে বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিভ্রান্ত সোমস্ এ্যানেটির জীবন তুচ্ছ করে তার অনাগত উত্তরাধিকারীর প্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়। ভাগ্য-ক্রমে মা ও সন্তান তুজনেই বেঁচে যায়। কিন্তু তার মা-বাবার অতি আদরের মেয়ে ফ্লুয়ার অল্প বয়সেই বয়ে যায়।

আরও ক'বছর পরের কথা। সোমস্ ফরসাইটের ভগ্নীপতি মন্টি ডাত্রী মারা গেছে। বাপ মারা যাবার পরে ভল ডাত্রী হোলিকে নিয়ে ঘোড়ার ব্যবসায় মন দেয়। ইতিমধ্যে সোমস্ একদিন তার ব্যক্তিগত চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। সে প্রদর্শনীতে জনৈক মাইকেল মণ্টকে সে আহ্বান জানায়। ঐদিন বিকালে সোমস্ বিশ বছর পর আইরিনকে দেখল, সঙ্গে তার সুন্দর ছেলে—জন।

ঘটনাচক্রে সোমস্-এর মেয়ে ফ্লুয়ার-এর সঙ্গে জনের আলাপ হ'ল। সেই আলাপের পরিণতি হয় গভীর প্রেমে। ওদের তুই পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ সম্বন্ধে পরস্পরের একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু চতুর মেয়ে ফ্ল য়ার-এর সে দ্বন্দ্বের কারণ বিশদ ভাবে জানতে দেরী হয় না। তবুও জনের প্রতি তার গভীর ভালবাসা কিছুমাত্র শ্লথ হয় না। সে তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে—এজন্য জনকে তাগিদ দিতেও দ্বিধা করে না।

এদিকে প্রস্পার প্রোফণ্ড-এর সঙ্গে এ্যানেটি অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। সে সম্পর্কে সোমস্ প্রশ্ন করলে এ্যানেটি স্বীকার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। তবে এ নিয়ে সে কোন কেলেঙ্কারি করবে না বলে সোমস্-কে আশ্বাস দেয়। মেয়ে ফ্লুয়ার-এর ব্যাপারেও সোমস্ নির্বাক।

কিন্তু জনের ভাবিষ্যতের কথা ভেবে জোলিঅন আর চুপ করে থাকতে পারে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোলিঅন একদিন একটি চিঠির

মাধ্যমে ছেলেকে জানিয়ে দেয় তার মা আইরিন ও ফ্লুয়ারের বাবা সোমস্-এর সম্পর্কের ইতিহাস।

চিঠি পড়ে জন হয় স্তম্ভিত। সে উপলব্ধি করে ফ্লুয়ারকে তার পক্ষে বিয়ে করা আর সম্ভব নয়। জোলিঅন মারা যাবার পর জন-এর সঙ্কল্প দৃঢ় হয়; সে ইংলণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় চলে যায়। কিছুদিন পর আইরিনও চলে যায় ছেলের কাছে।

আশাহত ফ্লুয়ার ক'দিন এদিক ওদিক ঘুরে অগত্যা তার ভক্ত মাইকেল মণ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়।

ফরসাইট পরিবারের এককালের বিরাট মর্যাদা, প্রতাপ ও ঐশ্বর্য ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। এই পরিবারের শেষ বংশধর টিমোথী মহাকালের ইঙ্গিতে যবনিকার অন্তরালে চলে গেলে সোমস্-এর মনে হয়, ফরসাইট পরিবার সত্য সত্যই মিলিয়ে গেল। এখানে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের জীবন ছিল অন্তঃসারশূন্য। তবুও, আজ যেন চারিদিকে এক অনন্ত রিক্ততা। সোমস্ অনুভব করে সেও যেন বড় একা, ঠিক যেমন বুড়োরা জীবনের সব কিছু হারিয়ে অন্তরে অনুভব করে একটা বিরাট শূন্যতা।

শহর থেকে দূরে

রাশিয়ান সাহিত্যের দিক্‌পাল আইভান আলেক্সিভিচ্‌ বুনিন (Ivan Alexeyevich Bunin)-এর 'দি ভিলেজ' (The Village), ১৯১০, উপন্যাস অবলম্বনে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক ; রুশ দেশের কাহিনী—

টিখন এবং কুজমা দু' ভাই। পূর্বপুরুষদের নাম করে এদের গর্ব করার কিছু নেই। লোকে বলে, তাদের ঠাকুরদার বাপ দূরনভকা থেকে একদল নেকড়ের তাড়া খেয়ে এখানে ছিটকে এসে পড়েছিল ; ঠাকুরদা ছিল একজন কুখ্যাত চোর এবং লম্পট, আর এদের বাপ, খুদে ফিরিওয়ালাটি অতিরিক্ত মদ খেয়ে পিলে ফেটে অকালে মারা যায়।

বাপ মারা যাবার পর অসহায় ভাই দুটি সহরের কোন এক দোকানে অতি সামান্য বেতনে কেরানীর চাকুরি পায়। কিন্তু তাতে ওদের পেট চলা দায়। তাই, কিছুদিন পর ওরা দু'জন সেই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে স্বাধীন ব্যবসায়ে নেমে পড়ে।

দু'ভাই হ'ল ব্যবসার সমান অংশীদার। প্রথম প্রথম তাদের ব্যবসা ভালই চলল। কিন্তু ক'বছর বাদে একদিন লাভের ভাগ নিয়ে দু' ভাইয়ের ভিতর ভীষণ ঝগড়া হ'ল। ফলে, খুব তিক্ততার মধ্যে সে ব্যবসার ইতি হ'ল। দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদটা পাকাপাকি হয়ে গেল।

যৌথ ব্যবসা উঠে যাবার পর টিখন দূরনভকার অল্প দূরে ছোট্ট একটি পল্লীতে এসে আস্তানা নিল। সেখানে সে খুলে বসল দু'টি দোকান ; একটি মদের—আর একটি মনিহারীর। সেই সঙ্গে সে

কিনতে লাগল অতি সস্তা দরে জমি, যে সব জমির মালিক অভাবে পড়ে বা অন্য কোন কারণে তা বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছিল যে-কোন দামে। চল্লিশের কোঠায় পা দিয়ে টিখন হঠাৎ অর্থ এবং প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

টিখনের আর্থিক অবস্থা অবশ্য খুব সচ্ছল না থাকায় সে তখনও বিয়ে করেনি ; ঘর করছিল বোবা রাঁধুনীকে নিয়ে। অল্প দিনের মধ্যে সেই রাঁধুনীর কোলে টিখনের একটি অবৈধ ছেলে এল।

শিশুটি কি করে একদিন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়াতে, টিখন রাঁধুনীটিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর সে ঘর বাঁধল একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার ঝি-কে নিয়ে, যার কাছে সে ছেলে চেয়েছিল কিন্তু সে কামনা তার পূর্ণ হয়নি। ছেলে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অকালে জন্ম নেবার ফলে তাদের কেউ বাঁচেনি। এজন্য টিখন দায়ী করে সন্তানের মাকে, নিজেকে নয়।

ইতিমধ্যে দেশের সমস্ত মদের দোকানগুলি সরকার নিয়ে নেবার ফলে টিখন তার সাধের দোকানটি হারাল। বন্ধ হল তার রোজগারের সহজ পথটি।

শুধু কি এক অশান্তি ? ছেলে না হবার জন্য সে আজকাল মনে করে তার জীবনটাই বুঝি ব্যর্থ হ'ল।

ওদিকে আবার দেশে অনাবৃষ্টির ফলে ফসল হল যৎকিঞ্চিৎ। টিখন ভেবে পায় না সে কি করবে ? বর্ষা এলে অগত্যা সে ঘোড়ার ব্যবসা করবার জন্য বেরিয়ে যায়। কিন্তু তা করতে গিয়ে হঠাৎ তার ব্যক্তিগত জীবনটা উপলব্ধি করল নিতান্ত অর্থহীন, বিড়ম্বনাময়। সেই জীবনটাকে ভুলে থাকবার জন্য সে অতিরিক্ত মদ খেতে শুরু করে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

এর অল্প কিছুদিন পরেই জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগল। টিখনের

তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে চিন্তিত হল দেশে সমাজতন্ত্রীদের আসন্ন বিপ্লবের খবর শুনে। সে জানল যে যাদের জমির পরিমাণ হাজার একরের বেশী আছে, তাদের সেই সব জমি সরকার দখলে নিয়ে তা চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প। সর্বনাশ! খবর শুনে সে ঐ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে। কিন্তু যখন সে জানল, তার নিজের জমির চাষীরা দলবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, সেইদিন থেকে সে সেই আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তবুও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না; ছুটে গেল প্রজাদের কাছে। তারা তার কোন উক্তি শুনতে চায় না; তাকে অপমান করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। চাষীদের সেই আন্দোলন কিন্তু কোন কারণে সফল হল না। তাই তারা আবার টিখনের জমিতে কাজ করবার জন্য ফিরে এল। টিখন তাদেরকে আর বিশ্বাস করতে পারে না। সে মনে করে ওরা সব সুবিধাবাদীর দল, বিশ্বাসঘাতক পশুতুল্য।

রোড্কা একজন তরুণ চাষী। সেও টিখনের জমিতে মজুরের কাজ করে। রোড্কার স্ত্রী তরুণী, সে সুন্দরী; লোকে তাকে ব্রাইড্ বলে। ব্রাইড্ টিখনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে তার কামনা জাগায়। বেচারী বহুবার মালিকের অবাঞ্ছিত দৃষ্টি আর তার কুৎসিত ইঙ্গিত এড়িয়ে চলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে একদিন নিজের ইজ্জত আর বাঁচাতে পারল না। হাজার হোক প্রভুর কৃপাদৃষ্টি তো!

ব্রাইড্ টিখনের এই কদর্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে করল না কোন প্রতিবাদ, সে জানাল না কোন নালিশ। কে শুনবে তার কথা? সে নীরবে সহ্য করল, যেমন করে সে সহ্য করে তার নিষ্ঠুর স্বামীর নির্মম নির্যাতন।

স্বামীর কৃপায় তার সারা দেহে চাবুকের দগদগে দাগগুলি দেখে টিখন শিউরে উঠে। সে ষড়যন্ত্র করে মারাত্মক রোড্কাকে চিরতরে

সরিয়ে দেবার জন্য ; নতুবা তার শান্তি নেই। কিন্তু তার সে কষ্ট করবার আর প্রয়োজন হল না। স্বামীর ব্যবহারে অসহ্য হয়ে ব্রাইড্-ই তার মুস্কিল আসান করল। ব্রাইড্ তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল একদিন। কেউ সে কথা জানল না। শুধু টিখনের মনে একটু সন্দেহ জেগেছিল কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ পায়নি।

একদিন কেমন করে টিখনের হাতে আসে একটি কবিতার বই। বইটি পড়ে সে আনন্দ পেল। কবির নাম দেখে টিখন অবাক হয়। আশ্চর্য, এ যে তার ভাই কুজমার লেখা। সে ভাবে, এও কি সম্ভব!

আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে অভিনন্দন জানায়। তাদের বিগত বিবাদ ভুলে যাবার জন্য সে তাকে অনুরোধ করে। টিখন ভাইকে তার বাড়ীতে এসে থাকবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানায়।

ভাইয়ের সেই আহ্বানে কুজমা ছুটে এল। টিখন তাকে তার জমিদারি আর ব্যবসা দেখাশুনা করবার জন্য অনুরোধ করে।

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবার মত কুজমার কোন সঙ্গতি ছিল না, তাই সে ভাইয়ের এ প্রস্তাবে হাতে স্বর্গ পেল ; সে খুশী মনে তা গ্রহণ করল।

যৌথ ব্যবসা উঠে যাবার পর থেকে এ পর্যন্ত কুজমা উল্লেখযোগ্য কিছুই করেনি। ইতিমধ্যে সে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার মৃত্যু পর্যন্ত দশ বছর ঘর করেছে। কিছুদিন সে করেছে ঘোড়ার ব্যবসা, কখনও বা শস্যের আর কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে লিখেছে কিছু খবরের কাগজে। সাধ ছিল তার লেখক হবার কিন্তু তা সার্থক হয়নি। সারা জীবন শুধু ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র।

নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে সে লেখাপড়া শেখেনি কখনও ; কিছুদিন কোন এক মুচির সঙ্গে কাজ করবার সময় সে তার থেকে মৌখিক

কিছু পাঠ নিয়েছিল, কখনও বা কারুর থেকে বই ধার করে পড়বার চেষ্টা করেছে। তা তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। অবশ্য সেজন্য তার খেদ নেই, তার আসল দুঃখ হচ্ছে লেখক হতে না পারার জন্য।

বয়স বাড়বার সঙ্গে কুজমা উপলব্ধি করল, তার নিজের এবং রুশ দেশের সাধারণ লোকদের দুর্দশার জন্য দায়ী একমাত্র তাদের অ-শিক্ষা, ভাগ্য নয়। তার বিশ্বাস, উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। দেশের এই বর্বর লোকগুলি সেই শিক্ষা পেলে দেশ হত অনেক উন্নত, তখন থাকত না তাদের কোন দুঃখ, না কোন দুর্দশা।

ভাইয়ের জমিদারিতে এই সরকারের জীবনে কুজমা তুষ্ট নয়। যাদের নিয়ে তার কারবার চালাতে হয় সে লোকগুলি তার কাছে অসহ্য, ভাই টিখনও তাদেরই একজন। তার কাছে সব চেয়ে বিরক্তিকর হচ্ছে ঐ ব্রাইড্ মেয়েটি ; ভাই টিখনের নির্দেশে সে তাকে রান্না করে দেয়, তার ঘর-দোর গুছিয়ে দেয়, সে করে তার তত্ত্বাবধান। কিন্তু মেয়েটি যেন কুজমার চক্ষুশূল।

তবুও যেদিন সে জানল মেয়েটির ওপর কিছুদিন আগে কতগুলি বর্বর লোক একসঙ্গে পাশবিক অত্যাচার করেছিল, সেইদিন থেকে মেয়েটির প্রতি কুজমা কেমন সহানুভূতিশীল হয়, বোধ করে তার জন্য বেদনা। তার ধারণা—সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা মেয়েটি তখনও ভুলতে পারেনি এবং সেই দুঃস্বপ্ন ওকে নিয়ত পীড়া দেয়। হয়ত সেই স্মৃতিই ওকে করেছে দুঃখী।

একদিন সে কথা ভাইকে উল্লেখ করতে টিখন কুজমাকে ভুল বোঝে, তা নিয়ে সে তাকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না। টিখন ভাবে, বুঝিবা তার রক্ষিতার উপর ভাইয়ের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। ভাই হলেও সে তার আশ্রিত, তার বেতনভুক কর্মী মাত্র। মনিবের জিনিসের উপর ভৃত্যের নজর! এত বড় আস্পর্ধা! টিখন স্থির

করল, সে ব্রাইড্-কে বিয়ে করবে, নাই বা থাক তার কোন মর্যাদা। চাষীর মেয়ে রক্ষিতা ব্রাইড্ হতে চলে তার জমিদারের ঘরণী।

বিয়ের দিন টিখন বুঝতে পারল, যে ব্রাইড্-এর পক্ষে তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা একটি লোক দেখান ব্যাপার মাত্র; তাদের উভয়ের কেউ কোন দিন সুখী হবে না। সে জানে, তা হতে পারে না।

জ্যান্ত ভূত

ইতালিয়ান সাহিত্যিক লুইগি পিরানদেল্লো (Luigi Pirandello)-এর 'দি লেট মাত্তিয়া পাসকাল' (The Late Mattia Pascal), ১৯০৪, উপন্যাসের গল্পরূপ।

পাস্‌কাল অকালে মারা গেলেন, পিছনে রেখে গেলেন পরিবারের জন্য বিপুল সম্পত্তি আর সেই সম্পত্তি ও তাঁর ব্যবসা দেখাশুনা করবার জন্য সুদক্ষ, বিশ্বস্ত ম্যানেজার ; পরিবারের সে রক্ষকও বটে।

মাত্তিয়া ও রবার্তো দুই ভাই। পিতৃস্নেহ না পেলেও শৈশবকাল ওদের সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটে। ক্রমে ঐ সম্পত্তির ওপর ম্যানেজারের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। আস্তে আস্তে সে তা গ্রাস করতে শুরু করে।

শ্রীমতী পাসকাল একে বিধবা তায় অসহায়। তিনি ম্যানেজার মলগ্‌নার এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা টের পেয়েও তাই নীরব রইলেন। রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে বসে তখন মুখ বুজে মার খাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করবার থাকে ?

এদিকে খেলার ছলে ছেলে বয়সেই মাত্তিয়া সঙ্গিনী রমীলদার রূপে মুগ্ধ হয়ে কখন তাকে ভালবেসে ফেলে। ক্রমে সে ভালবাসা হয় গভীর ; ওরা উভয়ে উভয়কে অন্তরঙ্গ ভাবে ভালবাসে, অপেক্ষা করে সেই শুভ লগ্নটির জন্য। তখন কি আর ওরা জানত শৈশবের ভালবাসা কি অভিশপ্ত !

বিধবার সম্পত্তির দৌলতে ম্যানেজার মলগ্‌না এখন দস্তুরমত একজন বড় মানুষ। তার স্ত্রী একটি নয়, দুটি ; দু'জনেই স্বাস্থ্যবতী, যৌবনপুষ্ট। তবুও তার মনে শান্তি নেই। নেভে না মলগ্‌নার

কামনার আগুন, মেটে না তার লালসা। শুধু কি তাই? সে কামনা করেছিল একটি ছেলে। সে আশাও তার পূর্ণ হয়নি। মলগ্না ভেবে পায় না সন্তানহীন জীবনে এত সম্পত্তির মূল্য কতটুকু? তাই স্ত্রীদের প্রতি তার আকর্ষণ শিথিল হয়ে আসে।

এক সময় মলগ্নার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে সুন্দরী রমীলদার ওপর। সে জানত না রমীলদা তখন মা হতে চলেছে। অর্থলোভী রমীলদার মাকে মলগ্নার ঐশ্বর্য আকর্ষণ করে। সুবিধাবাদী ধূর্ত মা এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে না। মা ভাবে, মলগ্নার ঘাড় ভেঙ্গে, বিনা পরিশ্রমে কিছু অর্থ রোজগার করবার এই তো অপূর্ব সুযোগ; —হোক না তা পাপের পথ।

মা মেয়েকে উপদেশ দেয়,—রমীলদা, আমার কথা শোন: তোমার মত আমারও একদিন যৌবন ছিল, ছিল রূপ। জান, জীবনে শুধু প্রেম নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। চাই অর্থ, চাই প্রতিষ্ঠা; বুদ্ধিমতী মেয়েকে প্রয়োজনে একের বেশী প্রেমিককে বরণ করতে হয়, অন্ততঃ দ্বিতীয়টির বেলায় অভিনয়। তুমি আকর্ষণ করো মলগ্নাকে; ওকে বুঝতে দাও ও অক্ষম নয়, সে জানুক তোমার গর্ভের সন্তানের বাপ সে নিজে, অন্য কেউ নয়। তা হলেই মলগ্না খুশী মনে এগিয়ে আসবে ওর সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তোমার কাছে। তখন তুমি হবে রাজরাণী।

মায়ের প্ররোচনায় রমীলদা কামাতুর মলগ্নাকে কপট প্রেম নিবেদন করে। মলগ্না ডুব দেয় সেই প্রেমে। সে ভুলে যায় তার সংসার, পরিজনের কথা। দু'দিন বাদে রমীলদার ভাবী সন্তানের জন্মরহস্যের কথা প্রণয়িনীর কাছ থেকে শুনেও সে বিচলিত হয় না।

তা হোক্। তুমি কিন্তু আবার কাউকে সে কথা বলো না। লোকে জানুক তোমার গর্ভের সন্তানের বাপ আমি, মাত্তিয়া নয়।— মলগ্নার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

তাই হবে গো, তুমি কিছু ভেবো না। তুমি আমার পূর্ণিমার চাঁদ। কণ্ঠে মধু ঢেলে ছলনাময়ী জানায় মলগ্না‌কে।

প্রণয়িনীর আশ্বাসে খুশী মনে মলগ্না বাড়ী ফিরে যায়।

মলগ্নার এই পৌরুষের গর্ব তার বরাতে কিন্তু বেশী দিন সইল না। মাত্তিয়ার মুখে তার স্বামীর কু-কীর্তির কাহিনী শুনে মলগ্নার স্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। স্বামীর এ প্রবঞ্চনার প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে সে মাত্তিয়ার কাছে অকপটে আত্মদান করল। ক'দিন বাদেই তাদের সেই গোপন মিলনের স্বাক্ষর তার দেহে ফুটে ওঠে। স্ত্রী কপট খুশী মুখে টেনে এগিয়ে যায় স্বামীর কাছে—

জান, তোমার সন্তান আমার পেটে এসেছে ; কে বলে তুমি হীন-বীর্য, ক্লীব বা আমি বন্ধ্যা। লোকের মুখে ছাই পড়ুক, কি বল ?

স্ত্রীর উক্তি শুনে কর্তা চিন্তিত হয়। আসল রহস্য বুঝতে তার দেরী হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সে জ্বলে ওঠে, তার পর উন্মত্তের মত ছুটে সে বেরিয়ে যায়।

সে ভাবে, মাত্তিয়ার এত সাহস, এত বড় আস্পর্ধা! আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে সে খায় ; একবার নয়, দু'বার। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। তার আক্রোশ শুধু মাত্তিয়ার ওপর নয়, রমালদাও নিষ্কৃতি পেল না।

উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে চিৎকার করে রমীলদাকে বলে,—

রমীলদা, আমি স্বীকার করি না তোমার ঐ সন্তানের পিতৃত্ব। ভেবেছিলে, মাত্তিয়ার ঐ অবৈধ সন্তানকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে আমার ঐশ্বর্য তুমি ভোগ করবে। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাও। ছিঃ ছিঃ তুমি এত নীচ! মনে রেখো, ভবিষ্যতে আমি আর কোন দিন তোমার মুখ দেখতে চাই না।—এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মলগ্না আবার ছুটে চলে যায়।

সব শুনে মাত্তিয়া ভাবে, তাই বা মন্দ কি ?—চোরের ধন শেষ পর্যন্ত পিঁপড়েই খাবে। পৈতৃক সম্পত্তি তার নিজের ভোগে না

লাগুক অন্ততঃ শত্রুর স্ত্রীর গর্ভজাত তার সন্তান কিছু তো ভোগ করবে।

এবার রমীলদার সঙ্গে মাত্তিয়ার বিয়ের আর কোন বাধা রইল না। একদিন ওদের দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল; হল বটে কিন্তু সে বিয়ে সুখের হল না। ইতিমধ্যে ম্যানেজার মলগ্না চুপি চুপি তাদের সম্পত্তির সব রসটুকুই শুষে নিয়েছে—তাদের বসত বাড়ীটি পর্যন্ত।

বিয়ের পর তাই মা আর স্ত্রীকে নিয়ে মাত্তিয়া অনুপায় হয়ে সেই দজ্জাল শাশুড়ীর কুঁড়ে ঘরেই এসে আশ্রয় নেয়। ভাগ্যের এই বিড়ম্বনা মাত্তিয়াকে অবশ্য বেশীদিন সহ্য করতে হল না। কিছুদিন বাদে কোন একটি গ্রন্থাগারে তার একটি চাকুরি জুটে যায়; মাত্তিয়া একটু স্বস্তি পেল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে অর্থ আর কতটুকু?

কদিন বাদে ঘটল আর এক দুর্ঘটনা। হঠাৎ একই দিনে মাত্তয়ার মা আর তার ছেলেটি মারা গেল। তারা শান্তি পেল, পেল মুক্তি। অতি দুঃখে মাত্তিয়া হল পাথর, হল সে নির্বাক।

আরও কিছুদিন পরের কথা। আশাতীত ভাবে মাত্তিয়ার হাতে এল কয়েক সহস্র লিয়ার (ইতালীয় মুদ্রা)। বিয়ে করে ছোট ভাই রবার্তো বিপুল ঐশ্বর্য যৌতুক পেয়ে তা থেকে কিছু মাত্তিয়াকে পাঠিয়েছে। এই অর্থ হাতে পেয়ে মাত্তিয়া স্থির করল, সে বিদেশ ভ্রমণে বেরুবে।

একদিন সে সত্যি সত্যিই মণ্টেকার্লোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সেখানে জুয়া খেলে তার হাতে এল আরও অর্থ; তা থেকে সে হারল কিছু কিন্তু তবুও এল প্রচুর। ক্ষতির তুলনায় লাভ বিপুল।

একদিন একটি তরুণ জুয়াড়ী ছেলের অপমৃত্যু তার মনকে নাড়া দিল গভীর ভাবে। মাত্তিয়া ভাবে, না আর এখানে নয়। সে স্থির করল, বিরাশী হাজার লিয়ার নিয়ে এবার সে বাড়ী ফিরবে।

কিন্তু রাস্তায় খবরের কাগজের শিরোনামা দেখে তার চক্ষুস্থির হয়, হয় সে বিমূঢ়।

আত্মীয়রা তার শুধু মৃত্যুসংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, তাকে কবর দেওয়ার খবরটিও বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছে। মাত্তিয়া ভাবে, সর্বনাশ। এ কি করে সম্ভব হল, সে ভেবে পায় না। বিমূঢ় মাত্তিয়া স্থির করতে পারে না তার কর্তব্য।

খানিক বাদে মাত্তিয়া উপলব্ধি করে, তার আত্মীয়েরা পরোক্ষে হয়ত তার উপকারই করেছে। এই মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ এনে দিয়েছে তাকে মুক্তি—অসুখী বিবাহ-জীবন থেকে মুক্তি, আর মুক্তি সেই পর্বত প্রমাণ ঋণ থেকে। সে ভাবে, হোক না মাত্তিয়া পাসকালের নামের মৃত্যু। তার সঙ্গে এখন আছে প্রচুর অর্থ তাই দিয়ে সে স্বাধীনভাবে ভোগ করবে আরও অনেক বছর। সে বন্ধনহীন, রইল না তার কোন গ্রন্থির বালাই।

নিজের গাঁয়ে ফিরবার আর তার প্রবৃত্তি হল না। সে তার দাড়ি গোঁফ সব সাফ করে, চুল ছাঁটল ছোট করে তারপর টেরা চোখে রঙ্গীন চশমা চাপিয়ে চলে এল রমণীয় রোম নগরীতে। সেখানে এসে সে তার নাম ভাঁড়াল; পরিচিত হল আন্দ্রিয়ানো মেইজ বলে। সে আস্তানা নিল সহরের এক কোণে, কোন এক গৃহস্থের ভাঁড়ার ঘরে, নির্জন নিরালায়।

মেইজ খায় দায়, সে আপন মনে ঘোরে কখনও বা বই পড়ে সময় কাটায়। সে নিঃসঙ্গ।

ক'দিন বাদেই সে-জীবন তার অসহ্য হয়ে উঠল। পরিচয়হীন জীবনের অনেক জ্বালা। কর্মহীন জীবনের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। কিছু কাজ করতে গেলেই পরিচয়ের প্রয়োজন, এমন কি একটি কুকুর কিনতে গিয়েও তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। সেখানেও সেই পরিচয়ের প্রশ্ন। সর্বনাশ, পরিচয় দিতে হাঁ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে হবে জেলে

বন্দী, স্ত্রীকে ত্যাগ করবার অপরাধে, পাওনাদারদের ফাঁকি দেবার দায়ে।

আত্মগোপনের যন্ত্রণা কি এক? কোন ফাঁকে বাড়ীওয়ালীর মেয়েটিকে সে ভালবেসে ফেলেছে। মনের মানুষের কাছেও প্রবঞ্চনা! প্রেয়সী আড্রিয়ানাকেও মুখ ফুটে কিছু বলতে সে ভরসা পায় না।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয় আর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইতিমধ্যে তার বারো হাজার লিয়ার একদিন চুরি হয়। সকলেই জানে কুকীর্তিটি বাড়ীওয়ালীর জামাই করেছে, মেইজেরও সে কথা অজানা নয়। তবুও সে নীরব। এ নিয়ে সে কোন হৈ চৈ করতে চায় না। পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা মেইজের পক্ষে ব্যক্তিগত কারণে সম্ভব নয়।

তার এই অহেতুক উদাসীনতা সকলকে এমন কি তার দয়িতাকেও সন্দিগ্ধ করে তুলল। মেইজ অসহায় বোধ করে। এ জীবন তার কাছে অসহ্য; সে চায় মুক্তি।

যা কিছু সম্বল ছিল, পকেটে পুরে সন্ধ্যাবেলায় সে বেরিয়ে যায় রোমের রাজপথে। সুবিস্তৃত পথ, চারিদিকে সম্ভোগের ইশারা, হাত বাড়িয়ে গ্রহণের অপেক্ষা মাত্র। সে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে যায়। বুঝিবা কেউ তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

না সে আর ভাবতে পারে না। ভাবতে গেলে তার দম আটকে আসে। সে আর চলতে পারে না, জীবন সত্যিই দুঃসহ। পথে চলতে আত্মহত্যার ভিতর দিয়ে সে মুক্তির ইঙ্গিত পায়।

মাত্তিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সেই অসহ্য জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়। সে প্রস্তুত। শুধু লাফ দেবার অপেক্ষা মাত্র—এক সেকেণ্ডের ব্যাপার। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে যায়।

সে ঠিক করল: আড্রিয়ানো মেইজ-এর মৃত্যু হোক্, বেঁচে উঠুক পাসকালের সত্তা।

নদীর পারে সে তার টুপি ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে তার স্বাক্ষর রেখে চলে এল সেখান থেকে। দু'দিন বাদে কাগজে খবর বেরোল,—

হতভাগ্য আদ্রিয়ানো মেইজ রাতের অন্ধকারে নদীতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

এবার একমাত্র তার টেরা চোখটিকে ভরসা করে সেই রাতের অন্ধকারে মাত্তিয়া রোম ছেড়ে গিয়ে হাজির হল অনুজ রবার্তোর কাছে। ভাই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। মাত্তিয়া প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেয়। সে মুক্তির আস্বাদ পায়।

কঠিন হলেও তা সত্যি। ভাইয়ের মুখে সে জানল,—কাগজে তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ হবার কিছুদিন পর তার স্ত্রী রমীলদা আবার বিয়ে করেছে—তার শৈশবের এক প্রেমাস্পদকে। তারপর রমীলদার কোলে একটি ছেলেও এসেছে। কিন্তু দেশের প্রথা অনুযায়ী সে এখন দেশে ফিরে গেলে রমীলদার এ বিয়ে গ্রাহ্য হবে না ; মাত্তিয়াকে গ্রহণ করতে হবে শুধু রমীলদাকে নয় তার শিশু-পুত্রটিকেও, সেই সঙ্গে দজ্জাল শাশুড়ীটিকে পর্যন্ত !

খবর শুনে মাত্তিয়া মাথায় হাত দিয়ে বসে। কিন্তু কোন উপায় নেই। বাঁচতে হলে তাকে দেশের অনুশাসন মেনে নিতে হবে।

তথাস্তু।

মাত্তিয়া ক্ষুণ্ণ মনে নিজের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হল। সেখানে পৌঁছে দেখল, রমীলদার সুখের সংসার। মাত্তিয়ার মন চাইল না রমীলদার সেই সুখের নীড়ে হাত বাড়াতে।

দু'তরফে আপোষে স্থির হল, ওরা যেমন আছে তেমনি থাকবে। মাত্তিয়ার থাকবে না স্ত্রীর ওপর কোন অধিকার, সে জানাবে না স্বামীর দাবী।

গাঁয়ের এক নির্জন প্রান্তে মাত্তিয়া আশ্রয় নিল ; নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবস্থা। সেখানে তার সময় কাটে পড়াশুনা আর তার দুঃসাহসিক জীবন-কাহিনী লেখা নিয়ে, যে কাহিনী প্রকাশিত হবে তার তৃতীয় বা শেষ মৃত্যুর পরে।

অ্যানা ক্রিস্টি

আমেরিকান নাট্যকার ইউজিন ও'নীল (Eugene O'Neill)-এর 'অ্যানা ক্রিস্টি' (Anna Christie), ১৯২১, নাটকের কাহিনী।

সমুদ্র তো নয়, যেন দারুণ দুর্দৈবের প্রতিমূর্তি। তবুও সেই সমুদ্রের প্রতি ক্রীস্ ক্রীস্টোপারসন দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে।

আজ তার বয়স হয়েছে, সে দিনও নেই। এখন সে সাধারণ একটি কয়লাবাহী বজরার কাপ্তেন কিন্তু যৌবনে একজন সুদক্ষ নাবিক বলে একদিন তার সুনাম ছিল। তখন বছরের পর বছর সে ঘুরেছে সব বিখ্যাত জাহাজে, দেখেছে সে পৃথিবীর সব বিখ্যাত সহর আর বন্দর।

সমুদ্রের প্রতি তার এই আকর্ষণ জন্মগত। ভারত মহাসাগরের বুকে কোন এক জাহাজে তার পিতা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন; এই সমুদ্রের কোলেই অকালে মুক্তি পেয়েছিল তার আর দু'জন ভাই।

সমুদ্রের অভিশাপ শুধু পরিবারের পুরুষদের ভিতর সীমিত ছিল না। স্বামীর মৃত্যু সংবাদের প্রচণ্ড আঘাত ক্রীস-এর মা সইতে পারেন নি; সে খবর শোনা মাত্র তিনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান। তার স্ত্রী নিঃসঙ্গ জীবনের ভার সইতে না পেরে স্বামীর গৃহ ছেড়ে তাদের একমাত্র শিশু অ্যানাকে নিয়ে চলে গেছল সুদূর ম্যানিসোটায় তার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সান্নিধ্যে। সেখানে গিয়েও মহিলাটি কিন্তু শান্তি পায় নি। তবে ক'দিন বাদে মৃত্যু তাকে দিয়েছিল শান্তি। সে পেয়েছিল সেই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি। পিছনে পড়ে থাকে অনাথ শিশু—অ্যানা, সে আত্মীয়দের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে।

অ্যানার সে জীবনের গতি সহজ ছিল না। তার দিন কাটছিল

নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। ফলে তার স্বভাবে লাগে রুক্ষ প্রকৃতির ছোঁয়াচ, চাল চলনে ফুটে ওঠে উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্রীস্ জাহাজ ছেড়ে নিউ ইয়র্কের কোন একটি সৌখিন মদের দোকানে এসে বসেছে; পরিপূর্ণ পাত্রটি সামনে রেখে সবে মজলিসে জমে উঠেছে, সেই সময় সে অপ্রত্যাশিত ভাবে খবর পেল,—তার মেয়ে অ্যানা তার সঙ্গে মিলিত হবার আশায় যাত্রা করেছে, দু'একদিনের মধ্যেই সে এসে পৌঁছুবে।

দীর্ঘ বিশ বছর পর মেয়ের সঙ্গে দেখা। বাপের আনন্দ হবার কথা। কিন্তু খবর শুনে ক্রীস্-এর মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মেয়ে তার জাহাজী জীবনকে কেমন ভাবে গ্রহণ করবে বাপ সেকথা ভাবে না; সেইখানে তার বহুদিনের পুরানো রক্ষিতার উপস্থিতিই তখন ক্রীস্-এর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সে চিন্তাই তাকে পীড়া দেয়। ক্রীস্ ভাবে, একমাত্র সহজ সমাধান—অ্যানা পৌঁছবার আগে রক্ষিতাকে তাড়িয়ে দেওয়া।

কিন্তু যাকে নিয়ে এতদিন সে ঘর করেছে, বিনা অপরাধে স্বার্থপরের মত তাকে অমন নিষ্ঠুর ভাবে তাড়িয়ে দিতেও ক্রীস্-এর মন সায় দেয় না। রক্ষিতা হলেও ম্যারথী হৃদয়হীনা ছিল না। ক্রীসের অসহায় অবস্থা বুঝে ম্যারথী নিজেই সেখান থেকে দূরে সরে যেতে স্থির করে। যাবার আগে দেখে যায় অ্যানাকে। কিন্তু সে ক্রীস্-এর কল্পনার অ্যানার সঙ্গে এ মেয়েটির মধ্যে কোন মিল খুঁজে পায় না। মেয়েটির বেশবাস এবং চালচলনের মধ্যে তার নিজের মত বার-বিলাসিনীর সাদৃশ্য দেখে চমকে ওঠে।

স্নেহাতুর বাপ তখনও রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর। সে তার মেয়েকে শিশুর মত নিষ্পাপ বলেই মনে করে। এমন কি তাদের এই মিলনের উৎসবে মেয়ের সামনে সে মদ স্পর্শ করতেও দ্বিধা বোধ করে।

অ্যানা এই সামুদ্রিক জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। সে চেষ্টা করে সমুদ্রকে ভালবাসতে, তার সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে। সেই সঙ্গে সে সমুদ্রের অভিশাপকেও মেনে নেয় তার বাপের-ই মতো।

সমুদ্রের শান্ত পরিবেশ আর বাপের স্নেহকোমল স্পর্শে অ্যানা নতুন জীবনের স্বাদ পায়। সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে তার বিগত জীবনের রুক্ষ স্বভাব ক্রমে কোমল হয়ে আসে। অ্যানা ভাবে, তবে বুঝি দুনিয়াটা অত খারাপ নয়। সে লোককে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করে। দুনিয়ার প্রতি তার এতদিনের বিতৃষ্ণা ধীরে ধীরে কমে যায়।

সেদিন রাত্রে জাহাজটি বন্দর থেকে একটু দূরে নঙ্গর করা ছিল। গভীর রাত্রি, চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ ক্রীস্-এর কানে ভেসে এল, —'বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও...'

মাঝ দরিয়া থেকে ক'জন লোকের এই আর্তনাদ শুনে ক্যাবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ক্রীস্ দেখতে পেলো ছোট্ট একটি ডিঙ্গিতে চারজন লোক ভেসে আসছে তার বজরার দিকে। সে তাদেরকে টেনে তুলল তার বজরায়। ক্রীস্ জানল, শরণার্থীরা তারই মত জাহাজী—তাদের জাহাজ ডুবির পর এই ভাবে তারা চার পাঁচ দিন ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

ওদের ভিতর ম্যাট বার্ক ছিল আইরিশ। এই বলিষ্ঠ লোকটি ছিল অদ্ভুত ধরণের। অ্যানাকে দেখে সে ভুলে গেল তার বিপর্যয়ের কথা, ভুলে গেল তার পেটের অসহ্য ক্ষুধা। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে সুন্দরী অ্যানার দিকে। তারপর এক সময় অ্যানার প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণের কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেও সে দ্বিধা করে না। বলে,—

ক্রীস্, আমাদের বিপদে তোমার এই সাহায্যের জন্য তোমাকে

ধন্যবাদ। কিন্তু অ্যানাকে আমার চাই-ই,—দৃঢ়কণ্ঠে ম্যাট বার্ক জানায়।

তার প্রস্তাব শুনে বৃদ্ধ ক্রীস্ চমকে ওঠে।

ম্যাট বার্কের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল ক্রীস্-এর কাছে বিরক্তিকর। তার চেয়ে বড় কথা সে ছিল কোন এক জাহাজের খালাসি—তার কাজ ছিল ইঞ্জিনে কয়লা দেওয়া, যে বৃত্তিকে নাবিক ক্রীস্ মন থেকে ঘৃণা করত। তা ছাড়া সে জানত, সমুদ্রের অভিশাপ এর পিছু পিছু নিয়ত ঘুরছে। সবচেয়ে সর্বনাশের কথা, সে তার প্রাণপ্রতিম অ্যানাকে তার থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। অ্যানাবিহীন জীবন ক্রীস্ এখন ভাবতে পারে না।

আশ্চর্য, অ্যানা কিন্তু ম্যাট বার্ক-কে আদর্শ পুরুষ বলেই মনে মনে গ্রহণ করে বসেছে। সে মনে করে, বার্ক তার যোগ্য প্রেমিক। একে পেলে তার জীবন হবে মধুময়।

এদিকে অ্যানার বাপ আর তার প্রেমিক বার্ক গোড়া থেকেই পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বলে মনে করলেও বাইরে কারুর কোন প্রকাশ ছিল না। তাদের বিবাদ শুধু আদর্শের নয়, স্বার্থেরও বটে।

কিন্তু সেই চাপা আক্রোশ একদিন প্রকাশ্যে মারাত্মক রূপ নিল। জাহাজের ক্যাবিনে বার্কের ঠাট্টা বিদ্রূপে ক্ষেপে গিয়ে ক্রীস্ অতর্কিতে একটি ছুরি নিয়ে তাকে আক্রমণ করল। বৃদ্ধ জোয়ানের সঙ্গে শক্তিতে পারবে কেন? বার্ক বৃদ্ধকে পাল্টা আক্রমণ করল। ভাগ্যি, ঠিক সেই সময় অ্যানা ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছিল তাই কেলেঙ্কারিটা আর হল না। বৃদ্ধ ক্রীস্ সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেল।

এই ঘটনার পর অ্যানা উপলব্ধি করল, তাদের এই পরস্পর পরস্পরের প্রতি আক্রোশ ব্যক্তিগত নয়, আসলে তাকে কেন্দ্র করে।

অ্যানা ভাবে, সে যেন তাদের কাছে এক স্থূল সম্পত্তি বিশেষ—দু'জনেই তা পুরোপুরি ভাবে অধিকার করতে চায়। তাদের কেউ সহ্য করতে চায় না দ্বিতীয় কোন অংশীদারকে।

এ অভিজ্ঞতা অ্যানার নতুন নয়। পুরুষদের এই একঘেয়ে বিরক্তিকর স্বভাবের কথা সে জানে। তাই সে ওদের দুজনের সামনেই ওর বিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলে যায়,—

শোন বাবা, তোমার কল্পিত অ্যানার সঙ্গে বাস্তবের এই অ্যানার সঙ্গে যদি কোন মিল থাকত আমি খুশী হতাম। তুমি মিছামিছি আমাকে অত নিরীহ মনে করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। আসলে তুমি জান না,—আমি আর সেই কচি খুকীটি নেই; জীবনে রোমান্সের স্বাদ অনেক আগেই পেয়েছি, পেয়েছি তা ষোল বছর বয়সেই, তোমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বা আমার দাদার থেকে। সেই আত্মীয়ের আওতা থেকে দূরে সরে গিয়েও পুরুষের বিকৃত লালসার গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি নি। জেনে রেখো, স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় বহুবার বহুক্ষেত্রে আমার এ দেহ কলুষিত হয়েছে। কিন্তু বার্কের সান্নিধ্যে আসার আগে পর্যন্ত জীবনে আমি ভালবাসার স্বাদ কোনদিন পাই নি···

কিন্তু অ্যানার প্রেমের গুরুত্ব বা গভীরতা উপলব্ধি করবার মত বার্কের বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল না। তাই সে অ্যানাকে ভুল বুঝে তাকে গালমন্দ করে সেই বজরা থেকে একদিন ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়। খানিক বাদে ক্রীস্ও সেই ভাবে বজরা থেকে চলে গেল। অ্যানা হতবাক্।

বিমূঢ় অ্যানা ভেবে পায় না—ওরা দুজনে ওভাবে কেন চলে গেল? দুদিন কেটে গেল ওরা দুজন বজরা ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। অথচ এ ভাবে অ্যানার পক্ষে একাকী বজরায় থাকাও চলে না। সে মনে মনে স্থির করে আবার সে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবে।

ঠিক এমনি সময় দেখা গেল তার বাবা বজরার দিকে এগিয়ে আসছে।

এগিয়ে এসে মেয়েকে জানায়,—

যাক্ ভালই হল। অ্যানা, তোমাকে আর বজরার গ্লানিকর জীবন সইতে হবে না। শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে, এই বয়সে, আমি আফ্রিকাগামী একটি জাহাজে কাজ নিলাম। এইমাত্র বণ্ডে সই করে আসছি। আমার বেতনের মোটা অংশ ওরা তোমার নামে পাঠিয়ে দেবে। আশা করি এবার থেকে তোমার আর কষ্ট হবে না। এই ব্যবস্থা করে তোমাকে জানাতে ফিরে এলাম।

খানিক বাদে বার্ককেও বজরার দিকে আসতে দেখে অ্যানা মনে মনে প্রমাদ গোণে। সে ভয়ে ভয়ে ভাবে, বুঝিবা বার্ক প্রতিহিংসা নিতেই আসছে। কাছে আসতে বার্কের দেহের কোথাও কোথাও আঘাতের চিহ্ন দেখে তার সেই সন্দেহ দৃঢ় হয়।

কিন্তু এবার অ্যানার অবাক হবার পালা। বার্কও তার বাবার মত একই সু-সংবাদ নিয়ে এসেছে অ্যানার জন্য। অদৃষ্টের পরিহাস। তারা পরস্পর না জানলেও—এখন প্রকাশ পেল, তারা দু'জনে সেই একই জাহাজে কাজ নিয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও এক—অ্যানা!

অ্যানা ভাবে, এও কি সম্ভব!

ম্যাট বার্ক কিন্তু এবার উপলব্ধি করল, যারা অ্যানাকে জোর করে বাঁধতে চায়, অ্যানা তাদের ঘৃণা করে। সে চায় না কোন ক্ষমতার বন্ধন, সে চায় শুধু একক প্রেমের আশ্বাস।

ওদের দুজনের মধুর মিলন দেখে ক্রীস্ এবার সত্যিই খুশী হয়। তার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নামে। অ্যানার বিগত লাঞ্ছিত জীবনের কথা মনে হতে ক্রীস্-এর মন ব্যথায় ভরে ওঠে। মেয়ের সেই অবাঞ্ছিত জীবনের জন্য সে নিজেকে আজ অপরাধী বলে মনে করে।

ক্রীস্ মনে মনে ওদের বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্যে শুভ কামনা করে। সে প্রার্থনা জানায়—'হে ঈশ্বর, সমুদ্রের অভিশাপ থেকে তুমি ওদের মুক্ত করে দাও'!

'থিবো' কাহিনী

ফরাসী লেখক রোজার মার্টিন হুগার (Roger Martin du Gard)-এর 'দি ওয়ার্ল্ড অব দি থিবো' (The World of the Thiboults), ১৯৩৯-৪১, উপন্যাসমালার সংক্ষিপ্তসার।

প্যারী সহরে থিবো পরিবারটি ছিল অবস্থাপন্ন বুর্জোয়া শ্রেণীর। পরিবারের কর্তা এম্ থিবো ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। সমাজ উন্নয়নের নানা কাজ নিয়ে তিনি সব সময় ব্যস্ত ; নিজের সংসারের দিকে তাকাবার তাঁর অবকাশ হয় না।

থিবোর ছোট ছেলে জ্যাকস-এর বয়স তখন চৌদ্দও হয় নি। একদিন জ্যাকস তার সহপাঠী-বন্ধু ড্যানিয়েল-এর সঙ্গে কোথায় পালিয়ে গেল। অতটুকু ছেলের আস্পর্ধা দেখে পিতা অবাক হন। তিনি চটে গেলেন।

গৃহশিক্ষকটি আবার ইন্ধন যোগালেন। তিনি থিবোকে জানালেন, জ্যাকস-এর ডায়েরী থেকে তাঁর মনে হয়—ওদের হু'জনের এই বন্ধুত্ব মোটেই স্বাভাবিক নয়, হীন ; তার ওপর ড্যানিয়েল ভিন্নধর্মী, ওরা প্রটেসটেণ্ট। সন্দেহ কি, জ্যাকস সঙ্গদোষে উচ্ছন্নের পথে পা বাড়িয়েছে।

শিক্ষকের উক্তিতে যেন ঘি পড়ে আগুনে। তার উত্তাপে থিবো জ্বলে ওঠেন।

সব শুনে থিবোর বড় ছেলে অ্যানটোনিও চিন্তিত হন। তিনি ভেবে পান না তাঁর কর্তব্য। অগত্যা তিনি ড্যানিয়েল-এর মা শ্রীমতী ফনটেনিন-এর সঙ্গে দেখা করতে স্থির করেন—যদি তাঁর থেকে এই সমস্যার সমাধানের কোন ইঙ্গিত পান।

শ্রীমতী ফনটেনিন-এর বুদ্ধির দীপ্তি এবং রূপের মাধুর্যে অ্যানটোনিও মুগ্ধ হন। ক্ষণিকের জন্য বুঝিবা তিনি আনমনাও হয়ে পড়েন। একসময় তিনি একটু ইতস্ততঃ করে শ্রীমতীকে প্রশ্ন করেন তার ছেলে ড্যানিয়েলের চরিত্র সম্বন্ধে। তিনি জানতে চাইলেন, কিশোর বন্ধু-দু'টির ওরকম ভাবে পালিয়ে যাবার কারণ। কোন ফল হয় না। অ্যানটোনিও এবার ছেলে দু'টির অস্বাভাবিক বন্ধুত্বের ইঙ্গিত করতে শ্রীমতী সেকথা হেসে উড়িয়ে দেন।

অসহায় অ্যানটোনিও শুনতে চাইলেন শ্রীমতীর ব্যক্তিগত মতামত, প্রার্থনা করলেন এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ। কিন্তু তা' শুনে অ্যানটোনিও-র মন ভরে না। তিনি ভাবেন, কি জানি হয়ত ড্যানিয়েলের ছোটবোন জেনী তাঁকে সাহায্য করতে পারে। তাই তিনি অগত্যা জেনীর সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য শ্রীমতী ফনটেনিনকে অনুরোধ করলেন।

খবর পেয়ে জেনী ধীর পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। ডাক্তার অ্যানটোনিও-র দৃষ্টি জেনীর ওপর পড়তে তাঁর মনে হল যেন মেয়েটি অসুস্থ। মেয়েটি আরও কাছে এগিয়ে আসতে ডাক্তার চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে তিনি জেনীকে পরীক্ষা করে গম্ভীর হন। তিনি শ্রীমতী ফনটেনিনকে জানালেন জেনীকে মেনিন্‌জাইটিস্ রোগে আক্রমণ করেছে।

মেয়ের সর্বনাশা রোগের কথা শুনে মা আঁতকে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারিক চিকিৎসককে ডাকা হ'ল। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে তিনি সঙ্গে আরও দু'জন চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলেন। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

অগত্যা শ্রীমতী ফনটেনিন মেয়ের চিকিৎসার জন্য যাজকের শরণাপন্ন হলেন। স্থানীয় যাজকের দেওয়া কি এক ওষধির গুণে সত্যি-সত্যিই জেনী ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে।

এদিকে জ্যাকস এবং ড্যানিয়েল ঘুরতে ঘুরতে সুদূর মারসীলিস অঞ্চলে এসে হাজির হল। দু' বন্ধুর ভেতর বয়সে জ্যাকস ছোট হলেও

এই দুঃসাহসিক সফরের গোড়া থেকে সব ব্যাপারে সেই ছিল অগ্রণী, বেশী উৎসাহী।

তাদের পারিবারিক মিথ্যা আভিজাত্য-বোধ, বিরক্তিকর নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়াজাল সেইসঙ্গে তার পিতার উন্নাসিক মনোভাব জ্যাকস-এর কিশোর জীবনে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সেই পরিবেশ জাগিয়েছিল তার মনে বিদ্রোহ। তাই অন্তরঙ্গ বন্ধু ড্যানিয়েলকে নিয়ে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল মুক্ত পরিবেশে—প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেবার আশায়।

খেয়াল খুশীর মধ্য দিয়ে দুই বন্ধুর দিনগুলি ভালই কাটছিল। কিন্তু সে-সুখ ওদের বরাতে বেশীদিন সইল না।

অনেক চেষ্টার পর চতুর পুলিশ একদিন দুই পলাতক বন্ধুকে ধরে ফেলে তাদের পরস্পরের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে এলে ড্যানিয়েলকে তার মা-বাবা দু'জনেই যথেষ্ট তিরস্কার করলেন। কিন্তু তার স্নেহশীল মা ছেলের অপরাধ ক্ষমা করতে কুণ্ঠিত হলেন না। ড্যানিয়েল ফিরে পেল তার পুরানো স্বাভাবিক জীবন।

বন্ধুর তুলনায় জ্যাকস-এর বরাত খারাপ। বেচারী শৈশব থেকেই মাতৃস্নেহ থেকে ছিল বঞ্চিত। আর পিতা থিবো তাঁর আভিজাত্য এবং সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। ছেলের মনের কথা ভাববার তাঁর সময় কোথায়? পিতার কঠিন অনুশাসনের মধ্যে জ্যাকস-এর জীবনের গতি ছিল সীমিত।

জ্যাকস বাড়ি ফিরে এলে তার পিতা সহজভাবে ছেলেকে গ্রহণ করতে পারলেন না। জ্যাকস বাড়িতে স্থান পেল না। বিভ্রান্ত ছেলের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে থিবো কড়া পাহারায় বন্দী করলেন জ্যাকসকে।

প্রহরীদের নিষ্ঠুর ব্যবহার আর সেই নিঃসঙ্গ বন্দী জীবনের জ্বালায় প্রাণবন্ত জ্যাকস দু'দিনেই কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে।

ছোট ভাইয়ের দুর্দশা দেখে অ্যানটোনিওর মন ব্যথায় ভরে ওঠে। কৌশলে তিনি একদিন জ্যাকসকে সেই দুঃসহ বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করে আনেন। সেদিন থেকে অনুজের সব দায়িত্ব গ্রহণ করতেও অগ্রজ দ্বিধা করলেন না। পিতার আওতা থেকে দু'ভাই দূরে সরে গেল ; বাড়ি ছেড়ে তারা কোন এক ফ্লাট-বাড়িতে আশ্রয় নিল।

অগ্রজের স্নেহ ভালবাসা আর যত্নে জ্যাকস-এর দেহমন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। তার জীবন আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। জ্যাকস ফিরে পায় তার স্বাভাবিক জীবন, পুরানো বন্ধুত্বও। আবার শুরু হয় তার লেখাপড়া।

কিছুদিন পরের কথা। ড্যানিয়েলের পিতা দ্য ফনটেনিন হঠাৎ একদিন তাঁর বিবাহিতা বোনঝি নেমিকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যায়।

শ্রীমতী নেমি চলে গেলে পিছনে পড়ে থাকে তার মেয়ে নিকোলি। মা ওরকম ভাবে চলে যাবার পর অনূঢ়া নিকোলি তার মামী শ্রীমতী ফনটেনিন-এর বাড়িতে চলে এল আশ্রয়ের জন্য।

নিকোলি তরুণী, সুন্দরী ; স্বভাবটাও তার মিষ্টি। কিন্তু তার রূপ হল অভিশাপ। ঐ রূপ ডেকে আনল আর এক বিপদ, নতুন অশান্তি।

ড্যানিয়েল তখন যৌবনে পা দিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত ড্যানিয়েলের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে শ্রীমতী নিকোলির ওপর। ড্যানিয়েল তার কাছে অশোভন প্রস্তাব করতেও দ্বিধা করে না।

তার প্রস্তাব শুনে তরুণী নিকোলির দেহমনে শিহরণ জাগে বৈকি। সে মাঝে মাঝে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মা'র কলঙ্ক আর তাঁর অশান্ত জীবনের স্মৃতি নিকোলির সব শিহরণ আর কৌতূহল নির্মমভাবে দলিত করে দেয়। সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

নিকোলি ড্যানিয়েলের ছায়া এড়িয়ে চলে প্রাণপণে। ড্যানিয়েল হতাশ হয়।

এল গ্রীষ্মকাল। সব স্কুল বন্ধ। এই ছুটির অবকাশে তার বন্ধু ড্যানিয়েলের বাড়িতে জ্যাকস-এর যাতায়াতটা বেড়ে যায়। যেতে আসতে বন্ধুর বোন জেনীর প্রতি জ্যাকস ক্রমে গভীর আকর্ষণ বোধ করে।

জেনী এখন বড় হয়েছে। সে অবুঝ নয়। জ্যাকস-এর সাহচর্য তার মন্দ লাগে না। কিন্তু তার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হতে জেনীর মন শঙ্কিত হয়। তাই জ্যাকস-এর সঙ্গে সে একটা দূরত্ব রেখে মেলামেশা করে। জেনী জ্যাকস-এর সঙ্গে মেলামেশা করে সতর্ক হয়ে, বিপদ এড়িয়ে।

তবুও সেই মেলামেশার ফলে ক্রমে ওরা পরস্পর গভীর ভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। জেনী তার সব সঙ্কোচ আর দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়। এখন জ্যাকস-এর সঙ্গে গোপনে মিলনের জন্য জেনী শুধু সুযোগের অপেক্ষা করে।

এমনি সময় জ্যাকস একদিন আবার কোথায় উধাও হয়ে যায়। কেউ তার সন্ধান জানে না, প্রণয়িনী জেনীও না। জ্যাকস-এর এই আচরণে জেনী অবাক হয়, সে হয় মর্মাহত।

তিন বছর কেটে গেল। তবুও জ্যাকস-এর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বৃদ্ধ পিতা থিবো ধরে নিয়েছেন, তাঁর ছোট ছেলেটি আর বেঁচে নেই।

শ্রীমতী গাসে এই থিবো পরিবারেই প্রতিপালিত। সেও পরিবারের একজন। গীসে জ্যাকস-এর সমবয়সী, তার অন্তরঙ্গ। জ্যাকস ওরকম ভাবে চলে যাওয়াতে গীসের মনেও শান্তি নেই। কিন্তু তার বিশ্বাস, জ্যাকস বেঁচে আছে।

ইংলণ্ড থেকে গীসের নামে হঠাৎ একদিন এক বাক্স গোলাপের কুঁড়ির পার্সেল এল। গীসে লক্ষ্য করল গোলাপগুলি ঠিক সেই রকম, —জ্যাকস চলে যাবার ক'দিন আগে তার গায়ে গীসে যে-রকম গোলাপ সেদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল।

এই গোলাপের উপহার পেয়ে শ্রীমতী গীসের ধারণা দৃঢ় হল: জ্যাকস নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের কোথাও আছে। ক'দিন বাদে পড়াশুনার নাম করে গীসে ইংলণ্ডে চলে যায় জ্যাকস-এর সঙ্গে মিলিত হবার আশায়।

অনুজ চলে যাওয়াতে অ্যানটোনিওর মনে কম আঘাত লাগে নি। ফলে, তাঁর জীবনের গতিটাই পাল্টে যায়। তিনি এখন শূন্য মনে ঘুরে বেড়ান।

একদিন অ্যানটোনিওর হাতে এল একটি সুইডিস সাময়িক পত্রিকা। পত্রিকার 'ছোটবোন' শীর্ষক নিবন্ধটির ওপর তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি পড়ে দেখেন থিবো এবং ফনটেনিন পরিবার দু'টির ছবি তাতে সুন্দর ফুটে উঠেছে। অ্যানটোনিও লক্ষ্য করলেন লেখকের নাম নেই, আছে 'ছদ্মনাম'।

প্রবন্ধটি পড়ে অ্যানটোনিও লেখকের নাম জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সেই অ-জানা লেখকের সন্ধান খুঁজে বার করবার জন্য তিনি জেনিভাতে একটি গোয়েন্দা নিয়োগ করেন।

কিছুদিন পরের কথা। রাসেল নামে এক তরুণী এল ডাক্তার অ্যানটোনিও-র হাসপাতালে রোগী হিসাবে। অ্যানটোনিও জানলেন শ্রীমতী রাসেল দুঃসাহসিক মেয়ে। অ্যানটোনিও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দু'জনে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। অ্যানটোনিও শুনলেন মেয়েটির বিগত জীবনের দুঃখ আর লাঞ্ছনার কাহিনী: এককালে তাকে কোন এক বৃদ্ধ লম্পটের রক্ষিতাও নাকি

হ'তে হয়েছিল। শুনে অ্যানটোনিওর মন সমবেদনায় ভরে ওঠে। ক্রমে তিনি শ্রীমতী রাসেলের কাছে তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন। রাসেল তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

কিন্তু দু'দিন বাদে সেই লম্পটের ডাকে মেয়েটি তার কাছে আবার ছুটে যাবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। অ্যানটোনিও অবাক বিস্ময়ে শ্রীমতী রাসেলের গতিপথে তাকিয়ে থাকেন। আশ্চর্য, নারীর মন চিরদিনই দুর্বোধ্য। অ্যানটোনিও-র সাধ্য কি সে-রহস্য উদ্ধার করে।

এ ঘটনার ক'দিন বাদে জেনিভা থেকে খবর এল সেই প্রবন্ধের লেখক অ্যানটোনিওর অনুজ জ্যাকস। জ্যাকস এখন শুধু একজন ক্ষমতাবান লেখকই নয়, সে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সমাজ-তন্ত্রীও বটে। ভাইয়ের সন্ধান জেনে অ্যানটোনিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

বৃদ্ধ থিবো তখন অন্তিম শয্যায়। তাঁর অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকে যায়। মাঝে মাঝে তিনি ছোট ছেলের খোঁজ করেন। পিতার অবস্থা ডাক্তার অ্যানটোনিও বুঝতে পেরে ছুটে যান অনুজকে খবর দিতে।

কিন্তু দু'ভাই ফিরে এসে দেখেন সব শেষ।

এতদিন বাদে জ্যাকসকে দেখে শ্রীমতী গীসে এগিয়ে যায় তার কাছে। কিন্তু দু'চারটে কথা বলবার পর গীসে বুঝতে পারে তার প্রতি জ্যাকস-এর মোহ কেটে গেছে। আহত গীসের বুক ভেঙ্গে শুধু একটি চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে জ্যাকস-এর থেকে দূরে সরে যায়।

আশ্চর্য, শ্রীমতী জেনী অপ্রত্যাশিত ভাবে তার হারানো মানিককে ফিরে পেয়েও সে জ্যাকসকে এড়িয়ে চলে। কে জানে কেন জেনী

এখন একই সঙ্গে জ্যাকসকে ভয় আর ঘৃণা করে। বিমূঢ় জ্যাকস ভেবে পায় না তার প্রণয়িনী জেনীর সে-আচরণের অর্থ।

ক'দিন যেতে জ্যাকস প্যারীতে আর থাকবার আকর্ষণ বোধ করে না। সে ফিরে যায় জেনিভাতে, তার কর্মস্থলে।

১৯১৪ সাল—স্মরণীয় বছর। ইয়োরোপের সর্বত্র যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। শত্রু-মিত্র কোন পক্ষের সৈন্যসমাবেশ পর্ব তখনও ঠিক সুরু হয় নি।

এদিকে নিরপেক্ষ জেনিভাকে প্রধান কর্মস্থল করে মেনিট্রেলের নেতৃত্বে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীর সমাজতন্ত্রীরা মিলিতভাবে এই যুদ্ধ রোধ করতে চেষ্টা করে। জ্যাকস এদেরই একজন উদ্যোক্তা।

এই পার্টির কাজে জ্যাকসকে গোপন-সফরে নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাকে সতর্ক হয়ে মিলিত হতে হয় সেই সব দেশের শ্রমিক এবং জনগণের সঙ্গে। এমনি একটি সফরে তাকে এক সময় প্যারীতে আসতে হল।

প্যারীতে এসে জ্যাকস তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত। প্রণয়িনী জেনীর কথাও তার মনে পড়ে না। এখন সে একজন দায়িত্বশীল কর্মী। হৃদয়বৃত্তির তার অবকাশ কোথায়? তার চেহারা এবং কথায় ফুটে উঠেছে ব্যক্তিত্বের আভাস।

হঠাৎ একদিন চলার পথে জ্যাকস দূর থেকে জেনীকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। ততক্ষণে জেনীও তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জেনী দেখতে এখন আরও সুন্দরী হয়েছে। জেনীও জ্যাকস-এর নবরূপ দেখে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে থাকে না আগেকার ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব—তাতে ফুটে ওঠে শুধু শ্রদ্ধা আর ভালবাসা।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ওরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর

হু'জনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হ'তে নিমেষে উভয়ের মধ্যে কি যেন হয়ে যায়। লাজুক পায়ে জেনী আরও এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার দয়িতের গা ঘেঁসে। জ্যাকস জেনীকে প্রেম নিবেদন করে। জেনী সে-প্রেমে ডুব দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়।

এমন সময় ভিয়েনা থেকে খবর এল—জেনীর পিতা মঁসিয়ে ছ ফনটেনিন আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেতে সেখানে আগুন জ্বেলে আত্ম-হত্যা করেছেন। খবর শুনে জেনীর মা ছুটে যান ভিয়েনাতে নিজের মান বাঁচাতে।

মা'র অনুপস্থিতিতে জেনী তার প্রিয়তম জ্যাকসকে তাদের শূন্য বাড়িতে রোজ সাদর অভ্যর্থনা জানায়। জ্যাকস সে আমন্ত্রণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে না।

প্রেমিক যুগলের দিনগুলি ভালই কাটছিল। কিন্তু সেদিন খুব সকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রীমতী ফনটেনিন ফিরে এলেন ভিয়েনা থেকে। বাড়িতে ঢুকে ভিতরে যেতে মেয়ের ঘরে নজর পড়তে মা'র চক্ষুস্থির ঃ জেনী জ্যাকস-এর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে তখনও ঘুমিয়ে আছে।

এ ঘটনার পর জেনী মনে মনে স্থির করে, প্যারী ছেড়ে সে জ্যাকস-এর সঙ্গে জেনিভাতে চলে যাবে। জ্যাকস তার প্রস্তাবে আপত্তি করে না। কিন্তু যাত্রার আগের দিন কি ভেবে জেনী তার সিদ্ধান্ত পাল্টে দেয়।

মুক্ত বিহঙ্গের মত জ্যাকস আবার ছুটে যায় তার কর্মস্থলে। আবার সে ডুবে যায় লোকহিতকর বৃহত্তর জগতে।

ওদিকে সমাজতন্ত্রীদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে যুদ্ধ ক্রমে আসন্ন হয়ে ওঠে। সেই আসন্ন যুদ্ধ প্রতিরোধ করবার জন্য সমাজতন্ত্রীরা মরিয়া হয়ে ওঠে। দলপতির সঙ্গে জ্যাকস মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। তারা স্থির করল, এই যুদ্ধ রোধ করবার জন্য

সরাসরি তারা আবেদন জানাবে উভয় পক্ষকে—ফ্রান্স এবং জার্মানীর সরকার এবং তাদের জনগণকে।

তাই দলপতি এবং জ্যাকস একদিন সুইজারল্যাণ্ড থেকে কয়েক সহস্র আবেদন পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছোট একটি প্লেনে চেপে। তারা ছড়িয়ে দেবে সেই আবেদন পত্র উভয় দেশের সর্বত্র। প্লেনের পাইলটের আসনে বসলেন স্বয়ং দলপতি।

ফ্রান্সের উপর এসে আবেদন পত্রগুলি ছড়িয়ে দিতে সবে তারা নীচের দিকে নামছে। শত্রুপক্ষের অনুচর মনে করে সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটিকে ছ'দিক থেকে প্রচণ্ড ভাবে গুলিবিদ্ধ করা হল। আগুন জ্বলে ওঠে—সেটি মাটিতে পড়বার আগেই চালক দলপতি পুড়ে মরল। আর জ্যাকস গুরুতর ভাবে আহত হল।

আহত জ্যাকসকে ফরাসী সৈন্যরা গুপ্তচর মনে করে স্ট্রেচারে করে তাদের হেড কোয়ার্টারস্-এ নিয়ে চলল। কিন্তু মাঝ রাস্তাতে একজন তাকে গুলি করে মারল।

জ্যাকস-এর অগ্রজ অ্যানটোনিওকে ডাক্তার হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়েছিল। সেখানে বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে পড়ে তিনি মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আরোগ্যের কোন আশা নেই জেনে অ্যানটোনিও বাড়ি ফিরে আসেন।

ফিরে এসে সেখানে শ্রীমতী ফনটেনিন-এর সুষ্ঠু পরিচালনায় অত বড় হাসপাতাল গড়ে উঠতে দেখে ডাক্তার অ্যানটোনিও মুগ্ধ হন।

ইতিমধ্যে ড্যানিয়েলও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে বিকলাঙ্গ হয়ে। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও তার বোন জেনী থাকে নির্বিকার। বাইরের ছনিয়ার উত্তেজনায় সে বিচলিত হয় না; তাতে তার শান্তি নষ্ট হয় বলে মনে হয় না। কিছুদিন আগে জ্যাকস-এর ছেলে তার কোলে এসেছে। সেই ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে জেনী সব সময় ব্যস্ত। তাদের এই সন্তানটি জেনীর চোখের মণি, মনের সান্ত্বনা। ড্যানিয়েলও

এই দুষ্টু ছেলেটিকে নিয়ে মাঝে মাঝে সময় কাটায়। কখনও বা সে হাসপাতালের কাজে মাকে সাহায্য করে।

আরও কিছুদিন পরের কথা। চিকিৎসার জন্য অসুস্থ অ্যানটোনিও চলে গেলেন দক্ষিণ ফ্রান্সের কোন একটি হাসপাতালে। সেখানে যাবার ক'দিন বাদে প্রীতি-উপহার হিসাবে তাঁর হাতে এল একটি মূল্যবান কণ্ঠহার। সেটি এল তাঁর দু'দিনের প্রণয়িনী সেই দুঃসাহসিকা রাসেলের কাছ থেকে। অ্যানটোনিও জানলেন, আফ্রিকায় থাকাকালীন শ্রীমতী রাসেল পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। অ্যানটোনিও স্তম্ভিত হন।

হাসপাতালে অ্যানটোনিওর চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় না। কিন্তু তাঁর অবস্থার কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না, ক্রমে খারাপ হয়।

তবুও অ্যানটোনিও রোজ যুদ্ধের খবর বিশদভাবে লিখে যান তাঁর ডায়েরীতে। দীর্ঘদিন অসুস্থতায় অ্যানটোনিও দুর্বল, তায় যুদ্ধের বিভীষিকায় তিনি আরও ভেঙ্গে পড়েন। ১৯১৮ সালের ১৮ই নভেম্বর তিনি মারা গেলেন।

যাবার আগে অ্যানটোনিও জেনে গেলেন না যে তিনি জীবিত থাকাকালীন-ই যুদ্ধ থেমে গেছে, হয়েছে সন্ধি। জনগণ সমস্ত কুশ্রী আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছে।

সোনার মাটি

আমেরিকার সাহিত্যিক শ্রীমতী পার্ল বাক (Pearl Buck)-এর 'গুড্ আর্থ' (Good Earth), ১৯৩১, উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

—তোমার জন্য কনে ঠিক করেছি। মেয়েটি বড় দুঃখী। আমাদের মত চাষীর ঘরে সে আদর্শ বৌ হবে। তুমি সুখী হবে। হলোই বা সে একজন ক্রীতদাসী। তুমি দেখে নিও, মা লক্ষ্মী ঘরে এলে দু'দিনেই এ লক্ষ্মীছাড়া ঘরের শ্রী ফিরবে। শুধু কি তাই, নিশ্চিন্ত আরামে আমাদের দু'বেলা অন্নও জুটবে, প্রয়োজনে চাষের কাজেও সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।—ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বৃদ্ধ তরল কণ্ঠে বলে যায়।

বাপের কথা ওয়াং লুঙ্গ নীরবে শোনে, কোন প্রতিবাদ জানায় না।

মেয়েটির মনিবের সঙ্গে আগে থেকেই এ বিষয়ে কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। ব্যবস্থা অনুযায়ী পরের দিন সকালে ওয়াং লুঙ্গ জমিদার বাড়িতে হাজির হয়। তারপর মনিবের আশীর্বাদ নিয়ে শ্রীমতী ওলানকে সঙ্গে করে মনিব বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে আসে।

আস্তে আস্তে দু'জন এগিয়ে চলে বাড়ির দিকে। মাঝ রাস্তায় পুরানো বিখ্যাত মন্দিরটির সামনে এসে ওরা দু'জন থামল। মন্দিরের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে দুজনে ভক্তিভরে ভিতরের বিগ্রহটির উদ্দেশ্যে প্রণাম করলে ; তারা জ্বালাল ধূপ। তারপর সেই দেবতাকে সাক্ষী রেখে দু'জনে মালা বদল করে।

বিয়ের কদিন বাদেই বোঝা গেল, বৃদ্ধের অনুমান মিথ্যা হয়নি।

বৌ হিসাবে ওলান সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তার ব্যবহারে শ্বশুর সুখী, স্বামী মুগ্ধ।

ওলান অত্যন্ত মিতব্যয়ী। সংসারের কাজে সে ডুবে থাকে সব সময়। বন জঙ্গল থেকে গাছের শুকনো ডাল পালা সে কুড়িয়ে আনে মাথায় বয়ে, এখন আর ওদের কিনতে হয়না কোন জ্বালানি কাঠ। শ্বশুর আর স্বামীর পরিত্যক্ত জীর্ণ জামা-কাপড় নিপুণ হাতে রিপু করে সে তাদের চমক লাগায়। দু'দিনেই ঝকঝকে পরিষ্কার করে ঘর-দোরের চেহারাটাই ওলান দেয় পাল্টে,—তা দেখে প্রতিবেশীদের মনে জাগে ঈর্ষা। আবার একটু ফাঁক পেলেই সে ছুটে যায় মাঠের দিকে, স্বামীকে সাহায্য করতে তার চাষের কাজে। প্রখর রোদেও ওলান হাসিমুখে স্বামীর সঙ্গে চাষের কাজ করে। ওলান জমিতে কাজ করে তার প্রথম সন্তানের প্রসব ব্যথা ওঠবার মুহূর্তটি পর্যন্ত।

বিয়ের বছরটি ওয়াং লুঙের ভালই কাটল। বছর শেষে ওলান তাকে একটি পুত্রসন্তান উপহার দেয়। সে বছর তার ক্ষেতে ফসলও হল আশাতীত ভাল ; ক্ষেতের গম আর চাল বিক্রী করে ওয়াং লুঙের হাতে এল প্রচুর অর্থ। তাই দিয়ে পরিবারের সকলের জন্য কেনা হয় নতুন জামা কাপড়, আরও কত কি। তারপর ওয়াং লুঙ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেল তার পুরানো মনিবের বাড়িতে—তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে।

তাঁর পায়ের কাছে কিছু অর্থ রেখে ওরা দুজনে ভক্তিভরে জমিদারকে প্রণাম করল। তারপর ওয়াং লুঙ নিবেদন করে ছোট্ট একটি প্রার্থনা—এক ফালি চাষের জমির জন্য। জমিদার খুশী মনে ওর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

সামান্য জমি কিন্তু সে জমি উর্বর।

বছর ঘুরতে ওলানের কোলে আর একটি পুত্র এল। সে বছরও জমিতে ফসল হয় খুব ভাল। পর পর দু'বছরই ওয়াং লুঙের বেশ ভাল ভাবেই কাটল। কিন্তু অত ভাল তার বরাতে সইবে কেন?

তৃতীয় বছর, গ্রীষ্মের মুখে, দু'ছেলের পর ওলান একটি মেয়ের জন্ম দেয়। মেয়েটি হল রুগ্না, কিছুটা পঙ্গু। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার পর কোথা থেকে এক ঝাঁক কাক বাড়ির ওপর উড়ে এসে কা-কা করে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। ওয়াং লুঙ্গ উপলব্ধি করল যেন সেই কুৎসিত কাকগুলি তার ভাগ্যকে ব্যঙ্গ করছে—তারা ঘোষণা করছে তার আশু অমঙ্গলের বার্তা। ওয়াং লুঙ্গ ভুলে যায় আনন্দ উৎসবের কথা।

সে গ্রীষ্মে একদিনের জন্যও বৃষ্টি হল না। এই অনাবৃষ্টির জন্য চাষীদের ঘরে ফসল উঠল যৎসামান্য; ওয়াং লুঙ্গের বরাতেও তাই জুটল। যেটুকু তাদের ঘরে উঠল তাতে আর কদিন চলে? কিন্তু পেটের ক্ষুধা দুর্জয়। খাদ্যের অভাবে চাষীরা অগত্যা তাদের হালের গরুগুলি সব একে একে কাটল। কিন্তু তারপর? তারপরের কথা ওরা আর ভাবতে পারে না, নীরবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নাও নতুবা ভিটা ছেড়ে দক্ষিণে এগিয়ে যাও, কাজের সন্ধানে, খাদ্যের আশায়।

এই দুঃসময়ে ওলান একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিল—চতুর্থ সন্তান। একে দুর্ভিক্ষ তাই প্রতি বছর সন্তানের জন্ম দিয়ে ওলান তখন ধুঁকছে। ওয়াং লুঙ্গ স্থির করতে পারেনা তার কর্তব্য। সে তার ঘরের সবকিছু জলের দরে বিক্রী করে দেয়। তারপর সেই টাকা সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য চাষী ভাইদের মত সেও সপরিবারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ভাগ্যের সন্ধানে। রাস্তায় বেরিয়ে সে দেখল একদল বাস্তুহারা এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাহায্যে সে এসে পৌঁছল কোন এক রেল স্টেশনে। সেখান থেকে ওয়াং লুঙ্গ যাত্রা করল দক্ষিণের দিকে—নতুন ঘরের স্বপ্ন নিয়ে।

ওয়াং লুঙ্গ সপরিবারে নতুন সহরে এসে পৌঁছল। জীর্ণ মাদুর আর কাদামাটি দিয়ে কোন এক কাণাগলিতে যাহোক করে সে একটি আস্তানা গড়ে তুলল। জীবিকার জন্য নিজে রিক্সা টানতে সুরু করে,

আর স্ত্রী বড় ছেলে দুটিকে নিয়ে ভিক্ষা করে কিছু ঘরে আনে। এমনি ভাবেই শীতকালটা ওদের কেটে যায়।

শীতের শেষে সে সহরে ঘটল এক অঘটন। হাওয়ায় রটে গেল সহরে হবে যুদ্ধ। স্থানীয় লোকেরা নিজেদের সৈন্যবাহিনীর শক্তির ওপর ভরসা করতে পারে না। তাদের বিশ্বাস—শত্রুসৈন্যেরা বিশেষ শক্তিশালী।—তারা নিমিষে এ সহর পুরোপুরি দখল করবে।

তাই বড়লোকেরা প্রাণভয়ে রাতারাতি সে সহর ছেড়ে পালায়। পিছনে পড়ে থাকে কিছু পঙ্গু আর হতভাগ্য গরীবের দল। সহরে এল দারুণ অরাজকতা। সেই সুযোগে বুভুক্ষিতেরা লুটপাট সুরু করে—তারা বিনা বাধায় হানা দেয় পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে।

ওয়াং লুঙ্গও সে সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে না। এক সন্ধ্যায় সে হানা দিল কোন এক ধনী পঙ্গুর রাজকুঠীতে। অসহায় লোকটিকে প্রাণভয় দেখিয়ে সে কেড়ে নিয়ে এল তার যথাসর্বস্ব—সব ধনরত্ন।

লুণ্ঠিত ধন নিয়ে ওয়াং লুঙ্গ এবার ফিরে এল নিজ গাঁয়ে। গাঁয়ে ফিরে প্রথমেই সে তার পরিত্যক্ত জীর্ণ গৃহটি ঠিক করে নেয়, তাতে হয় বিস্তর খরচ। চাষী ওয়াং লুঙ্গ ভাবে, সে আবার চাষেই মন দেবে—চাষ করেই ভাগ্য ফেরাবে।

স্বামীকে চিন্তিত দেখে ওলান তার পাশে এসে দাঁড়ায়,—

—তুমি অত কি ভাবছ? এক্ষুণি আরও কিছু জমি কেনো, তারপর চাষে মন দাও। টাকার জন্য তুমি ভেবো না। সহরে সেই লুটের সময় আমি নিজেও কিছু রোজগার করেছিলাম। এই নাও—সব তুমি নিয়ে নাও। তুমি রাগ করো না, শুধু এই সুন্দর মুক্তো দু'টো আমি রেখে দিচ্ছি।

স্ত্রীর উক্তি শুনে ওয়াং লুঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে

দাঁড়িয়ে উঠে এক হাতে মণিমুক্তোর পুঁটলিটি নিয়ে অন্য হাত দিয়ে ওলানকে বুকে টেনে নেয়।

পরের দিন সকাল বেলায় ওয়াং লুঙ্গ জমিদারের থেকে আরও কিছু জমি কেনে। জমির তদারক করতে একজন বিশেষজ্ঞও নিযুক্ত হয়। সেই সব জমি আর কৃষিকাজে তাকে সাহায্য করবার জন্য কিছুদিন বাদে তাকে আরও ছ'জন লোক রাখতে হয়।

ওলান গাঁয়ে ফিরে এসে স্বামীকে এবার যমজ সন্তান উপহার দিয়েছে। এখন আর তার করবার কি-ই বা আছে? কখনও বা বাড়ির ঝি চাকরদের একটু তদারক করে। ভাল ভাবে লেখাপড়া করবার জন্য বড় ছেলে তুটিকে সহরের স্কুলে পাঠান হয়েছে।

এক সময় প্রবল বন্যায় চাষের সব জমি জলে ডুবে যায়। ফলে, চাষের কাজ বন্ধ থাকে। কাজ থেকে ছুটি পেয়ে ওয়াং লুঙ্গ মাঝে মাঝে সহরের দিকে বেড়াতে যায়—চায়ের দোকানে আড্ডা জমায়।

সুন্দরী লোটাসের সঙ্গে তার এই চায়ের দোকানেই প্রথম দেখা হয়। সেই প্রথম সাক্ষাতেই ওয়াং লুঙ্গ তার প্রেমে পড়ে। এমনি ভাবেই তাদের মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিন্তু ক্ষণিকের দেখায় সুখ নেই। ক'দিন বাদে ওয়াং লুঙ্গ সুন্দরীকে নিয়ে এল নিজ গাঁয়ে, তার খামার বাড়ীতে।

ওয়াং লুঙ্গ চতুর মানুষ, দূরদর্শী। পারিবারিক শান্তি নষ্ট করতে সে চায় না। তাই ওলানের থেকে দূরে লোটাসের থাকবার সে ভিন্ন ব্যবস্থা করে। সে ব্যবস্থায় ওলান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ওয়াং লুঙ্গের বড় ছেলে এখন বড় হয়েছে, সে যৌবনে পা দিয়েছে। তায় সহরের স্কুলে পড়াশুনা করে তার চোখমুখ খুলেছে একটু তাড়াতাড়ি। লোটাসের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কের রহস্য সে ছেলের

বুঝতে অসুবিধা হয় না। ছেলে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে—বাবা গাঁ থেকে একটু দূরে গেলে সেই ফাঁকে সে চুপি চুপি লোটাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

সেদিনও এমনি সুযোগ পেয়ে সে লোটাসের ঘরে ঢুকে তার দিকে একটি গোলাপ ফুল এগিয়ে দিল।

—বাঃ, ফুলটি কি সুন্দর। মুগ্ধ কণ্ঠে লোটাস জানায়।

—এ ফুলটির চেয়েও কিন্তু তুমি সুন্দর। শুধু তাই নয়, তুমি যুবতী, এত সুন্দরী তায় সুন্দরের পূজারী হয়েও এই বে-রসিক, অসুন্দর বুড়ো লোকটির প্রেমে ডুবে আছ কি করে·····

পিছন থেকে বাপের বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর প্রেমিক ছেলের রসভঙ্গ করে। সে তার বক্তব্য আর শেষ করতে পারল না। বাপের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে ছেলে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

ছেলের মতিগতি দেখে ওয়াং লুঙ্গ তাড়াতাড়ি সহরের এক ধনী বণিকের মেয়ের সঙ্গে সে ছেলের বিয়ের ঠিক করে। এ বিয়ের ক'দিন বাদে হঠাৎ একদিন পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ কষ্ট পেয়ে ওলান মারা গেল। তার মৃত্যুর কদিন বাদে ওয়াং লুঙ্গের বাপও মারা যায়। তারপর সহরের সেই ধনী বণিকের সঙ্গে আত্মীয়তা দৃঢ় করবার জন্য ওয়াং লুঙ্গ তার ছোট ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে।

চাষী হলেও ওয়াং লুঙ্গ এখন একজন ধনী লোক। সুসময়ে আত্মীয়ের অভাব হয় না কোন কালে। হঠাৎ একদিন ওয়াং লুঙ্গের কোন এক দূর সম্পর্কীয় কাকা, কাকী আর তাদের বাউণ্ডুলে ছেলেটি তাদের পোঁটলা পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল তার বাড়িতে। গৃহকর্তার বুঝতে অসুবিধা হয় না—অতিথিরা সেখানে পাকাপাকি ভাবেই থাকতে এসেছে। তা থাক্।

কিছুদিন বাদে গাঁ-য়ে আবার হল প্রবল বন্যা। সেই সঙ্গে চোর

ডাকাতের উপদ্রব। গৃহস্থদের প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। ডাকাতরা ওয়াং লুঙ্গের পাশের বাড়িগুলির উপরও এক রাত্রে হামলা করল। কিন্তু বিত্তবান ওয়াং লুঙ্গের বাড়ির দিকে তারা পা বাড়ায় না। ওয়াং লুঙ্গ এর রহস্য কিছু বুঝতে পারল না। তবে দুদিন বাদেই সে বুঝতে পারল, যখন জানল—তার আশ্রিত কাকাও একজন ডাকাত সর্দার। এ ঘটনার পর থেকে ওয়াং লুঙ্গ নিজের স্বার্থে কাকাকেও বিশেষ খাতির করে চলে।

সুবিধা বুঝে কাকার আব্দার দিন দিন বেড়ে যায়। ফলে, ভাইপোটি মুস্কিলে পড়ে। কাকা আর কাকীকে বাগে আনতে ওয়াং লুঙ্গ তাদের দিকে বেশী মাত্রায় আফিম এগিয়ে দেয়। কিন্তু সে ওষুধেও বিশেষ ফল হয় না। তার ওপর কাকার ছেলেটিকে নিয়ে হল ওয়াং লুঙ্গের এক নতুন সমস্যা—তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ওয়াং লুঙ্গের বড় পুত্রবধূটির ওপর। ঠিক সেই সময় তার কৃষিবিশেষজ্ঞ কর্মচারীটিও হঠাৎ মারা যায়। ওয়াং লুঙ্গের চাষের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়, কাজ করবার আর তার শক্তিও নেই।

এই বিরক্তিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য ওয়াং লুঙ্গ স্থির করে সে গাঁ ছেড়ে সহরে গিয়ে ঘর বাঁধবে—নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। তাই সে যাবার আগে তার সব জমি বর্গা দেয়, খামার বাড়ির প্রায় সবটাই ভাড়া দিয়ে দেয়।

ওয়াং লুঙ্গ সহরে চলে যায়, কাকা আর কাকী থেকে যায় তার গাঁয়ের বাড়িতে।

সহরে চলে এলেও ওয়াং লুঙ্গের মনটা পড়ে থাকে পিছনে—তার জমির দিকে। চাষের কাজ নিজে দেখাশুনা করবার তার আর শক্তি নেই বটে, তবুও বসে বসে সে চাষের কথাই ভাবে। তার আশা ছিল, ছোট ছেলেটির উপর ; বড় হয়ে হয়ত বা সে ছেলে চাষের মূল্য বুঝবে, সে তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে। কিন্তু দেখা গেল

ছেলেটি অল্প বয়সেই বখাটে নাম কিনে নানা কেলেঙ্কারি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবিভাগে নাম লেখে। ছেলের গুণকীর্তি শুনে বৃদ্ধ ওয়াং লুঙ্গের বুক থেকে শুধু একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, তার মুখে ভাষা যোগায় না, জীবন অর্থহীন ঠেকে।

কিছুদিন থেকে ওয়াং লুঙ্গের মনে হয় যেন মৃত্যু চুপি চুপি এগিয়ে আসছে তার দিকে। আবার, তার চাষের জমি আর খামার বাড়ি তাকে আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ দুর্বার। পঙ্গু বড় মেয়েটি, বিশ্বস্ত তরুণ ক্রীতদাস এবং আরও ক'জন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াং লুঙ্গ তার খামার বাড়িতে একদিন ফিরে এল। সে স্থির করল শেষ জীবনটা সে এখানেই কাটিয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে ছেলেরাও গাঁয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে একদিন ওয়াং লুঙ্গ বেরিয়ে যায় তার জমির দিকে। চলতে চলতে চাষের জমির কাছে এসে ওয়াং লুঙ্গ দাঁড়িয়ে পড়ে। ছেলেরা এগিয়ে যায়। বৃদ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার সুবিস্তৃত জমির দিকে—বুঝিবা সে একটু আনমনা হয়, হয়ত বা চাষী জীবনের স্মৃতি মন্থন করে। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসে ছেলেদের কণ্ঠস্বর, তারা বলাবলি করে,—

—আরে, আর ক'টা দিন ত'। বুড়ো চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সব জমি আর খামার বাড়ি বিক্রী করে দেবো। তারপর বিক্রীর টাকা আমরা সকলে সমান ভাগেই ভাগ করে নেব।

ছেলেদের কথাগুলো ওয়াং লুঙ্গের কানে আসতে সে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলে,—

—ওরে পণ্ডিতমূর্খের দল, তোরা সব কি সর্বনাশা কথা বলছিস! ভুলে যাস্‌নি—তোরা চাষার ছেলে। বাঁচতে চাস্ তো মনে রাখিস,—দুনিয়াতে একমাত্র মাটি-ই খাঁটি, চাষ লক্ষ্মী। এই জমি বিক্রীর কথা আর কখন ভুলেও তোরা মনে করিস নে। এই জমির

দৌলতেই আমি আজ এত সম্পত্তি করেছি, তোরা বড় হয়েছিস, এখনও এই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছিস্। বৃদ্ধ আবেগজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলে যায়।

কিন্তু বৃদ্ধ ওয়াং লুঙ্গ জানল না, তার এই আকুল আহ্বান স্পর্শ করে না ছেলেদের মন; পরিবর্তে তাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের চাপা হাসি।

মুক্তি

ফিনল্যাণ্ডের লেখক ফ্রাঁস এমিল সিলান্‌পা (Frans Eemil Sillanpaa)-এর 'মীক হেরিটেজ' (Meek Heritage), ১৯১৯, উপন্যাসের গল্প।

বেঞ্জামীন-এর দু'জন স্ত্রীই গত হয়েছে। তার নিজের বয়সও কম হয় নি। লোকে তাকে বৃদ্ধ বলে। বেঞ্জামীনের তবুও কিন্তু লালসা নেভেনি। তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে দাসী মাজার উপর।

মাজা বিবাহিতা। সে একটি সন্তানের মা। মাজা জানে বেঞ্জামীন একজন বৃদ্ধ, তামাকখোর এবং অত্যাচারী। কিন্তু তার পয়সা আছে, আছে তার সামাজিক মর্যাদা।

মাজা দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

ঠিক সেই সময় মাজার মনে পড়ে তার স্বামীর অত্যাচারের কথা। তার মনে জেগে ওঠে তার প্রতি স্বামীর অহেতুক কদর্য অপমানজনক উক্তি আর দুঃস্থ জীবনের গ্লানিকর স্মৃতি। হঠাৎ সে কি যেন খুঁজে পায়। খুশীতে মাজা উচ্ছল হয়ে ওঠে।

মাজা ভাবে, এই তো অপূর্ব সুযোগ। স্বামীকে জব্দ করা আর সেই সঙ্গে বেঞ্জামীনের দৌলতে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের।

দ্বিধামুক্ত হয় মাজা। পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রের মত স্বামীকে ত্যাগ করে সে এগিয়ে যায় বেঞ্জামীনের কাছে। সে বরণ করে নেয় বেঞ্জামীনের রক্ষিতার আসন।

দিন যায়। মাজার গর্ভে বেঞ্জামীনের সন্তান আসে। ইতিমধ্যে বেঞ্জামীনের মেজাজ আরও রুক্ষ হয়। প্রায় সারাক্ষণ সে মদের

নেশায় চুর হয়ে থাকে। কখনও বা অকারণে মাজাকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে। বেচারী নীরবে সব কিছু সহ্য করে যায়।

মাজা ভাবে, আর ক'টা দিন মাত্র। অনাগতের জন্মের পর সে পাবে তার আকাঙ্ক্ষিত চাষী-গিন্নীর মর্যাদা আর বেঞ্জামীনের ভালবাসা।

সেদিন রাত্রে মাজার প্রসব-ব্যথা সুরু হয়। ক্রমে তা তীব্র হয়ে ওঠে। তার চোখে ফুটে ওঠে কাতর মিনতি। কিন্তু বেঞ্জামীনের সেদিকে নজর দেবার সময় কোথায়? নেশার টান প্রবল, তা দুর্জয়।

সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাজির হয় প্রতিবেশী বন্ধু অলিলার ঘরে—মদের লোভে। পথে লোভীষার সঙ্গে দেখা হতে বেঞ্জামীন তাকে বলে যায় মাজার ওপর একটু নজর রাখতে।

লোভীষা মুখরা বটে কিন্তু চতুর মেয়ে। মাজা এখানে আসবার আগে লোভীষা এককালে বেঞ্জামীনের যথেষ্ট সোহাগ আর অনুগ্রহ পেয়েছে।

গভীর রাত্রে টলতে টলতে বেঞ্জামীন বাড়ি ফিরে আসে। এসে সে জানলো, মাজা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তবুও সে একবার উঁকি দেয়না মাজার ঘরে। সে ডেকে পাঠায় লোভীষাকে।

পুত্র জুসী অনাদরের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। পিতার স্নেহ ভালবাসার স্বাদ সে জানে না। সে পিতাকে এড়িয়ে চলে। বেঞ্জামীন মাঝে মাঝে ছোট্ট ছেলেটির মুখে তামাক পুরে দিয়ে কৌতুক করে।

বেঞ্জামীন জরা বার্ধক্যে ধুঁকছে। মাজার উপর অত্যাচার করবার এখন আর তার শক্তি নেই। মাজাও এখন আর তাকে ভয় বা গ্রাহ্য করে না। বেঞ্জামীনের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে।

অনাবৃষ্টি এনে দিল আরও বিপর্যয়। বেঞ্জামীন বন্ধু অলিলার সঙ্গে বসে মদ খায় আর তার থেকে টাকা ধার করে কোন রকমে দিন কাটায়।

ক্রমে তার ঋণ হল প্রচুর। বাধ্য হয়ে বেঞ্জামীন সেই ঋণের বিনিময়ে তার সব সম্পত্তি লিখে দিল অলিলাকে। তার দু'দিন বাদে বেঞ্জামীন মারা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অলিলা এসে বেঞ্জামীনের বাড়ি ঘরদোর দখল করল। মাজা এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অন্য হাতে ছেলের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

অগত্যা মাজা পায়ে হেঁটে যাত্রা করে সুদূর তুরিলার উদ্দেশ্যে—তার ধনী ভাইয়ের আশ্রয়ের আশায়।

ছেলেকে নিয়ে মাজা এক সময় ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছল। কিন্তু ধনী ভাই ভিখারী বোনকে চিনতে চায়না। মূর্খ হলেও এ রহস্য বুঝতে মাজার অসুবিধা হয় না। তবুও এক রকম জোর করেই ছেলেকে সেখানে রেখে মাজা নিজের ভাগ্যের সন্ধানে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।

ক'দিন বাদেই দুঃখিনী মাজা মরে গেল। পেল সে মুক্তি। তার দুঃখের বোঝা বইবার জন্য পিছনে রেখে গেল তার আত্মজকে।

কুঁড়ে ঘর থেকে সাজান গোছান মামার ঐ বিশাল বাড়িতে এসে জুসী খেই পায় না। তাদের চালচলন আদেশ-নির্দেশ অনেক কিছুই তার বোধগম্য হয় না। আর এক মুস্কিল হল, সে ভেবে পায় না সে এবাড়ির মনিব শ্রেণীর কি ভৃত্যের স্তরের। সব কিছু মিলিয়ে এক বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে জুসীর দিন কাটে।

ক'দিন বাদে মামার দয়ায় তার গরু ঘোড়াগুলি দেখাশুনা করবার একটি ছোট্ট কাজ পেয়ে জুসী স্বস্তি পায়। সে ভাবে, তার মামার এ অশেষ করুণা।

জুসী ক্রমে বড় হয়। মামাও একটু একটু করে ভাগ্নের উপর কাজের দায়িত্ব চাপায়।

বর্ষার সন্ধ্যা। মামা জুসীকে ডেকে আদেশ করেন—'চাষের কাজের জন্য ক'জন মজুর নিয়ে এসো'।

মামার নির্দেশে ভাগ্নে সেই দুর্যোগে বেরিয়ে যায়। কিছুদূর গিয়ে জুসী দেখতে পায় চাষী ভাইরা ফসল কাটার উৎসবে মেতে উঠেছে। তাদের কাছে এগিয়ে যেতেই জুসী অবাক হয়,—ওরা ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়. তার হাতে পানীয়ও তুলে দেয়। শুধু তাই নয়, ওর সমবয়সী একটি ছেলে এগিয়ে এসে জুসীর সঙ্গে নাচতে শুরু করে। দেখতে দেখতে জুসী ওদের সঙ্গে মিশে যায়।

এক সময় একদল খুব হৈ চৈ করতে করতে চাষীমেয়ে মণ্ডাকে নিয়ে এগিয়ে চলে তার মামার বাড়ি তুরিলার দিকে—মেয়েটিকে তার ডেরায় পৌঁছে দিতে। জুসীও ঐ দলে ভিড়ে যায়।

সেই দল এগিয়ে আসতে তাদের গোলমালে মামার ঘুম ভেঙ্গে যায়। লাঠি হাতে ছুটে এসে মামা হৈচৈকারীদের তাড়া করে। তারা পালিয়ে বাঁচে। জুসীও গা ঢাকা দেয়।

এ ঘটনার কিছুদিন পরের কথা। মামা একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করে। সেখানে নিমন্ত্রিত হয় স্থানীয় গণ্যমান্য লোক সব। জুসীর ওপর ভার পড়ে অতিথিদের আসা যাওয়ার জন্য ঘোড়ার গাড়ির তদারক করার।

জুসীর বন্ধু গুস্তব তৈভোলা। ছেলেটি ছিল দুষ্টু প্রকৃতির। মজা দেখবার জন্য কোন ফাঁকে সে একটি গাড়ির কি একটা নাট্ না বল্টু খুলে রেখে আসে। উৎসব শেষে দুজন অতিথি যেমনি সে গাড়িতে বসতে গিয়েছে অমনি দুর্ঘটনা।

আর যায় কোথা! মারমুখো হয়ে মামা ছুটে আসে। জুসীকে

সে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে মামা তাকে আদেশ করে।

জুসী কিছু বুঝতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে অসহায় ভাবে সে তাকিয়ে থাকে মামার দিকে। তবুও তাকে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। সাময়িক ভাবে সেই বন্ধুর বাড়িতে জুসী আশ্রয় পায়।

বন্ধুর বাড়িতে সে আশ্রয় পেল বটে—কিন্তু সেখানে তার প্রতি ছিল না কোন আন্তরিকতা, ছিল অনাদর আর অবজ্ঞা। জুসী সেখানে কোন রকমে দিন কাটায়। পরিবারের জন্য সে এটা সেটা সাধ্যমত কাজ করে। তবুও জুসী তাদের মন পায় না।

ক'দিন বাদে সে অঞ্চলে এল একদল কাঠুরিয়া। জুসীর দুর্দশা দেখে সে দলের দলপতি কেইননেন-এর কেমন মায়া হয়। সে জুসীকে সাদরে তার দলে টেনে নেয়—তার প্রাপ্য মজুরী থেকে দলপতি জুসীকে বঞ্চিত করে না।

মামার দেশ তুরিলা ছেড়ে জুসী সেই কাঠুরিয়াদের সঙ্গে ভিন্‌দেশে চলে যায়। ক'বছর সে তাদের সঙ্গে থেকে কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করে।

এক সময় এল যখন কাঠুরিয়াদের আর কাজ থাকে না। জুসী নিজ গাঁয়ে ফিরে যায় চাষের কাজে মজুর হিসাবে।

পিরজোলায় ফিরে এসে তার কাজ জুটে যায় সেখানকার জোতদার-এর কাছে—আশ্রয় মেলে তারই খামার বাড়িতে।

সে বাড়ির ঝি আর জুসীর শোবার ব্যবস্থা হয় একই ঘরে। নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্বাদ জুসী জানে না। রাত্রে শুতে গিয়ে জুসী ভেবে পায় না তার দেহমনে কিসের এক শিহরণ জাগে! দু'রাত্র যেতে জুসী বুঝতে পারে তার কামনার শিহরণ আর আগুনের উৎস। ভীরু নয়নে জুসী তাকায় অদূরে শুয়ে থাকা শিথিলবসনা রীণার প্রতি।

দুশ্চরিত্রা রীণার বুঝতে অসুবিধা হয় না জুসীর মনোভাব। তার বসন আরও একটু শিথিল হয়। যুবতী রীণার দেহের পরিপুষ্ট রেখা-গুলি উঁকি দেয়। সে স্থির নিশ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করে।

তবুও কিন্তু জুসী এগিয়ে যায় না। সে ইতস্ততঃ করে, ভয় পায়।

সেদিন ছিল রবিবার। জুসী ভাবে, না এ অসম্ভব এভাবে আর চলে না। শুতে যাবার আগে সে মদ খেল প্রচুর। নেশায় ডুবে গেল তার সত্তা, সব সংশয় আর দ্বিধা, জেগে উঠল জুসীর আদিম বর্বর পশুসত্তা।

গভীর রাতে জুসী আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় রীণার বিছানায়। রীণা বাধা দেয় না। নীরবে সে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। সে অভ্যর্থনা জানায় তার গর্ভের পিতৃ-পরিচয়হীন অনাগতের ভাবী জনক-কে। ওরা পরস্পর পরস্পরকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে।

মালিকের দয়ায় তার খামার বাড়ির এক প্রান্তে জুসী আর রীণা একটি জীর্ণ আস্তানা পেলো। সেখানে ওরা ঘর বাঁধলো।

অল্পদিন বাদে কেলীর জন্ম হয়। শৈশব থেকেই ছেলেটি কেমন অদ্ভুত চরিত্রের হয়। তার চালচলন দেখে লোকের মনে সন্দেহ জাগে ছেলেটি বুঝি অন্য কোন পরিবারের।

দু'বছর বাদে জন্ম হলো হীল্‌দা এবং ভেলীর। ওদের দুজনের ক'বছর বাদে আসে লেমি এবং মারতি। ইতিমধ্যে জুসীর অবস্থা ফিরেছে। তার নিজস্ব গরু এবং ঘোড়া হয়েছে। হয়েছে তার কিছু নিজস্ব জমি। কিন্তু রীণার অমিতব্যয়িতার জন্য সংসারে স্বচ্ছলতা হয় না। জুসীর কোন সঞ্চয় হয় না। সে পয়সা চোখে দেখে না।

একদিন কেলীর প্রচণ্ড আঘাতে ভেলী পঙ্গু হল। চিকিৎসার

ত্রুটি হ'লো না। তবুও কিন্তু ভেলী বাঁচলো না। জুসী ধন এবং জন দু-ই হারাল।

একটু বড় হলে কেলীকে পাঠান হলো শহরে—রোজগারের জন্য। গাঁ ছেড়ে হীল্‌দাও দূরে চলে যায় একটি চাকুরী নিয়ে। কদিন বাদে মেয়েটি সেখানে জলে ডুবে মারা যায়।

এদিকে রীণা ক্ষেতে কাজ ক'রে আর পর পর সন্তানের জন্ম দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একদিন কি একটা অজানা কঠিন স্ত্রীরোগে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে সে মারা গেল।

জুসী বৃদ্ধ হয়েছে স্বাস্থ্যও ভেঙ্গেছে। চাষের কাজ করবার এখন আর তার শক্তি নেই। মাঠে সে আর বিশেষ যায় না। ছোট ছেলে দুটি যাহোক করে কাজ চালায়। তার অবৈধ বড় ছেলে কেলী শহরে গাড়ী চালায়। জুসী গাঁ ছেড়ে দূরে যায় না।

একদিন শহর থেকে কেলী তার বাবাকে কয়েকটি খবরের কাগজ পাঠিয়ে দিলে। ভয় আর উত্তেজনার সঙ্গে সে কাগজ একজনকে দিয়ে পড়িয়ে জানল—যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) ফলে সর্বত্র শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছে। চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ সর্বত্র সাধারণ কাজের সময়ের বরাদ্দ এখন ষোল থেকে বারো ঘণ্টা করেছে। শ্রমিকরা আরও সুযোগ আদায় করবার জন্য লড়ছে।—ক্রমে এ খবর ছড়িয়ে গেল সমস্ত গাঁয়ে, শুনল তার সব শ্রমিক আর চাষী ভাই।

জুসীর কথা বলার ভঙ্গীটি ছিল সুন্দর। তার স্পষ্ট আর যুক্তিপূর্ণ উক্তির জন্য সে অঞ্চলে জুসীর সুনাম ছিল। ফিনল্যাণ্ডের সে অঞ্চলে সমাজতন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা এলে তার গুণের জন্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে জুসী মনোনীত হয়েছিল।

ধর্মঘটের ঢেউ থেকে সে অঞ্চল রেহাই পেলনা। ধর্মঘট শুরু হলে ঐ অঞ্চলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমাজতন্ত্রীরা যথাসম্ভব চারদিকে

প্রহরীর ব্যবস্থা করলো। তাদের নির্দেশে অনুগত জুসী হল পৈতুলার সশস্ত্র প্রহরী।

সকলেই জানে ধর্মঘট মিটে যাচ্ছে। জুসী এ খবর জানে না। সে তার কর্তব্যে অটল। তখনও সে তার বন্দুকটি হাতে নিয়ে তার নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সরকার এ অঞ্চলের ক্ষমতা ফের হাতে পেয়েছে। সমাজতন্ত্রী দল যে যার প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। যাবার সময় তারা পৈতুলা অঞ্চল লুঠ করলো। শুধু তাই নয়, সেখানের একজন জোতদারকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে যায়।

প্রহরী জুসী এসব খবরও জানে না। তাকে কেউ জানাবার প্রয়োজন বোধ করে নি।

জুসী তার দলের কাউকে দেখেনা। চারিদিক নিস্তব্ধ। তার মনে কেমন সন্দেহ জাগে। সেখানেই বন্দুকটি ফেলে রেখে সে তার বাড়ি ফিরে আসে।

ঠিক সেই সময় সরকারের তরফ থেকে লোক এল জুসীর সন্ধানে। জুসীর বদলে তারা দেখল দুটি ক্ষুধার্ত শিশু অসহায় ভাবে বসে বসে কাঁদছে।

তারা এগিয়ে গিয়ে জুসীর সন্ধান পেল কোন এক গোলাঘরে। তাদের সাড়া পেয়ে বেচারী ভয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল। সেখানে সে গিয়েছিল তার ক্ষুধার্ত শিশু দুটির মুখে তুলে দেবার জন্য দু'মুঠি অন্ন আনতে।

আসামী জুসীকে তারা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বিমূঢ় জুসী জানল না তার অপরাধ। যাবার আগে বেচারী তার শিশু দুটিকে একবার দেখে যাবারও অনুমতি পেলনা।

নির্ধারিত সময়ে বিচার শুরু হয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে সরকারের

তরফ থেকে অনেক কিছু বলা হলো। জুসীর কিছুমাত্র তা বোধগম্য হয় না। তার কথা শুনবার জজসাহেবের সময় কোথায়? তাঁর অনেক কাজ!

গুরুতর অপরাধে অপরাধী তেরোজনের সঙ্গে জুসীও তাড়া খেয়ে এগিয়ে যায় উন্মুক্ত বধ্য-ভূমিতে।

হুকুম মত চৌদ্দজন এক সারিতে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর গুলি-বিদ্ধ হয়ে একই সঙ্গে সেই চৌদ্দটি রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাদের কেউ আর উঠলো না। জুসীও না।

যাত্রী

ডেনমার্ক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক জোহানেস ভিলহেম জেনসেন (Johannes Vilhelm Jensen)-এর 'দি লঙ্গ জারনি' (The Long Journey), ১৯২৩-২৪, ছ'খণ্ড উপন্যাস মালার সারাংশ।

প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগের কথা। উত্তর দিক থেকে তখনও তুষারস্রোত বইতে সুরু করেনি।

আজকাল যেখানে য়ুরোপদেশটি সরগরম হয়ে উঠেছে, সেই সমস্ত জায়গাটি জুড়ে তখন বনমানুষের দল ঘুরে বেড়াত। তারা ঘুরে বেড়াত ভয়ে ভয়ে। শুধু বনজঙ্গলের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়ে নয়— আদিম বর্বর বন্যদলপতিদের বিভীষিকাও কম ছিল না।

সেই ভয়ার্ত ভ্রাম্যমান বনমানুষের দলে একটি শিশুর জন্ম হল। শিশুটি ক্রমে বালক হ'ল। বালকটির আকৃতি এবং প্রকৃতি হল একটু স্বতন্ত্র, দলছাড়া।

'গুণাঙ্গ এপি' নামে বিরাট আগ্নেয়গিরিটি ছিল সেই বিশাল বন-জঙ্গলের মধ্যেই। অগ্ন্যুৎপাত না হলেও তখনও সেটির ভিতরের আগুন পুরোপুরি নেভেনি।

বালকটি একাকী ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা জাগে আগ্নেয়গিরিটির শিখরে উঠতে। সে এগিয়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তার শিখরের দিকে। আরও এগিয়ে গিয়ে বালকটি ঘুরতে থাকে—আগ্নেয়গিরিটির ঢালু দিকটায়।

হঠাৎ সেই আগ্নেয়গিরিটি থেকে বালকটি কি করে আগুন জ্বালতে শিখল। বালকটির নাম হল অগ্নিকুমার (Fire)।

এই আগুন থেকে অগ্নিকুমার তার খাবারের জন্য কাঁচা মাংস ঝলসাতে শিখল। শিখল সে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার থেকে নিজের দেহকে উত্তপ্ত রাখার কৌশল।

আগুনের ব্যবহার জানবার ফলে অগ্নিকুমারের গুরুত্ব বেড়ে যায়। আগুনকে সে পরম দেবতা বলে বরণ করে নেয়।

অগ্নিকুমার কখনও বা গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায় সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে। একদিন তার গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে ক'জন বন্য নারী এগিয়ে আসে গায়কের দিকে। তার দর্শনে নারীরা হল মুগ্ধ। নারী ক'টি বরণ করে নেয় তার দাসীত্ব। ক'দিন বাদে অগ্নিকুমারকে তারা উপহার দিল সন্তান। এলো শিশু।

অগ্নিকুমারের ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে কিছু বনপুরুষ এগিয়ে এসে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। দলপতি অগ্নিকুমার অনুচরদের শেখাল তীর ধনুকের ব্যবহার। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সে তাদের দেখাল গুহা। অগ্নিকুমারের নেতৃত্বে ক্রমে গড়ে ওঠে ছোটখাটো একটি শিকারীদল।

দলটি নিয়ে যেখানেই সে যাক না কেন, জ্বলন্ত কাঠের মাধ্যমে গৃহদেবতা অগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুল করে না অগ্নিকুমার।

আগুন, পাথর আর কাঠের আশ্চর্য ব্যবহারের ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে বনের আরও অনেক অধিবাসী এসে অগ্নিকুমারের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ে। তার দলভুক্ত হয়ে তারা হয় ধন্য।

অগ্নিকুমারের দিন কাটছিল সুখে। কিন্তু সে সুখ তার বরাতে সইল না বেশীদিন। একদিন দেবতা তাঁর দানের বিনিময়ে অগ্নি-কুমারের থেকে বুঝি চাইল প্রতিদান।

সেদিন দলের লোকেরা বড় করে আগুন জ্বালাল। তারপর তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দেবতার কাছে আহুতি দিল দলপতি অগ্নিকুমারকে।

অগ্নিকুমার মারা গেল। কিন্তু তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রতীক পিছনে থেকে গেল অমর হয়ে।

এ ঘটনার পর ক'যুগ কেটে গেল। 'গুণাঙ্গ এপি' আগ্নেয়গিরি তখন নিভে গেছে। উত্তর দিক থেকে তুষারস্রোতের প্রবাহ বইতে সুরু করেছে। ক্রমে সে স্রোত বনজঙ্গল এবং উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে।

ছোট্ট একটি শিকারীদল কি করে তখনও সেই জঙ্গলে গুটিসুটি মেরে বাস করছিল। এবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার তাড়নায় বনের জীবজন্তুর সঙ্গে এই শিকারী দলটিও দক্ষিণে পালিয়ে যায়।

কার্ল ছিল এই দলেরই একজন। কার্ল আগুনকে ঠিক অতটা ভয়ের চক্ষে দেখত না। সে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল কিছুটা।

একদিন কার্ল কি করে দলচ্যুত হয়। সেই সঙ্গে আগুনকেও সে হারাল। ঘুরতে ঘুরতে কার্ল দক্ষিণ থেকে আবার উত্তর প্রান্তে এসে আস্তানা নিল। সে পশুর চামড়া আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করতে শিখল। তাই দিয়ে প্রচণ্ড শীতের কবল থেকে সে তার দেহকে রাখে উত্তপ্ত। কখনও বা মাটি খুঁড়ে গর্ত করে বা পাথরের পর পাথর সাজিয়ে ঘরের মত বানিয়ে মাথা গোঁজে।

যতদূর নজর যায় কার্ল দেখে শুধু বরফ আর বরফ। সে বোঝে তাই এত ঠাণ্ডা। শীত বা শীত নামক শত্রুকে সে খুঁজে বেড়ায়। কোন ফল হয় না।

ক'দিন বাদে সে দেখা পেল একটি কুকুরের। অগত্যা সেই কুকুরটির সঙ্গেই সে পাতাল মিতালি।

শীতের শেষে কার্ল গড়ে তুলল একটি মজবুত আশ্রয়। বনের

জীবজন্তু তার খাদ্য। কখনও বা স্বজাতির মাংস পেলে সে মুখ বদলায়।

একদিন একটি মানুষ দেখে কার্ল তাকে তাড়া করে। শিকার হাতে এলে সে দেখল তার আকৃতি ভিন্ন ধরণের। তাকে দেখে কার্ল কেমন আকর্ষণ বোধ করে। সেটি ছিল স্ত্রীলোক। শিকারটি তার খাদ্যরূপে ব্যবহার হল না। সে হল তার সঙ্গিনী। শ্রীমতী ম্যাম হল কার্লের ঘরণী।

শ্রীমতী ম্যাম কার্লকে শুধু সন্তানই উপহার দিল না। ম্যামের গুণে হল তার স্থিতি, হল সঞ্চয়। ক্রমে কার্লের গড়ে ওঠে একটি ছোট্ট সংসার। দূর হল তার যাযাবর স্বভাব। শ্রীমতী ম্যাম কার্লের পাতে দিল সব্জী। খাদ্য হিসাবে এখন ওরা শুধু আর মাংস খায় না —সঙ্গে থাকে নানা শাক, সব্জি।

আগুনকে হারালেও কার্ল তার ব্যবহার ভোলেনি। একদিন একাগ্র চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে দুটি পাথর ঠুকে ঠুকে সে জ্বালাল আগুন। তার স্ত্রী এবং শিশুদের কার্ল শেখাল আগুনের ব্যবহার। আগুনের সাহায্যে নারীরা শিখল রাঁধতে আর মাটির বাসন তৈরী করতে।

উত্তরকালে কার্লের বংশধরদের থেকে সৃষ্টি হয় একদল পুরোহিত শ্রেণী। তাদের মধ্যে শ্বেতভল্লুক (White Bear) ছিল উদ্ধত প্রকৃতির।

একদিন একজন স্বজাতি হত্যার অপরাধে শ্বেত ভল্লুক সমাজচ্যুত হয়ে সঙ্গিনী হিসাবে মে-কে নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

শ্বেত ভল্লুক শ্রীমতী মে-কে নিয়ে সমুদ্রের তীরে এসে ঘর বাঁধে। সে সেখানে ছোট ছোট নৌকা তৈরী করে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে সেই নৌকায় করে শ্বেত ভল্লুক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

শ্রীমতী মে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষেতের কাজ করে আর করে গৃহপালিত পশুর তত্ত্বাবধান।

শ্বেত ভল্লুক ক্রমে ঘোড়াকে কাজে লাগাতে শেখে। ঘোড়াকে দিয়ে সে দিব্যি গাড়ি টানায়।

শ্বেত ভল্লুকের ছেলেরা হয় পিতার চেয়েও দুঃসাহসী। তারা ঘোড়ায় চড়তে শিখল। ছেলেদের ভিতর আবার নেকড়ে (Wolf) ছিল বেশী ডানপিটে। ঘোড়া হল তার পরম প্রিয়। একদিন তার প্রিয় ঘোড়াটির পিঠে চেপে নেকড়ে উধাও হয়ে গেল। সে হল যাযাবর।

আরও এক যুগ পরের কথা। এল নরনা জেস্ট। এল সে কোন মাতৃশাসিত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। তরুণ জেস্ট আস্তানা নিল কোন একটি দ্বীপের মাঝে, সমুদ্রের কূলে।

গাছের গুঁড়ি খুদে জেস্ট তৈরী করল একটি ছোট্ট ডিঙ্গী। সঙ্গী হিসাবে সে সংগ্রহ করল একটি তরুণীকে। তারপর সেই ডিঙ্গীতে চেপে জেস্ট পাড়ি দিল অ-জানা দেশের উদ্দেশ্যে।

ভাসতে ভাসতে জেস্ট আবিষ্কার করল এক নতুন দেশ। আজ যে দেশের নাম হয়েছে ‘সুইডেন’। সেখানে তাদের হল সন্তান। সপরিবারে সেদেশে কিছুদিন কাটিয়ে জেস্ট আবার ফিরে এল তার পুরানো আস্তানায়—সেই দ্বীপে।

দ্বীপে ফিরে এসে জেস্টের জুটে গেল ক'জন সঙ্গী। তাদের সঙ্গে নিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ে জলপথে ; এবার জেস্ট তার নৌকায় পালের ব্যবহার শেখে। শেখে সে বৈঠা বা দাঁড়ের ব্যবহারও। জলপথে সঙ্গীদের নিয়ে সে ঘুরে ফেরে বহু অজানা জায়গায়।

বহু বছর কেটে গেছে। জেস্টের সঙ্গীরা সকলে একে একে গত হয়েছে। জেস্ট কিন্তু তখনও ছিল শক্তিশালী, কর্মঠ। জেস্ট যে পেয়েছিল ইচ্ছামৃত্যুর বর। তার সঙ্গে ছিল একটি জ্বলন্ত মোমবাতি, তার জীবনের প্রতীক।

কোন একদিন ঘুম থেকে উঠে জেস্ট নিজেকে আবিষ্কার করল কোন এক আজব দেশে। সেখানের লোকগুলি ছিল অদ্ভুত—হয় তারা ক্রীতদাস নয়ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর। জেস্ট তাদের কথাবার্তা আর চালচলন বুঝে উঠতে পারে না।

আরও মজার কথা ঃ জেস্ট দেখে, একজন কুৎসিত চেহারার ক্রীতদাসীকে তার স্ত্রীরূপে। জেস্ট ভেবে পায় না, তা কি করে হল সম্ভব। ঘৃণায় তার মন ভরে ওঠে।

এই আজব দেশে জেস্ট খেই হারিয়ে ফেলে। বিভ্রান্ত জেস্ট এক দিন ক্রীতদাসী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তার আগেকার আবিষ্কৃত জায়গাটির (সুইডেন) উদ্দেশ্যে নৌকায় উঠে পাল তুলে দেয়।

সে দেশে পৌঁছে জেস্ট তাকিয়ে থাকে অবাক বিস্ময়ে। ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হয়েছে আরও অনেক লোক।

চারিদিকে শুধু বিশৃঙ্খলা। নিজের শক্তি এবং প্রতিভার বলে ক'দিনের মধ্যেই জেস্ট সেখানের অধিকারীর আসন পেল। জেস্ট সেখানে তাদের শেখাল কঠিন ধাতু গলাবার পদ্ধতি। ক্রমে তারা শিখল সে ধাতু ব্যবহার করবার কৌশল। এল লৌহ যুগ।

জেস্টের নেতৃত্বে সেখানে তারা বাঁধল নতুন ঘর। তাদের ঘরে ঘরে এল গৃহপালিত পশু—গরু, ঘোড়া আর ছাগল।

সে জায়গায় শুরু হয় বিবাহ পদ্ধতি। আসে সন্তানের দল। ক্রমে উপনিবেশটি গড়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে জেস্ট তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

জেস্টের স্ত্রী একদিন মারা গেল। ফলে, জেস্ট মনে অনুভব করে একটা বিরাট শূন্যতা। সে বোধ করে না আর কোন আকর্ষণ সেই উপনিবেশের ওপর।

চুপি চুপি ঘর ছেড়ে জেস্ট বেরিয়ে যায়। পিছনে পড়ে থাকে তার সৃষ্টি বর্তমানের 'সুইডেন'। সে খুলে দেয় তার ডিঙ্গীর বাঁধন—

ডিঙ্গী এগিয়ে চলে মধ্য য়ুরোপকে পিছনে ফেলে—ডানুব নদীর বুক বেয়ে। মেডিটেরিনিয়ান উপত্যকার পাশ দিয়ে জেস্ট আরও এগিয়ে যায় দক্ষিণ দিকে।

চলতে চলতে জেস্টের মনে পড়ে এইখানেই প্রস্তর যুগের গোড়াতে শুরু হয়েছিল তার জীবন। দক্ষিণের এ দিকটায় সে কিসের যেন অভাব বোধ করে। তবুও সেই মাতৃভূমির জন্য জেস্টের মন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সে কেমন কবিসুলভ ভাবালু হয়ে ওঠে। জেস্ট আর এগিয়ে যায় না।

শূন্যমনে ঘুরতে ঘুরতে জেস্ট এসে হাজির হল জুটল্যাণ্ডে। স্থানীয় দলপতি টোল জেস্টকে জানায় সাদর অভ্যর্থনা।

টোল পেল জেস্টের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়। সে জানল জেস্টের লৌহ ব্যবহারের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা। ফলে, টোলের কাছে তার মর্যাদা বেড়ে যায়।

টোলের তত্ত্বাবধানে জুটল্যাণ্ড অধিবাসীদের ছিল একটি কাঠের বিগ্রহ—তাদের একমাত্র দেবতার মূর্তি। টোলের অনুরোধে সে বিগ্রহটিকে জেস্ট ব্রোঞ্জের মূর্তিতে রূপান্তরিত করে।

বসন্তের আগমনে নতুন মূর্তিটিকে উদ্বোধন করা হল খুব ধূমধাম করে। আরাধ্য দেবতার পূজার উপচার হিসাবে বলি হল কয়েকটি ক্রীতদাস। উৎসব শেষে জেস্ট আবার বেরিয়ে পড়ে। এবার সে এগিয়ে যায় পদব্রজে।

বছর ঘুরে যায়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ জুটল্যাণ্ডকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে। স্থানীয় উপজাতিরা প্রাণের ভয়ে সেদেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে আরাধ্য দেবতার বিগ্রহটিকে নিয়ে যেতে তারা ভুল করে না। পিছনে থেকে যায় শুধুমাত্র বৃদ্ধ টোল।

এই ভয়ার্ত উপজাতির দল যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায় মধ্য এবং

দক্ষিণ য়ুরোপের ভিতর। দলটি এবার কীমব্রীয়ান উপজাতি নামে পরিচিত হল। চলার পথে বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও উপজাতি এসে এদের দলভুক্ত হল।

আস্তানার জন্য মনের মতো জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এই দলটি এক সময় এসে হাজির হল রোম নগরের সীমান্তে। যাযাবরদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে সে দেশের ওপর।

রোমানরা উপজাতিদের হুমকি দেয়, তাদের ফিরে যেতে নির্দেশ করে। কোন ফল হয় না।

স্বজাতির বিপদের খবর পেয়ে উত্তর দিক থেকে আরও উপজাতি ছুটে আসে কীমব্রীয়ানদের সাহায্যের জন্য। মিলিতভাবে অতর্কিতে এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে রোম দেশের ওপর।

শত্রুদের এই আক্রমণের জন্য রোম প্রস্তুত ছিল না। তারা হল বিভ্রান্ত। তারা পারল না এই ছন্নছাড়া যাযাবরদের গতিরোধ করতে।

গর্ব আর আনন্দের উচ্ছ্বাসে কীমব্রীয়ানরা রোমান সেনাপতিদের রণকৌশলের কথাটি ভাববার অবকাশ পায় না। উচ্ছৃঙ্খল ভাবে তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে—হৈ হল্লায় মেতে ওঠে।

এই সুযোগে রোমান সেনাপতিরা উপজাতিদের করল পাল্টা আক্রমণ। তারা হল সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। হত হল বিপুল সংখ্যক। বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক করল আত্মহত্যা। বাকী বন্দীদের রোমানরা বেচে দিল ক্রীতদাস হিসাবে তাদের সম্প্রদায়ের ভিতর। ক্রমে এদের রক্ত মিশে যায় বিজয়ী রোমানদের মধ্যে।

নয়না জেস্টও ছিল সেই আক্রমণকারী উপজাতিদের মধ্যে একজন। বেগতিক অবস্থা বুঝে সে কোন ফাঁকে সরে পড়েছিল সেখান থেকে।

জীবনের ওপর জেস্টের বিতৃষ্ণা এসে যায়। জেস্ট উপলব্ধি করল,

দুনিয়াতে বড্ড বেশী দিন সে থেকেছে। সে স্থির করে, নিভৃতে সমুদ্রের বুকে বসে তার জীবনের দীপটি এবার জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে। সেই জ্বলন্ত মোমবাতিটি হাতে নিয়ে জেস্ট ডিঙ্গীটিতে উঠে পড়ে। ধীরে ধীরে ডিঙ্গীটি এগিয়ে যায় সেই অন্তহীন বিশাল সমুদ্রের মাঝে।

এদিকে রোম সাম্রাজ্য পতনের পর উত্তর দিক থেকে অসভ্য বর্বর উপজাতিগুলি ধীরে ধীরে নেমে আসে সেখান থেকে। তারা ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। ক্রমে তারা হয় খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত।

সেখান থেকে আসবার সময় তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটি প্রাচীন জাহাজ। জাহাজটিকে উল্টো করে বসিয়ে দিল তারা মাটির ওপর। সেটি রূপান্তরিত হল একটি গথিক ধর্মমন্দির রূপে। সৃষ্টি হল গির্জা।

উত্তর দিক থেকে আগত ঐ অসভ্য উপজাতির থেকে ক্রমে গড়ে উঠল ল্যাঙ্গেবার্ডস্ (প্রথম সভ্য জাতি) নামে এক নতুন সম্প্রদায়।

ক্রীসটোফার কলোম্বাস ছিলেন এই ল্যাঙ্গেবার্ডস্ সম্প্রদায়ের একজন উত্তরাধিকারী। উত্তরকালে যিনি হয়েছিলেন বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতির প্রথম দূত। যাঁর প্রচেষ্টায় হয়েছিল সমুদ্রের অপর পারের নতুন দেশবিদেশের বিস্ময়কর আবিষ্কার।

কলোম্বাস নিজেকে মনে করতেন সত্যের প্রতীক। যীশুর মহিমা প্রচার করতেই তাঁর আবির্ভাব।

সমুদ্রযাত্রার আগে তাঁর সঙ্গীরা যখন মদ্যপানোৎসবে মত্ত, কলোম্বাস তখন আত্মসমাহিত হয়ে গীর্জায় ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করেন। তাঁর ছিল ঈশ্বরের ওপর অগাধ বিশ্বাস। আস্থা ছিল

তাঁর মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্যের ওপর। ছিল তাঁর নেতার উপযুক্ত শক্তি এবং সাহস—যে অমানুষিক শক্তি তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঘাটে এসে এক সময় তাঁর জাহাজ ভিড়ল। কলোম্বাস জেনে অবাক হন তাঁর আগেই কে সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কলম্বাস হন আশাহত। অগত্যা তাঁকে তাঁর দলের দলপতি পদটি নিয়ে সুখী থাকতে হয়।

আশ্চর্য, কলোম্বাসের উত্তরকালে দুঃসাহসী দু'জন নেতা—কর্টেজ এবং পিজারো সেই জায়গায় য়ুরোপ সভ্যতা বিবর্তনের জন্য পান বাহাদুরী।

অবশ্য উক্ত নেতা দু'জনকে প্রস্তর যুগের শেষ উপজাতিদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। তাদের নিতে হয়েছিল অনেক বিপদের ঝুঁকি। আমেরিকায় তখনও অসভ্য উপজাতিদের দল স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরছিল। তাদের দৌরাত্ম্যে তখনও সেখানে য়ুরোপের সভ্যতা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে নি।

কর্টেজ মেক্সিকোতে গিয়ে দেখতে পান তারা সেখানে আগ্নেয়-গিরির পূজা করে। সে পূজার উপচার ছিল নরবলি।

কলোম্বাস নতুন জগতের যেখানেই যেতেন সেখানেই দেখতে পেতেন আলো আর আগুনের ব্যবহার—আগুনের পূজা সর্বত্র।

এদিকে শ্বেতাঙ্গদের দেখে রেড ইণ্ডিয়ানরা প্রথমে ভেবেছিল বুঝি তাদের উপাস্য দেবতা সূর্য নেবে এসেছেন। কে জানে তারা নয়না জেস্টকেই প্রথমে দেখেছিল কি না?

কিন্তু তাদের সেই বিভ্রম কাটতে বেশী সময় লাগেনি। ফলে, গোড়াতে য়ুরোপ থেকে যারা সভ্যতার নিশান নিয়ে সেখানে এগিয়ে গিয়েছিল তাদের অনেকেই মেক্সিকোবাসীর উপাস্য দেবতার বেদীতলে

হয়েছিল বলি। শুধু মেক্সিকোতে নয় তখন দক্ষিণ য়ুরোপের অবস্থাও ছিল তাই।

নতুন জগতের সঙ্গে প্রথম সংঘাত শুরু হয়েছিল এই মেক্সিকোতে। এখানে হয়েছিল আদিম অসভ্য আর সভ্যসমাজের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই। ফলে, য়ুরোপের সভ্যতার অগ্রগতি বাধা পায়, আর এগিয়ে যেতে পারেনি।

উত্তর দিকে কিন্তু সভ্যতার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় রেড ইণ্ডিয়ান বাধাকে। ওদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ব্যাপক মহামারী রোগের ফলে সেখানকার অধিবাসীরা সব দলে দলে মাছির মত মারা যায়। নতুন সভ্যতা ধুয়ে দেয় সেখানকার সব মালিন্য।

মেক্সিকোতে তখনও লড়াই শেষ হয় নি। কর্টেজ-এর নেতৃত্বে তার সৈন্যেরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঈগল পাখি সাপের ওপর। অসভ্য হিংস্র বিষধর সাপের তেজও কম নয়। তারা হার মানতে চায় না।

কিন্তু এক সময় তাদের হার মানতে হল। হার মানতে হল তাদেরই একজন স্ত্রীলোকের মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার ফলে।

বহু বছর কেটে গেল। এলেন এক নবীন যুবক, প্রাণি-বিজ্ঞানী ডারউইন্। তিনি এলেন মানুষের অতীত যাত্রাপথ থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ইঙ্গিত নিয়ে।

তাঁর সমকালীন লোকেরা দেখলে যেন এক অভিশপ্ত নাবিক (Flying Dutchman) এগিয়ে চলছে সমুদ্রের বুক বেয়ে অনন্ত যাত্রার পথে। তারা ভাবে, হয়ত তাকে চিরদিনই চলতে হবে এইভাবে মানুষের অনন্ত যাত্রার দূত হয়ে। কিম্বা, সে জানিয়ে যাচ্ছে মানুষের সমাপ্তি পথের ইঙ্গিত।

কালের গতির কথা কে জানে ?

সিদ্ধার্থ

জর্মন সাহিত্যের দিকপাল হেরমান হেস্ (Hermann Hesse)-এর 'সিদ্ধার্থ' (Sidhartha), ১৯২৩, উপন্যাসটির গল্পরূপ।

ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থ বয়সে তরুণ, জ্ঞানে বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে দীপ্ত। এর মধ্যেই সে সুপণ্ডিত পিতা এবং অন্যান্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আচার্যের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বৃহৎ অংশ লাভ করেছে ; তাই নিয়ে আবার তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়, তা ব্যাখ্যা করে বন্ধু গোবিন্দর কাছে। সেই সঙ্গে সিদ্ধার্থ অভ্যাস করছে একাগ্র চিন্তা ও ধ্যানের। কুম্ভকের সাহায্যে শব্দশ্রেষ্ঠ 'ওম্' নিঃশব্দে উচ্চারণ করবার কৌশলটাও ইতিমধ্যেই সে আয়ত্ত করেছে।

পুত্রের ধীশক্তি ও অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা দেখে পণ্ডিত পিতার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়, ভবিষ্যতের সিদ্ধার্থকে কল্পনা করে তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ছেলের চলা, বলা, ওঠা, বসা দু'চোখ ভরে দেখে দেখে মায়ের মন গর্বে ভরে ওঠে।

সৌম্যদর্শন সিদ্ধার্থ সকলের প্রিয়, সকলের আনন্দের উৎস। সে সকলকে আনন্দ দেয়, দেয় সুখ। কিন্তু তার নিজের মনে সুখ নেই। তার মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তির বীজ দানা বেঁধে ওঠে। সংসার তার কাছে বিস্বাদ ঠেকে, সে-জীবন অসহ্য বেদনা। জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রপাঠ এবং যাগযজ্ঞ কিছুই তাকে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না।

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করে একদিন গৃহত্যাগ করল। তার সঙ্গ নিল বন্ধু গোবিন্দ। বনে এসে সিদ্ধার্থ প্রবীণ সাধুদের আদর্শে সকল

প্রকার কঠোর তপশ্চর্যায় পারদর্শী হয়। কিন্তু তবুও সে তার উত্তর খুঁজে পায় না—জীবনের উদ্দেশ্য কী বা জীবন অনিবার্যরূপে যে বেদনার বোঝা নিয়ে আসে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কোন পথে?

গভীর বনে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রায় তিন বছর কাটাবার পর নানা জায়গা থেকে গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাদের কানে ভেসে আসে। বুদ্ধের অনুসন্ধান করতে করতে দুই বন্ধু—সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ একদিন শ্রাবস্তী-পুরীতে এসে পৌঁছল।

বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভাল লাগল কিন্তু তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করতে পারল না সিদ্ধার্থ। গ্রহণ করতে পারল না তাঁর উপদেশ। গুরুবাদে সিদ্ধার্থের আস্থা নেই। তাই সিদ্ধার্থ তাঁর থেকে দূরে সরে আসে। কিন্তু সে উপদেশে মুগ্ধ হয়ে বন্ধু গোবিন্দ গৌতম বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থেকে গেল সেখানে।

ভাবনায় ডুবে এগিয়ে চলে সিদ্ধার্থ। সে পথ বিস্তৃত, অনন্ত। নানা প্রশ্নের ভিড় করছে তার মনে। চলতে চলতে সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল—এতদিন সে দার্শনিক-তত্ত্বের জটিল জালে আত্মাকে বন্দী করে রেখেছিল। অস্বীকার করেছিল ব্যক্তি সত্তাকে। কিন্তু অনুভূতি দমন করে শুধু তত্ত্বচিন্তা ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। অনুভূতি ও ধ্যান দু'য়েরই মূল্য আছে, আছে উভয়েরই প্রয়োজন; জীবনের চরম অর্থ লুকানো আছে এ দু'য়ের মধ্যে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি উভয়ের দাবীকেই মেটাতে হবে। সিদ্ধার্থ এগিয়ে চলে। সন্ন্যাস ধর্মের প্রতি তার আস্থা শিথিল হয়।

জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস ধর্ম ত্যাগ করে ফিরে এল লোকালয়ে। এতদিন সাধনা করেছে শুধু

বৈরাগ্যের, এবার স্থির করল সে স্বাদ নেবে সংসার জীবনের আনন্দ-বেদনার।

নদী পার হয়ে নগরে এসে রূপোপজীবিনী কমলার কাছ থেকে প্রেমের প্রথম পাঠ নিল। তার-ই সাহায্যে হল সিদ্ধার্থের বিপুল ঐশ্বর্য, সে পেল যশ ও প্রতিষ্ঠা। সিদ্ধার্থ ভুলে গেল তার বিগত জীবন, ডুবে গেল কমলার প্রেমে।

সেদিন কমলা দীর্ঘক্ষণ সিদ্ধার্থের সঙ্গে প্রেমের নানা খেলা খেলল। তাকে বাধা দিল, অভিভূত করল, করল জয়—আর সেই জয়ের আনন্দে সে উঠল উচ্ছলিত হয়ে। পরাজিত, অবসন্ন সিদ্ধার্থ পড়ে থাকে কমলার পাশে।

কমলা ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখল সিদ্ধার্থের ক্লান্ত মুখখানা। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল,—সিদ্ধার্থ, তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। এমন আর কাউকে পাইনি জীবনে। তুমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ…। একদিন যখন বয়স বাড়বে, তোমার ছেলে যেন আমার কোলে আসে। দুঃখের বিষয়, এত প্রেমের খেলা, তবুও প্রিয়তম, তুমি সেই শ্রমণ-ই রয়ে গেছ…।

সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল যেন তার খেলা শেষ হয়েছে। আর সে পারবে না এই ক্লান্তিকর খেলা খেলতে। তার দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল, কি যেন মরে গেল তার মধ্যে। সেই মৃত্যুর শেষ বিক্ষেপ সিদ্ধার্থকে নাড়া দিয়ে যায়।

সেই রাত্রেই সিদ্ধার্থ পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্রের মত সব কিছু ত্যাগ করে কোথায় চলে যায়। কেউ তাকে আর খুঁজে পেল না। সে আর ফিরে এল না ঐ নগরে।

হাঁটতে হাঁটতে সিদ্ধার্থ সেই নদী তীরে এসে থামল। খেয়াঘাটের বৃদ্ধ পাটনীর আমন্ত্রণে সে স্থির করে, বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে মাঝির জীর্ণ কুটিরে। এতদিনে সে তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেল বৃদ্ধ মাঝি বাসুদেব ও নদীর কাছ থেকে।

বাসুদেব লক্ষ্য করল, সিদ্ধার্থের দুই চোখ জ্ঞানের প্রশান্ত দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ জানে, কামনার দ্বন্দ্ব যে জয় করেছে, যে মুক্তিলাভ করেছে, ডুব দিয়েছে সৃষ্টির ঐক্যানুভূতির মধ্যে, শুধু তার মুখেই এমন দীপ্তি সম্ভব।

আশীর্বাদের ভঙ্গীতে স্নেহকোমল কণ্ঠে বৃদ্ধ বাসুদেব বলল, 'বন্ধু, এই শুভ মুহূর্তটির জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। এবার আমি বিদায় নেব।'

সিদ্ধার্থ নত হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল বাসুদেবকে।

তারপর বহু বছর কেটে গেল। সিদ্ধার্থ এখন বৃদ্ধ, খেয়া ঘাটের পাটনীর কাজ করে। বিশেষ জ্ঞানী বলে লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে। খবর শুনে ব্যগ্র হয়ে ভিক্ষু গোবিন্দ ছুটে এল একদিন এই বৃদ্ধ মাঝির কাছে।

—ভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীদের প্রতি তোমার সহানুভূতির শেষ নেই…। আমাদের মত তুমিও কি ঠিক পথ খুঁজে বেড়াচ্ছ না ?

সিদ্ধার্থের ক্ষীণ চোখে হাসি ফুটে ওঠে। বলল, পূজনীয় শ্রমণ, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, তবুও কি তুমি খুঁজেই বেড়াচ্ছ ?

গোবিন্দ দুঃখের সঙ্গে জানায় তার খোঁজার শেষ হয়নি, কখনো হবে বলে তার মনে হয় না। তাকে মাঝির অভিজ্ঞতা বলবার জন্য মিনতি করে।

সিদ্ধার্থ বলল, মনে হয় তুমি বড্ড বেশি খুঁজছ; আর সেই খোঁজার ধান্দায় হারিয়ে ফেলেছ পথের নিশানা। তাই জীবন শেষ হয়ে এল, কিন্তু তবুও পেলেনা কিছুই। তোমার সামনে আছে একটি লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্য তোমাকে করেছে অন্ধ। খোঁজার অর্থ ঃ একটি লক্ষ্য থাকা ; আর পাওয়ার অর্থ ঃ মুক্ত হওয়া, মুক্ত অন্তরে সব কিছু গ্রহণ করতে পারা, নির্দিষ্ট লক্ষ্য না-থাকা।

গোবিন্দ, আজকের রাতটা তুমি আমার কুটীরে থেকে যাও।

বিস্মিত হয়ে ভিক্ষু তাকায় পাটনীর দিকে। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,—তুমি সিদ্ধার্থ ?

সিদ্ধার্থের দৃষ্টিতে প্রশান্ত হাসি।

গোবিন্দ বলল, সিদ্ধার্থ আমরা বৃদ্ধ হয়েছি ; এ জীবনে আমাদের হয়ত আর দেখা হবে না। জীবনের বাকী পথ চলবার জন্য কিছু পাথেয় দাও, আমাকে সাহায্য করো, বন্ধু। জীবন সম্বন্ধে তোমার উপলব্ধি বলো।

সিদ্ধার্থের মুখে প্রশান্ত হাসি আবার ফুটে ওঠে। বিনম্র কণ্ঠে সে বলে চলে,—

বন্ধু, জীবনের পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়, অন্যের কাছ থেকে তা জেনে নেওয়া সম্ভব নয়। গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা অর্জন করা যায়, পাওয়া যায় না তাঁর জ্ঞান। যোগ্যতম শিষ্যকেও শিখিয়ে দেওয়া যায় না জ্ঞানের রহস্য। জ্ঞান নিজের সাধনার দ্বারা লাভ করতে হয়। সংসারে দুঃখের গোড়ার কথা হল সময়কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভাগ করে দেখবার চেষ্টা। আসলে কালপ্রবাহ এক ও অবিভাজ্য।

বলতে বলতে একবার উদাস দৃষ্টিতে সামনের নদীর দিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ আবার বলতে শুরু করে,—

নদী উৎপত্তি স্থান থেকে মোহনা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান ; এই জলধারার যেমন অতীত ও ভবিষ্যৎ নেই, তেমনি মহাকালকেও অতীত ও ভবিষ্যতে খণ্ডিত করা সম্ভব নয়। প্রিয় জিনিস হারাবার ভয়ে আমরা কতই না দুঃখ পাই, কিন্তু নদীর জলের মতো বিশ্বের কোন জিনিসই হারায় না। নদীর জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, সৃষ্টি হয় মেঘের। আবার সেই জল নেমে আসে বৃষ্টি হয়ে। জীবনের স্রোত এমনি অবিশ্রাম ধারায় বয়ে চলেছে ; এর মধ্যে পাপ ও পুণ্য, ভাল ও মন্দ, মানুষ ও পশুর মিলন ঘটেছে।

শুনতে শুনতে গোবিন্দ ভুলে যায় সময়ের অস্তিত্ব। এক মহৎ

প্রেমের অনুভূতি তাকে অভিভূত করে। তার গাল বেয়ে নেমে আসে প্রেমের অশ্রুধারা। বক্তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় তার মাথা আরও নত হয়।

বৃদ্ধ সিদ্ধার্থ নির্লিপ্ত কণ্ঠে আবার বলে চলে,—

যে জগতে আমরা বাস করি, যে জগৎ আমাদের চারিদিক থেকে বেষ্টন করে আছে তা তো খণ্ডিত নয়! সম্পূর্ণরূপে সাধু কিংবা পাপী কেউ নয়। জীবন ও মৃত্যু, পাপ ও পুণ্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান,—সবই ভালো। জীবনে এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে; এদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, অস্বীকার তো করা যায় না এদের। জগতের ভালো মন্দ সবকিছু সহানুভূতির চোখে দেখতে হবে। তা হ'লেই জীবনে চলার পথ হবে সহজ, হবে মধুর।

…বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি ঐক্য দেখতে পান, সহস্র ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও সংসারকে যিনি ভালবাসতে পারেন, জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

তার মধুর উক্তি শুনে বিনম্র শ্রদ্ধায় গোবিন্দ মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করল।

জালিয়াত

ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্ (Andre Gide)-এর 'দি কয়নারস্' (The Coiners), ১৯২৫, উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

অত রাত্রে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে অলিভার চমকে ওঠে। সে ভেবে পায়না এই অসময়ে কে এল! ভিতর থেকে অলিভার প্রশ্ন করে,—

—'কে?'

—'আমি বার্নার্ড। দরজা খোল।'

বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনে অলিভার তাড়াতাড়ি সদর দরজা খুলে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

—'বন্ধু, আমি আজ রাতটা তোমার এখানে কাটাতে চাই'—বার্নার্ড-এর কণ্ঠে মিনতি।

'—তা, বেশ তো! কিন্তু তোমাকে যেন একটু আনমনা আর ক্লান্ত মনে হচ্ছে। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে আসোনি তো?'—অলিভারের কণ্ঠে উৎকণ্ঠার সুর।

বার্নার্ড এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। শুধু তার ঠোঁটে ক্ষণিকের জন্য একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে।

অলিভার কি করে জানবে তার বন্ধুর মনের জ্বালা। আজ পুরানো কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে বার্নার্ড-এর হাতে এসেছিল রঙিন খামে পোরা একটি পুরানো চিঠি—তার মায়ের নামে লেখা। প্রেমপত্র। তরুণ মনের কৌতূহল চিরদিনই দুর্জয়। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে বার্নার্ড এক নিঃশ্বাসে পড়েছিল সে চিঠিটা। তা পড়ে বার্নার্ড হয়েছিল স্তম্ভিত, হয়েছিল সে হতবাক্।

নিয়তির একি নিষ্ঠুর পরিহাস ! সতেরো বছর ধরে যাকে সে পিতা বলে জেনে আসছিল, আজ এই একটি চিঠি নিমেষে তা সব মিথ্যা করে দিল। বার্নার্ড জানলে সে ভদ্রলোক তার কেউ নয়, সে তার মায়ের অবৈধ সন্তান। বার্নার্ড আর ভাবতে পারে না।

এ ঘটনা বার্নার্ড-এর মনে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল। বাড়ির আবহাওয়া তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। সেখানে থাকলে যেন তার দম আটকে আসে। গ্লানিতে ভরে ওঠে তার দেহমন ; বার্নার্ড তাড়াতাড়ি তার তথাকথিত পিতার উদ্দেশ্যে একটি রূঢ় চিঠি লিখে রাতের অন্ধকারেই বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

তারপর তার প্রিয় বন্ধু অলিভারের সঙ্গে এই দেখা।

—'বন্ধু, এত কি ভাবছ ? এস, এবার শুয়ে গল্প করা যাক্।' অলিভার বলে চলে,—

'জান, আমার একজন সাহিত্যিক মামা আছেন। নাম—এডোয়ার্ড ! তিনি শুধু সাহিত্যিকই নন, একজন ধনী লোক। মামা আমায় জানিয়েছেন, এখানে এসে তিনি আমার একটা হিল্লে করে দেবেন, অন্য কিছু সম্ভব না হলে তার সেক্রেটারীর পদে আমায় বহাল করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ইংলণ্ড থেকে কাল সকালের গাড়ীতেই মামা এখানে এসে পৌঁছবেন। তা মামাকে অভ্যর্থনা জানাতে আমাকেই যেতে হবে। দাদা ভিনসেণ্টের সময় কোথায় ? বুঝলে কিনা, ভিনসেণ্ট কিছুদিন থেকে লোরা নামে একজন বিবাহিত নারীর সঙ্গে প্রেম করছে। একথা কিন্তু তুমি আর কাউকে বলো না। বুঝলে ?'

বার্নার্ডের কানে এসব কথা হয়ত যায়। কিন্তু সে উত্তর দেয় না। চুপ করে সে সব কথা শুনে যায়।

কথা বলতে বলতে অলিভার কখন ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু বার্নার্ডের চোখে ঘুম আসে না।

পরের দিন সকালে অলিভার ঘুম থেকে উঠবার আগেই বার্নার্ড বন্ধুর বাড়ি থেকে চলে যায়। কিন্তু বাইরে এসেও সে তার কর্তব্য স্থির করতে পারে না।

বিভ্রান্ত মনে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে বার্নার্ড একসময় স্টেশনে এসে হাজির হয়। তার মনে পড়ে যায় এডোয়ার্ডের আসবার কথা। ভাগ্যহীন বার্নার্ড তার বন্ধু অলিভারের ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনায় হঠাৎ কেমন ঈর্ষা বোধ করে। সে ভাবে, 'এডোয়ার্ডের থেকে সেও যদি সেরকম একটা কিছু বাগিয়ে নিয়ে পারত!' কিন্তু বার্নার্ড ভেবে পায়না তা কি করে সম্ভব। অগত্যা সে স্থির করে, দূর থেকে মামা-ভাগ্নের মিলন লক্ষ্য করবে বিশেষ করে সেই ধনী সাহিত্যিক মামাকে।

এডোয়ার্ড এবং ভিনসেণ্টের প্রণয়িনী লোরা ছিল পুরানো বন্ধু। তাদের এ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল লোরার বিয়ের আগে থেকেই। তার বিয়ের পর কিছুদিনের জন্য ছুজনে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

এডোয়ার্ড আজ প্যারীতে আসছে ঠিক প্রিয় ভাগ্নে অলিভারের টানে নয়, আসবে বলে সে লোরাকে কথা দিয়েছিল। তাই সে এসময় আসছে।

সত্যি সত্যি এডোয়ার্ড আসছে জেনে লোরার পুরানো প্রেম আবার জেগে ওঠে। পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্রের মত সে ভিনসেণ্টকে পিছনে ফেলে এডোয়ার্ডের জন্য প্রতীক্ষা করে। এতদিন পর প্রথম দয়িত এডোয়ার্ডের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় লোরার দেহমন উন্মুখ হয়।

গাড়ী থেকে নেমে ভাগ্নে অলিভারকে দেখে এডোয়ার্ড খুশীতে এত উচ্ছল হয়ে উঠল যে একসময় সে তার অজ্ঞাতে মালের

টোকেনটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু ভাগ্নে অলিভারের সঙ্গে মিলনে মামা হল আশাহত।

একটু দূর থেকে বার্নার্ড এতক্ষণ সবকিছু লক্ষ্য করছিল। ওরা চোখের আড়াল হতেই এডোয়ার্ডের মালের টোকেনটা কুড়িয়ে নিয়ে তার মালগুলি নিজের বলে নিয়ে গেল। প্রথম ব্যাগটি খুলে বার্নার্ড দেখলে তাতে অনেকগুলি কাঁচা টাকা। রিক্ত বার্নার্ড সে অর্থ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল না। আর একটা ব্যাগ খুলতে বেরিয়ে এলো এডোয়ার্ডের ব্যক্তিগত ডায়েরী এবং তার কাছে লেখা লোরার প্রাণমাতানো কয়েকটি চিঠি। মনের আনন্দে সেগুলি সব সে পড়ে নিল। বার্নার্ড ভেবে পায় না এবার সে কি করতে পারে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একসময় সে এসে হাজির হলো শ্রীমতী লোরার বাড়িতে। আগন্তুক হলেও লোরা বার্নার্ডকে অভ্যর্থনা জানায়, তাকে সৌজন্য দেখায়।

কিন্তু কথায় কথায় বার্নার্ড যখন লোরা এবং এডোয়ার্ডের গোপন সম্পর্কের কথা ইঙ্গিত করতে থাকে লোরা অপ্রস্তুত হয়। সে বিরক্ত বোধ করে। সে ভেবে পায় না এ সব খবর বার্নার্ড কি করে জানলো।

খানিক বাদে এডোয়ার্ড সেখানে এলে বার্নার্ড তাকে সব কিছু খুলে বলে। তবুও এডোয়ার্ডের মনের সংশয় দূর হয় না। সে প্রশ্ন করে—

—'আচ্ছা বার্নার্ড, তোমার উদ্দেশ্য কি ছিল ?'

—'তেমন কিছু না, শুধু আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার ইচ্ছা ছিল।' দ্বিধাহীন কণ্ঠে বার্নার্ড জবাব দেয়।

—শুনে এডোয়ার্ড কিন্তু রাগ করে না। তার উপস্থিত বুদ্ধিতে সে মুগ্ধ হয়।

পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বার্নার্ড এবার তার আসল ইচ্ছাটা নিবেদন করে।

'আপনি আমাকে দয়া করে আপনার সেক্রেটারীর পদে নিয়োগ করুন না ? আমি জানি আপনার প্রয়োজন আছে।'

এডোয়ার্ড বলে—'তথাস্তু।'

লোরাকে সঙ্গে নিয়ে এডোয়ার্ড সুইজারল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে। বার্নার্ডও সঙ্গে গেল তার সেক্রেটারী হয়ে। সত্যি সত্যি লোরা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে ভিনসেণ্ট এবার তার বন্ধু কমতি ছ্য পাসাভেণ্ট-এর শরণাপন্ন হয়। ভিনসেণ্ট বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করে। বন্ধুটি ছিল একজন লম্পট চরিত্রের। সমকামতার জন্য সে ছিল কুখ্যাত। তথাপি সে বিবাহিত লোরার সঙ্গে ভিনসেণ্টের এই অবৈধ প্রেম সমর্থন করতে পারে নি। ভিনসেণ্টের এবার নজর পড়ে বন্ধু পাসাভেণ্টের প্রণয়িনী শ্রীমতী গ্রীফিত-এর ওপর। ক'দিন বাদে সুযোগ পেয়ে গ্রীফিতকে নিয়ে সে কোথায় উধাও হয়ে গেল। লম্পটের আদর্শ বন্ধু বটে।

এডোয়ার্ডের সেক্রেটারী হিসাবে সুইজারল্যাণ্ডে বার্নার্ড-এর দিনগুলি ভালই কাটছিল। তার নতুন জীবন সম্বন্ধে খুব ফলাও করে বন্ধু অলিভারকে একটি চিঠি দিল বার্নার্ড।

সে চিঠি পেয়ে মামার ওপর অলিভারের অভিমান হয়; বার্নার্ড-এর প্রতি তার হিংসা জাগে। অলিভার ভাবে, বন্ধু বুঝি তার সব অধিকার আর প্রাপ্য কেড়ে নিচ্ছে মামার থেকে। সে কথা ভাবতেও তার অসহ্য লাগে।

বন্ধুকে উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য অলিভারও কোন একটি কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ নিতে সংকল্প করে। দু'দিন বাদেই কমতি ছ্য পাসাভেণ্টের সাহায্যে তার সে সুযোগ মিলে যায়।

ইতিমধ্যে বার্নার্ড লোরার প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করে। সে

একদিন লোরার কাছে সে কথা ব্যক্ত করতে লোরা বার্নার্ড-এর দিকে একটি চিঠি এগিয়ে দেয়। তার স্বামীর চিঠি। সে লোরাকে অনুরোধ করে লিখেছে, ভিনসেণ্টের অবৈধ সন্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে ফিরে যাবার জন্য।

লোরা বার্নার্ডকে জানায়,—

'তোমার প্রেম গ্রহণ করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। আমি স্বামীর কাছে কালই ফিরে যাচ্ছি। তুমি কিছু মনে ক'রো না।'

বার্নার্ড এবং এডোয়ার্ড প্যারীতে ফিরে এলো।

প্যারীতে ফিরে আসবার পর বার্নার্ড অলিভার-এর থেকে একটি চিঠি পেলো। সে লিখেছে ইতালী থেকে। অলিভার জানিয়েছে ছ্য পাসাভেণ্ট এবং তার সম্পাদনায় শীঘ্রই একটি চমৎকার সাময়িক পত্র বেরুচ্ছে। তার চিঠিতে আত্মপ্রসাদের সুর। বার্নার্ড চিঠিখানা এগিয়ে দেয় এডোয়ার্ডের দিকে। কিন্তু মামা সে চিঠি পড়ে ভাগ্নের চাপা অভিমান আর ব্যথা কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারে না।

বার্নার্ড তখনও এডোয়ার্ডের সেক্রেটারীর পদে বহাল আছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সে 'ভেডেল স্কুলে' ভর্তি হয়েছে। থাকে সে 'ভেডেল' পরিবারের সঙ্গেই।

ভেডেল পরিবার লোরার বাপের বাড়ী। এ পরিবারের সঙ্গে এডোয়ার্ডের বহুদিনের বন্ধুত্ব। আবার লোরার দিদি র‍্যাসেল ছিল এডোয়ার্ডের বিশেষ প্রিয়পাত্রী। র‍্যাসেল তাদের পারিবারিক স্কুলের কাজ নিয়ে সব সময় বেশি ব্যস্ত থাকে। তাতে এডোয়ার্ড একটু ক্ষুণ্ণ হয় বৈকি!

বার্নার্ড এডোয়ার্ডকে একদিন জানাল, স্কুলের ছেলেরা নানারকম সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত ; তারা জাল টাকার কারবার করছে। অলিভারের ছোট ভাই জর্জ এদের একজন পাণ্ডা।

এডোয়ার্ড বার্নার্ডের উক্তি নীরবে শুনে যায়।

কিছুদিন পর অলিভার প্যারীতে ফিরে এল। বন্ধু বার্নার্ডের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। কিন্তু দু'বন্ধুর সে মিলন সুখকর হ'ল না। তবে যাবার আগে সে এডোয়ার্ড এবং বার্নার্ডকে দ্য পাসাভেণ্টের তরফ থেকে সেই সন্ধ্যায় এক প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করে যায়। অলিভার তার পুরানো বন্ধু লোরার ছোট ভাই অ্যারম্যাণ্ডকেও নিমন্ত্রণ জানায়। অ্যারম্যাণ্ড সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু তার নির্দেশে অলিভার অ্যারম্যাণ্ড-এর ছোট বোন সারাকে নিমন্ত্রণ করে। ব্যবস্থা হয়, যাবার সময় বার্নার্ড সারাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

সেই সন্ধ্যায় প্রীতি-ভোজের নামে হয় এক উচ্ছৃঙ্খল পানীয় উৎসব। অতিরিক্ত মদ খেয়ে অলিভার বিশ্রীভাবে হৈ চৈ শুরু করে। এডোয়ার্ডের সাহায্যে বেসামাল অলিভার বাড়ি ফেরে।

বার্নার্ডের সঙ্গে সারা বাড়ি ফেরে। অ্যারম্যাণ্ড ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার পরের ঘরটিতে সারা থাকে। দুজনে এগিয়ে আসতে আরম্যাণ্ড একটি মোমবাতি বার্নার্ড-এর হাতে তুলে দেয়। বার্নার্ড সারাকে নিয়ে ওর ঘরে ঢুকতে অ্যারম্যাণ্ড বাইরে থেকে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। বার্নার্ড সে রাতটা মনের আনন্দে সারার সঙ্গে কাটায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে এডোয়ার্ড দেখে ভাগ্নে অলিভার ঘরে নেই। খুঁজতে গিয়ে দেখলে সে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে বাথরুমে। কি করে সেখানে গ্যাসাধারের মুখটি খুলে যাওয়াতে তার ঐ বিপত্তি হয়েছে। অলিভারের অবস্থা শোচনীয়।

মামার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে ভাগ্নের জ্ঞান ফিরে এলো।

এ ঘটনার ক'দিন পরের কথা। বার্নার্ড-এর প্রতিপালক

মঁসিয়ে প্রফিটেগু একদিন এলেন এডোয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে। এসে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট বলে। জানালেন, তিনি এসেছেন জর্জের খোঁজে ; তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ : সে জাল টাকার ব্যবসায় লিপ্ত। খানিক বাদে এডোয়ার্ড বুঝল প্রফিটেগু-এর আসার আসল উদ্দেশ্য বার্নার্ডকে কেন্দ্র করে। সে জানল, বার্নার্ড ওভাবে বাড়ি থেকে চলে আসার জন্য প্রফিটেগু বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা বার্নার্ড বাড়ি ফিরে যায়।

ইতিমধ্যে সারার সঙ্গে বার্নার্ড-এর ঘনিষ্ঠতা আরও গাঢ় হয়। বার্নার্ডের অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য র‍্যাসেল তাকে তাদের স্কুল এবং বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করে।

বার্নার্ড কোন জবাব দেয় না, সে র‍্যাসেলকে এড়িয়ে যায়। এডোয়ার্ডের সঙ্গে দেখা হতে বার্নার্ড শুনল তার প্রতিপালকের উক্তি। ফলে তথাকথিত পিতার প্রতি তার রূঢ় আচরণের কথা মনে পড়তে বার্নার্ডের মন অনুশোচনায় ভরে ওঠে। তাঁর প্রতি বার্নার্ড কেমন মমতা বোধ করে। এদিকে বার্নার্ড উপলব্ধি করল তাকে আর এডোয়ার্ডের কোন প্রয়োজন নেই। তাই সে বাড়ী ফিরে যেতে স্থির করে।

বরিস ছিল এডোয়ার্ডের কোন এক বন্ধুর নাতি, জর্জ-এর সমবয়সী। স্কুলের নষ্ট ছেলেদের গুপ্তদল তাকে একদিন সে দলের দলপতির পদটির প্রলোভন দেখায়। কিন্তু সর্ত হ'ল, তার আগে তাকে উপযুক্ত দুঃসাহস এবং যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে : দলের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বরিসকে নিজের কপালে গুলি করতে হবে।

মারাত্মক পরীক্ষা ! কিন্তু বরিস দমবার পাত্র নয়। সে 'মা ভৈঃ' বলে এগিয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, বরিসের অনুপস্থিতিতে ছেলেদের ভিতর স্থির হয়েছিল, সেই রিভলভারের মধ্যে সত্যিকারের কোন গুলি থাকবে না। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে বদমাইস জর্জ মজা দেখবার জন্য চুপি চুপি একটি বুলেট পিস্তলটির মধ্যে পুরে রাখলে।

বুক দুরু দুরু করলেও বাইরে নির্ভীকভাব দেখিয়ে পিস্তলটি হাতে নিয়ে বরিস এগিয়ে যায় সকলের মাঝে। উপস্থিত ছেলেরা সকলে মুখ টিপে হাসে।

কিন্তু খানিক বাদে 'দুম' করে একটি শব্দ হ'য়ে বরিসের রক্তাক্ত দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলে ছেলেরা সব স্তম্ভিত হয়। তারা হয় হতবাক। তাদের সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। জর্জ হয় অপ্রস্তুত, ভয়ের চোটে সে একসময় কেঁদেই ফেলল। নিছক ঠাট্টা যে এরকম মারাত্মক রূপ নেবে ওরা কেউ ভাবেনি।

যৌবনের খেয়াল খুশী, অবাধ বিচরণ, পুরোনো দিনের অসার্থক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিচয় দেখে মনে শান্তি পায় না এডোয়ার্ড।

ইতিমধ্যে অলিভার সুস্থ হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে এডোয়ার্ডের মনেও শান্তি ফিরে আসে। আত্মস্থ হয়ে এডোয়ার্ড আবার তার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে মন দেয়।

শ্রাবণের রোদ

আমেরিকার লেখক উইলিয়াম ফকনার (William Faulkner)-এর 'লাইট ইন আগস্ট' (Light in August), ১৯৩২, উপন্যাসের কাহিনী।

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না—

কোন এক নিগ্রো সার্কাসওয়ালার সঙ্গে গোপন প্রণয়ের ফলে অনূঢ়া শ্বেতাঙ্গী মিলি সন্তানসম্ভবা হয়েছে।

এ খবর কানে যেতে মিলির পিতা ডক্ হাইনস্ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার ইচ্ছা হয়—মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলে। কিন্তু হাজার হোক মেয়ে তো! মিলি প্রাণে বেঁচে যায়।

ডক্ হাইনস্-এর সব আক্রোশ গিয়ে পড়ে সেই সার্কাসওয়ালার ওপর। সে ভাবে, নিগ্রোর এত বড় আস্পর্ধা! উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে ডক্ হাইনস্ অসহায় নিগ্রোটিকে হত্যা করলো।

এ ঘটনার পর মিলি তার পিতামাতার কাছ থেকে পায় শুধু অবজ্ঞা। অবহেলিতা মিলির লাঞ্ছিত জীবনের অবসান হোল অবৈধ সন্তানটির জন্ম দিয়ে। মিলি মারা গেল।

কিছুদিন পরে ক্রীসমাসের সময় মিলির এই শিশু-পুত্রটিকে ডক্ হাইনস্ রেখে এলো কোন এক অনাথ আশ্রমে। ঐ দিন শিশুটির নাম রাখা হলো যো ক্রীসমাস।

দিন যায়। যা হোক করে সেখানে যো ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। ক্রমে সেখানকার অন্যান্য ছেলেরা তাকে 'নিগার' বলে উত্ত্যক্ত করে তোলে। সে বিরক্তিকর পরিবেশে থাকা যো ক্রীসমাসের

পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। আশ্চর্য! কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন।

ডক্ হাইনস্-এর অনুরোধে ম্যাকঅ্যাচারন নামে একজন চাষী যো-কে প্রতিপালন করবার দায়িত্ব নেয়। লোকটি ধর্মে গোঁড়া কিন্তু প্রকৃতিতে নিষ্ঠুর। ম্যাকঅ্যাচারন্-এর নিষ্ঠুর অত্যাচারে যো-র সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ধর্মের প্রতি সে আকর্ষণ বোধ করে না; প্রার্থনার নামে সে ক্ষেপে ওঠে। ক্রমে যো ক্রীসমাসের মেজাজ হয় রুক্ষ, তার চরিত্র গড়ে ওঠে অস্বাভাবিক ধরণের।

একদিন যো-কে সঙ্গে নিয়ে ম্যাকঅ্যাচারন্ গেল সহরের কোন একটি কুখ্যাত রেস্টুরেণ্টে। ভিতরে যো-কে বসিয়ে রেখে সেখানকার পরিচারিকা ববি অ্যালেনকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে ম্যাকঅ্যাচারন মেয়েটির সঙ্গে খানিক সময় কাটিয়ে আসে। রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাকঅ্যাচারন উপদেশের সুরে যো-কে বলে—'তুমি এখানে কখনও একা এস না কিন্তু'।

এতক্ষণ যো সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। ম্যাকঅ্যাচারন-এর উক্তি শুনে তার তরুণ মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। নিভৃতে ববি অ্যালেন-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার মন ব্যগ্র হয়। কিন্তু ব্যবহারে যো তা প্রকাশ করে না। প্রতিপালকের উপদেশ সে নীরবে মেনে নেয়।

পরের দিন গভীর রাত্রে যো চুপি চুপি এসে হাজির হল সেই রেস্টুরেণ্টে, মিলিত হল শ্রীমতী অ্যালেন-এর সঙ্গে। যো ভাবে, প্রথম সাক্ষাতেই বুঝি সে অ্যালেন-এর হৃদয় জয় করলে! তরুণ যো-র পক্ষে এ প্রলোভন দুর্জয়। প্রতিরাত্রে গোপনে সে মিলিত হয় অ্যালেন-এর সঙ্গে। ম্যাকঅ্যাচারন কিছু টের পায় না।

সেদিনও গভীর রাত্রে বাড়ী থেকে ওরকমভাবে বেরিয়ে যাবার

সময় কি করে ম্যাকঅ্যাচারণ-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তার মনে সন্দেহ জাগে। বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে সে দেখলে যো ক্রীসমাস উর্ধ্বশ্বাসে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সহরের দিকে। রাতের অন্ধকারে সে যো-কে অনুসরণ করে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতে ম্যাকঅ্যাচারন লক্ষ্য করলে একটি গ্রামীণ নাচের আসরে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমতী অ্যালেন। যো এগিয়ে যেতে ওরা দু'জনে বাহুলগ্ন হয়। ব্যাপারটা ম্যাকঅ্যাচারন-এর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

তাদের দুজনের সামনে এগিয়ে গিয়ে ম্যাকঅ্যাচারন যো-কে প্রথমে কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করলে, তারপর তাকে তক্ষুণি বাড়ী ফিরে যেতে আদেশ করে।

মুখে কিছু না বলে যো ছুটে গিয়ে একটা চেয়ার তুলে নিল, তারপর সেটি দিয়ে ম্যাকঅ্যাচারন-এর মাথায় মারলে প্রচণ্ড এক ঘা। ম্যাক-অ্যাচারন-এর অচেতন দেহটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

যো এবার অ্যালেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কানে-কানে বলে —"তুমি নিজের বাড়ী ফিরে যাও। আমি এক্ষুণি সেখানে যাচ্ছি।" একথা বলে যো ছোটে ম্যাকঅ্যাচারন-এর খামার বাড়ীর দিকে।

বাড়িতে এসে খুঁজে পেতে ম্যাকঅ্যাচারন-এর টাকাকড়ি যা-কিছু পেল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে ক্রীসমাস আবার ছুটলো সহরের দিকে—অ্যালেনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রণয়িনীর বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে সে বাধা পায়।

বাড়ীর সদর দরজার মুখে ক্রীসমাসের অপেক্ষায় লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিল রেস্টুরেণ্টের ম্যানেজার, তার জাঁদরেল স্ত্রী এবং আর একজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। অ্যালেনের ইঙ্গিতে ক্রীসমাসকে তারা মেরে সবকিছু তার থেকে কেড়ে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

ক্রীসমাস হয় হতভম্ব। অনভিজ্ঞ তরুণ যদি বুঝতে পারত—শ্রীমতী অ্যালেন চায় না বন্ধন। সে চায় পুরুষের থেকে শুধু অর্থ !

খানিকবাদে যো ক্রীসমাস উঠে দাঁড়াল। বিভ্রান্ত ক্রীসমাস ভেবে পায় না এবার সে কোথায় যাবে, কি করবে। তবুও তাকে চলতে হয়। সে এগিয়ে যায়। পথ সুবিস্তৃত—

সকলের কাছে ক্রীসমাস নিজের পরিচয় দেয় নিগ্রো বলে। সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রণয়িনী অ্যালেনের কাছ থেকে সে যা পায়নি, চলার পথে শত মেয়ের মধ্যে তাই ক্রীসমাস খুঁজে বেড়ায়। তাদের মধ্যে অনেকে শুধু দেহ নয়, তাকে আশ্রয়ও দিল, দিল তাকে অন্ন। তবুও ক্রীসমাসের কামনার আগুন নেভে না।

ঘুরতে ঘুরতে ক্রীসমাস একসময় মিসিসিপির অন্তর্গত জেফারসন নামে ছোট্ট সহরটিতে এসে হাজির হল। সেখানে কোন একটি কাঠের গোলায় তার কাজ জুটে যায়। আস্তানা পায় সহরের একপ্রান্তে জনৈক নিগ্রোর পরিত্যক্ত একটি জীর্ণ ঘরে—অনূঢ়া জোয়ানা বরডেনের বাড়ীর কাছে।

শ্রীমতী বরডেন ছিলেন নিগ্রোদের একজন পরম দরদী বন্ধু। তাদের শিক্ষার জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন কয়েকটি স্কুল এবং কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র। নিগ্রোদের মঙ্গলের জন্য নানা কাজ নিয়ে তিনি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর বড় একটা সম্পর্ক ছিল না।

বরডেনের বয়স হয়েছে। কিন্তু যৌবন তাঁর থেকে পুরোপুরি বিদায় নেয়নি ; যাই যাই করছিল। তাঁকে প্রথম দর্শনে তখনও অনেক উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের মনে দোলা লাগে বৈকি !

ক্রীসমাসের লাঞ্ছিত জীবনের কাহিনী শুনে শ্রীমতী বরডেন-এর

মন ব্যথায় ভরে ওঠে। তিনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান—খেতে দেন পরিপাটি করে। তাঁর অনুগ্রহেই ক্রীসমাসের ঐ আশ্রয় মেলে।

এতদিন পর যো ক্রীসমাস আশ্রয় পেল, পেটের ক্ষুধাও তার দূর হয় বটে কিন্তু শ্রীমতী বরডেনের সান্নিধ্যে এসে জেগে ওঠে তার অন্তরের সুপ্ত আদিম বর্বর পশুসত্তা। সে লালায়িত হয়ে ওঠে বরডেনের অন্তরঙ্গ সাহচর্যের জন্য।

দু'দিন বাদে সুযোগ পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ক্রীসমাস সেই নির্জন পরিবেশে এগিয়ে যায় শ্রীমতী বরডেন-এর কাছে। নিঃসঙ্কোচে সে বরডেন-এর কাছে নিবেদন করলে প্রেম। তার সে আদিম প্রেমের বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেল বরডেন-এর সব সংযম আর দ্বিধা।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করল।

দিন যায়, শ্রীমতী বরডেন-এর যৌবন গত হয়েছে। তিনি ভাবেন, যো-কে এবার লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে মানুষ করলে ভবিষ্যতে সে তাঁর কাজে আসবে। তখন স্কুল এবং তাঁর অন্যান্য কাজ যো নিজেই দেখাশুনা করতে পারবে। একদিন যো-কে ডেকে তিনি তাকে অনুরোধ করলেন স্কুলে যেতে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। বরডেনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। যো স্কুলে গেল না।

কিছুদিন পরের কথা। সেদিন রাত্রে প্রণয়িনীর ঘরে ঢুকে যো ক্রীসমাস একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শিথিলবসনা বরডেন-এর দিকে। বলে,—

—"একি তোমার এত বয়স হয়েছে!"

তার উক্তি শুনে বরডেন মনে মনে চমকে ওঠেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অভ্যর্থনা জানান তাঁর রাতের

অতিথিকে। নিমেষে জাগিয়ে তোলেন ক্রীসমাসের পশুসত্তাকে। খানিক বাদে পশু শান্ত হয়। সে ভুলে যায় তার অনুযোগের কথা।

আরও কিছুদিন পরের কথা।

ক্রীসমাস সে রাত্রে ঘরে ঢুকতে লক্ষ্য করলে, প্রণয়িনী বরডেনকে একটু ক্লান্ত, যেন একটু আনমনা।

ক্লান্তকণ্ঠে শ্রীমতী বলেন,—

—"যো, তোমার সন্তান আমার গর্ভে এসেছে। এবার থেকে তুমি একটু সংযমী হও। আমার সঙ্গে একটু প্রার্থনা কর।"—বরডেনের কণ্ঠে মিনতির সুর।

তাঁর উক্তি শুনে ক্রীসমাস ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়,—

"—সব মিথ্যা কথা। আসলে তুমি বুড়ি হয়ে গেছ, তুমি তা স্বীকার করতে চাইছো না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সেকথা এড়াতে চাইছো। সে কথা যাক্। খবরদার—তুমি আমাকে কোনদিন প্রার্থনা করতে বলবে না। প্রা—র্থ—না!"

সত্যিই বরডেন বোধ করেন, তাঁর বয়স হয়েছে। সে-জীবন আর তাঁর ভাল লাগে না। ভাল লাগে না তাঁর রাতের অতিথির সান্নিধ্য। সে জীবন তাঁর কাছে লাগে অসহ্য।

শ্রীমতী বরডেন এখন চান অধ্যাত্ম-জীবন। তাঁর ইচ্ছা যো-ও শান্ত সমাহিত হয়ে তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করে।

এমনি করে প্রায় তিন বছর কেটে গেল। শ্রীমতী বরডেনের প্রতি যো ক্রীসমাসের অনুরাগ শ্লথ হয়। তাঁর প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে যো-র দিন কাটে।

এমন সময় 'যো ব্রাউন' নাম করে একটি যুবক এলো সে অঞ্চলে। সে হ'ল যো ক্রীসমাসের সহকর্মী। ক্রীসমাস ব্রাউনকে ডেকে এনে

আশ্রয় দিল তার ঘরে। দু'দিন যেতেই ব্রাউন শ্রীমতী বরডেনের সঙ্গে ক্রীসমাসের সম্পর্কের রহস্য বুঝতে পারে।

ক্রীসমাসের মনে শান্তি নেই। শান্ত নেই তার প্রণয়িনী শ্রীমতী বরডেনের মনেও। ক্রীসমাস যা চায় বরডেনের থেকে সে তা পায় না। তাই সে ক্ষুব্ধ। বিগতযৌবনা বরডেন উপলব্ধি করেছেন,—ভোগে তৃপ্তি নেই, কামনায় শান্তি নেই। তিনি শান্তির ইঙ্গিত পেয়েছেন প্রার্থনার মধ্যে। বরডেন চান ক্রীসমাসও তাঁর সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিয়ে চিত্তশুদ্ধি করে। কিন্তু প্রার্থনার নামে ক্রীসমাস ক্ষেপে ওঠে।

এল সেই কালরাত্রি—

সেরাত্রে ক্রীসমাস ঘরে ঢুকতে নিরাসক্ত কণ্ঠে শ্রীমতী বরডেন বলেন—

'যো, বাতিটি নিভিয়ে দাও।'

'না, তার দরকার নেই। বল, কি বলতে চাও?'

'লক্ষীটি, অন্তত আজ রাত্রে আমার একটি অনুরোধ রাখ: বিছানায় উঠে এসে আমার সঙ্গে একবার প্রার্থনা কর। প্রার্থনা করতে না চাও আমার সঙ্গে একটু হাঁটু গেড়ে বস।'

তাঁর উক্তি শুনে ক্রীসমাস গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে সে দেয়ালের দিকে মুখ করে, শ্রীমতী বরডেনের দিকে পিছন ফিরে।

শ্রীমতী বরডেন তখনও বসে আছেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে। কিন্তু প্রার্থনায় তাঁর মন বসে না। বসে বসে ভাবছেন, না এ জীবন অসহ্য, শেষ হয়ে যাক্ এ লাঞ্ছিত গ্লানিকর জীবনের। নিয়তির পরিহাস! শ্রীমতী যদি জানতেন—ক্রীসমাস-এর তখনকার মনের ভাবনাও ঠিক ঐ সুরেই বাঁধা ছিল।

শ্রীমতী বরডেন আস্তে আস্তে তাঁর গাউনের ভিতর থেকে পুরানো সেকেলে পিস্তলটি বার করে হাতে নিলেন। সেটা একবার দেখে নিলেন। দেখলেন, ঠিক আছে—দু'টো গুলিই আছে। কম্পিত হাতে পিস্তলটি তুলে নিয়ে শ্রীমতী বরডেন লক্ষ্য করলেন ক্রীসমাসকে।

লক্ষ্যে তাঁর ভুল হয় নি। ট্রিগারেও তাঁর আঙ্গুলের চাপ পড়েছিল। কিন্তু যন্ত্রটি তাঁকে করলে প্রতারণা—গুলি বেরোল না।

এদিকে পিস্তলটির ছায়া সামনে দেয়ালের উপর পড়তে ক্রীসৃমাস তড়িৎবেগে ঘুরে দাঁড়ায়। পাশের টেবিল থেকে একটি ক্ষুর তুলে নিয়ে সে উন্মত্তের মত লাফিয়ে ওঠে বিছানায়। যেন বুভুক্ষু শার্দূল ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায় শিকারের উপর। বর্বর ক্রীসৃমাস বসিয়ে দিল সেই তীক্ষ্ণ ধারালো ক্ষুরটি শ্রীমতী বরডেনের গলায়।

খানিক বাদে লুটিয়ে পড়া রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহটির প্রতি নজর পড়তে ক্রীসৃমাসের সম্বিত ফিরে আসে। বিমূঢ় নিগ্রো সেই রক্তাক্ত হাতেই পিস্তলটি তুলে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। হাতের রক্ত মুছতেও সে ভুলে যায়।

বাইরে এসে পিস্তলটি পরীক্ষা করে ক্রীসৃমাস বুঝতে পারে—একটি গুলি ছিল তার জন্য, অপরটি ছিল শ্রীমতীর নিজের জন্য। অনুশোচনার দাহনে ক্রীসৃমাস জ্বলে যায়।

তখনও ভোরের আলো পরিষ্কার ফুটে ওঠেনি। শ্রীমতী বরডেনের বাড়ীর উপর আগুনের শিখা দেখে নাগরিকরা সেখানে ছুটে আসে। ততক্ষণে বাড়ির চারিদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। তারা উপরে উঠতে গিয়ে বাধা পায় ক্রীসমাসের বন্ধু ব্রাউন-এর কাছে। এক ধাক্কায় ব্রাউনকে সরিয়ে দিয়ে নাগরিকরা ছুটে উপরে উঠে যায়। অনেক কষ্টে খুঁজে পেতে শ্রীমতী বরডেন-এর রক্তাক্ত মৃতদেহটি নিয়ে তারা বেরিয়ে আসে।

শ্রীমতী বরডেনের এই অপমৃত্যুর খবর চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। স্থানীয় ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ শ্রীমতীর এই মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেয় তাঁর আত্মীয়দের। খবর পেয়ে নিউ হেমিস্পেয়ার থেকে শ্রীমতীর আত্মীয়রা হত্যাকারীর সন্ধানের জন্য এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলে।

এই পুরস্কারের লোভে ব্রাউন লালায়িত হয়ে ওঠে। বন্ধু ক্রীস্‌মাসকে সে হত্যাকারী বলে জানাতে দ্বিধা করে না। কিন্তু ক্রীস্‌মাসের সন্ধান সে জানে না। ব্রাউন-এর উক্তি শুনে পুলিশের মনে সন্দেহ জাগে.। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাউনকে গ্রেপ্তার করা হল।

ক'দিন বাদে পুলিশের চতুর কুকুরের সাহায্যে ক্রীস্‌মাসের সন্ধান পাওয়া গেল। সে গ্রেপ্তার হ'ল। কিন্তু বিচারের দিন ক্রীস্‌মাস আবার কি করে পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে সে কোন একটি নিগ্রোর বাড়ি ঢুকে তার বন্দুকটি হস্তগত করে। সেখান থেকে আবার পুলিশের তাড়া খেয়ে সে আশ্রয় নেয় একঘরে প্রাক্তন পাদ্রী গেইল হিলটাওয়ার-এর বাড়িতে।

ইতিমধ্যে ক্রীস্‌মাসের এই বিপদের কথা জেনে তার দাদু ডক্ হাইনস্ শ্রীমতী হাইনস্‌কে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এল ঘটনাস্থলে।

দিদিমা শ্রীমতী হাইনস্ এবং হিলটাওয়ার-এর সহৃদয় বন্ধু বায়রন ব্রাঞ্চ-এর চেষ্টায় ফেরারী ক্রীস্‌মাস আশ্রয় পেয়েছিল ঐ কুখ্যাত পাদ্রীর বাড়ির চিলেকুঠীতে।

ক্রীসৃমাস তবুও নিস্তার পেল না। সশস্ত্র পুলিশের দল গুলি ক'রে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করে তার মৃতদেহটি সেখান থেকে উদ্ধার করে।

যো ব্রাউন মনে করে তার জন্যই ক্রীসৃমাস ধরা পড়েছে। তাই এবার সে ঐ পুরস্কারটি দাবী করে। তার উক্তি শুনে পুলিশের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে।

ঐ দুর্ঘটনার দিন সহরে এল এক আসন্নপ্রসবা তরুণী—লীনা গ্রোভ। মেয়েটির চেহারা শান্ত নম্র। সে এসেছে তার গর্ভের অনাগতের পলাতক পিতা লুকাস বার্চের সন্ধানে। এসেছে সে সুদূর আলবামা সহর থেকে পায় হেঁটে।

জেফারসন সহরে লুকাস বার্চের নাম কেউ জানে না। ঘুরতে ঘুরতে লীনা এক সময় এল বায়রনের কাছে—বার্চের সন্ধানে। লীনার দুঃখের কাহিনী শুনে সহৃদয় বায়রনের কেমন মায়া হয়। সে তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে।

লীনার থেকে তার চেহারার বিবরণ শুনে বায়রন বুঝতে পারে আসলে যো ব্রাউন-ই সেই পলাতক লম্পট—লুকাস বার্চ। সে এখানে নাম ভাঁড়িয়ে আছে। লীনা বায়রনের অনুমানকে সমর্থন করে।

লীনার অবস্থা দেখে বায়রন এবার তাকে ব্রাউনের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে একাকী বসেছিলেন ক্রীস্‌মাসের দিদিমা শ্রীমতী হাইনস্‌। শ্রীমতী হাইনস্‌ আসন্নপ্রসবা তরুণীটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। বায়রন ওর মধ্যেই লীনার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করে না।

লীনা সন্তানটির জন্ম দিল। শ্রীমতী হাইনস্‌ মা এবং সদ্যোজাত শিশুটির পরিচর্যা করেন।

শিশুটিকে কোলে নিয়ে শ্রীমতী হাইনস্‌ বসে আছেন। ঠিক সেই সময় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যো ব্রাউন তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

ঘরের ভিতরের পরিবেশ দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। তারপর তার বিছানায় লীনা গ্রোভের ওপর নজর পড়তে সে চমকে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারটা এবার তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাউন

ঘরের পিছনের দিকের খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে পালিয়ে যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট হতভম্ব।

বায়রন লীনাকে ভালবাসে, সে তাকে বিয়েও করতে চায় বটে। কিন্তু লম্পট ব্রাউন-এর সদ্যোজাত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বায়রনের আপত্তি। তার ইচ্ছা ব্রাউন উপযুক্ত শাস্তি পায় এবং সে তার এই শিশুটির দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ব্রাউনকে পালাতে দেখে বায়রন তার পিছু ছোটে। দু'জনে ছোটে রেললাইন ধরে—সহর ছাড়িয়ে। এক সময় বায়রন পলাতক ব্রাউনকে ধরে ফেললে। দু'জনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হল কিছু সময়। সেই সময় একটি মালগাড়ী আসছিল মন্থরগতিতে। এক লাফে সেই গাড়ীটিতে উঠে পড়ে ব্রাউন পালিয়ে যায়।

তিন সপ্তাহ পর। লীনা অনেকটা সুস্থ হয়েছে। শিশুটিকে বুকে করে বায়রনের সঙ্গে লীনা বেরিয়ে পড়ে ব্রাউনের সন্ধানে। সুবিস্তৃত পথ দিয়ে ওরা এগিয়ে চলে পায়ে হেঁটে। কিছুদূর এগিয়ে যেতে একটি পথ-চলতি মোটরলরি ওদের তুলে নেয়। ওরা স্বস্তি পায়। চলার পথে বায়রন সংযত থাকে। সে নজর রাখে লীনার সুখ-সুবিধার প্রতি।

রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য রাস্তার কোথাও এক জায়গায় গাড়ীটি থামান হয়। যাত্রীরা সকলে বিশ্রাম করছে। বায়রন লীনার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে। কিন্তু লীনার প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে বায়রন হয় অপ্রস্তুত, সে হয় লজ্জিত। সঙ্গে সঙ্গে সেই আস্তানা ছেড়ে অদূরে কোথাও সরে গিয়ে বায়রন গা ঢাকা দেয়।

বায়রনের চোখে ঘুম আসে না। লীনা তার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

লীনার আকর্ষণ দুর্জয়। ভোর হবার আগেই বায়রন রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে সেই মোটরলরিটির জন্য অপেক্ষা করে। খানিক বাদে গাড়িটি এগিয়ে আসে সেই দিকে। মোড় ঘুরতে গাড়ীটির গতি একটু শ্লথ হতেই বায়রন লাফিয়ে ওঠে গাড়িটির ওপর।

এবার বায়রন অবাক্ হয়। তার উপস্থিতিতে লীনা বিরক্ত বোধ করে না। সে বায়রনকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

গাড়ীটি টেনিসীর দিকে এগিয়ে চলে।

বারাব্বাস

সুইডিশ সাহিত্যিক পার ফেবিয়ান লাগেরকভিস্ট (Par Fabian Lager-kvist)-এর 'বারাব্বাস' (Barabbas), ১৯৪৯, উপন্যাসটির সারাংশ।

'প্রভু, তুমি কৃপা কর ; ওদের তুমি ক্ষমা কর প্রভু।'

বধ্যভূমিতে ক্রুশবিদ্ধ লোকটির উক্তি শুনে বারাব্বাস থমকে দাঁড়াল।

লোকটির মুখখানি কী অপূর্ব ক্ষমাসুন্দর, চোখ দুটি করুণায় স্নিগ্ধ, কণ্ঠে তার কাতর মিনতি,—'প্রভু,.........'। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বারাব্বাস ভাবে : আশ্চর্য, লোকটি মৃত্যুপথের পথিক, তবুও সে ঈশ্বরের নাম করছে, প্রার্থনা করছে তার পরম শত্রুদের ক্ষমা করতে। লোকটি অদ্ভুত তো !

ইহুদীদের জাতীয় উৎসবের দিনে দুষ্ট পুরোহিতদের চক্রান্তে সে যুগের কুখ্যাত দস্যু বারাব্বাস মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পেল ; তার বদলে বলি হলেন যীশু। ক্রুশবিদ্ধ সেই তরুণ ইহুদী তাপসের ভাস্বর মূর্তি এবং তাঁর মধুর উক্তি দস্যুর মনের ওপর এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। সে মুক্তি পেয়েও চলে যেতে পারল না ; দাঁড়িয়ে যীশুর আত্মবলি দেখলে।

দুর্ধর্ষ দস্যু সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ে। এক সময় তার মনে হল যেন গভীর অন্ধকার আস্তে আস্তে চারিদিকে নেমে আসছে। বুঝি বা সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার নিমেষে সারা দুনিয়াটাকে গ্রাস করবে। সে ভেবে পায় না, অদূরে শোকার্ত জননীটিই বা কেন তাকে নীরবে ধিক্কার দিচ্ছে। সে-দৃশ্য অসহ্য।

বারাব্বাস সেখানে আর দাঁড়াতে পারে না। আলোড়িত মনে, বিবশ দেহটিকে টেনে নিয়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়।

জেরুজালেমে ফিরে এসে বারাব্বাস তার পুরানো সঙ্গীদের সাথে মিলিত হল। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করল তার মুক্তির রহস্য; বলল, যীশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর বিবরণ,—তাঁর মৃত্যুকালে সেই অন্ধকার নেমে আসার অদ্ভুত ঘটনা। তারপর সে তাদের থেকে জানতে চাইল যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা।

যীশুর সম্বন্ধে তাদের অস্পষ্ট ধারণা বারাব্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে।

বধ্যভূমির সেই দৃশ্য তাকে নিয়ত ছায়ার মত অনুসরণ করে। সে স্মৃতি ভুলবার জন্য বারাব্বাস নারী ও সুরায় ডুবে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। শত সহস্র প্রশ্নবাণ তবুও তাকে তাড়া করে। সে ভেবে পায় না কোথায় পাবে তার প্রশ্নের সদুত্তর।

কেউ বলে, রাতের অন্ধকারে যীশু আবার ফিরে এসে সশরীরে রাজত্ব করবেন সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতে। কেউ বা শোনায় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা—তাঁর অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্য; মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা, তাঁর প্রেমের মহিমা।

সব শুনে বারাব্বাসের মনে প্রশ্ন জাগে, তাই যদি সত্যি হয়, কেন তিনি বরণ করলেন এই নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড। কে যেন জবাব দেয়, তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়, প্রেমের দূত—জাগ্রত বিগ্রহ।

তবুও নিরসন হয় না তার সন্দেহের দ্বন্দ্ব। বারাব্বাস পায় না তার উত্তর। বিভ্রান্ত মন নিয়ে বারাব্বাস সারারাত অপেক্ষা করল কবরস্থানে—মৃত যীশুর অভ্যুত্থানের আশায়। সন্দেহের দ্বন্দ্বে জর্জরিত মন নিয়ে সে একাকী ঘুরে বেড়ায়। যীশুর কোন অনুরাগী পেলে সে তাঁর সঙ্গ ছাড়ে না, তন্ময় হয়ে শোনে তাঁর কাহিনী।

ক'দিন বাদে এল আর এক বিপদ ; সে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। প্রত্যক্ষ করল সে রাস্তায় বেরলেই সবাই তাকে দেখিয়ে বলে, 'এই সেই বদমাশ লোকটা ; এই লোকটা মুক্তি পেয়েছে বলেই নিরীহ যীশুর প্রাণদণ্ড হয়েছে।'

দেখতে দেখতে জেরুজালেমের আকাশ বাতাস তার প্রতি নীরব ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বারাব্বাস ভেবে পায় না, এদের সে কি জবাব দেবে। কী করে সে ওদের বোঝাবে এ ব্যাপারে তার কোন দোষ ছিল না, ছিল না তার কোন ব্যক্তিগত কারসাজি।

এ ঘটনার আগে থেকেই সে জ্বলছিল অনুতাপের জ্বালায়। বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে হৈ-চৈ এখন আর তার ভাল লাগে না। তার বিতৃষ্ণা এল নারী ও সুরায়। বারাব্বাস জানতে চায়, যীশুর অনন্ত মহিমা।

একদিন চুপি চুপি সে খ্রীষ্টানদের এক সভায় গিয়ে হাজির হ'ল কিন্তু সেখানে তাদের অস্পষ্ট আলোচনা শুনে সে হতাশ মনে ফিরে আসে।

কিছুদিন পরের কথা। বারাব্বাস ব্যগ্র হয়ে উঠেছে মুক্ত হবার জন্য। তাই একদিন দস্যুদলের দলপতি হয়ে সে জেরুজালেমের বাইরে চলে গেল ; তার পুরানো প্রিয় পেশায়। কিন্তু দস্যুবৃত্তিতে তার মন বসে না। তার নিষ্ক্রিয়তায় অনুচরদের মনে ক্রমে অসন্তোষ জেগে ওঠে। ক'দিন বাদে এক ফাঁকে চুপি চুপি সে তার দলের আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে, জীবনে আর কোনদিন ঐ পাপ পথে সে পা বাড়াবে না।

দস্যুদল ছেড়ে এসে উদ্‌ভ্রান্ত মনে কিছুদিন সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। তবুও সমাধান হয় না তার সমস্যা। সে পায় না তার জিজ্ঞাসার উত্তর।

আরও কিছুদিন পরের কথা। বারাব্বাসকে দেখা গেল রোম সম্রাটের এক তামার খনির কাজে, ক্রীতদাস হিসাবে।

একই শেকলে বাঁধা তার সহকর্মী শাহক যীশুর অনুরাগী। যীশুকে দেখবার সুযোগ হয়নি শাহকের। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে বারাব্বাসের কাছ থেকে যীশুর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। উৎসাহিত বারাব্বাস সত্যি মিথ্যা জড়িয়ে বন্ধুকে শোনায় যীশুর অলৌকিক কাহিনী। শাহক সরল বিশ্বাসে তার সব উক্তি মেনে নেয়।

শাহক একদিন তার গলায় ঝোলাল একটি চাক্‌তি, তাতে যত্ন করে খোদাই করা যীশুর নাম। ক্রমে বারাব্বাসও গলায় ধারণ করল অনুরূপ একটি চাক্‌তি। যীশুর নামে দু'জনে চুপি চুপি প্রার্থনা করতে শুরু করে।

তাদের দু'জনের আচরণ কিন্তু বেশীদিন গোপন রইল না। রোম্যান গভর্নর একদিন ডেকে পাঠালেন ওদের দুজনকে।

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'জান, তোমরা সম্রাটের ক্রীতদাস? ...তবে অন্যের দাসত্বের চিহ্ন তোমরা গলায় পরেছ কার হুকুমে, কোন্ সাহসে?'

শান্তকণ্ঠে শাহক জানায়,—ভগবান যীশুই তার একমাত্র প্রভু; সে অন্য কারো দাস নয়।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বারাব্বাস বলল,—ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই পারছি না; তাঁর ওপর আমার আস্থা নেই।

এই সন্দেহ প্রকাশ করার ফলে বারাব্বাস পেল পুরস্কার, সে পেল মুক্তি। শাহকের প্রতি আদেশ হল প্রাণদণ্ড।

বারাব্বাস ঝোপের আড়াল থেকে ক্রুশবিদ্ধ শাহকের আত্মদান দেখল। দেখল না তার মৃত্যুতে কোন অলৌকিক ঘটনার ঘটন। না দেখে বারাব্বাস স্বস্তি পেল বটে কিন্তু সে স্পষ্ট অনুভব করল শাহকের

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে তার প্রতি গভীর ঘৃণা ফুটে উঠেছে। সে দৃশ্য অসহ্য। অনুতপ্ত বারাব্বাস সেখান থেকে দূরে সরে যায়।

বারাব্বাসের উপর তুষ্ট হয়ে নাস্তিক গভর্নর রোমে ফিরে যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিন্তু রোমে এসেও বারাব্বাস ক্রীতদাস জীবনের বন্ধু শাহকের স্মৃতি ভোলে না। সে ভুলতে পারে না সেই অদ্ভুত তরুণ তাপস যীশুকে ; সে জানতে চায় যীশুর অনন্ত মহিমা। সে দূর করতে চায় তার মনের সকল সংশয়, সব মলিন সন্দেহ।

রাতের অন্ধকারে একদিন বারাব্বাস চুপি চুপি এল ভূগর্ভস্থিত মন্দিরে খ্রীষ্টানদের ধর্ম-আলোচনা শুনতে। সেখানে সে কাউকে না দেখে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসে। ফিরবার পথে বারাব্বাস অদূরে দেখে আগুনের শিখা। আস্তে আস্তে সে সেই আগুনের দিকে এগিয়ে যায়।

চলতে চলতে তার মনে হল যেন ভগবান যীশু ফিরে এসেছেন জগৎকে ত্রাণ করতে ; তাঁর ইচ্ছা রোম নগরকে প্রথমে ধ্বংস করা, কারণ রোমানরা তাঁকে মনে করত পরম শত্রু বলে। বারাব্বাস ভাবে, যীশুর কাজে লাগবার এবং সেই সঙ্গে তাঁর ভক্ত খ্রীষ্টানদের সামান্য উপকারে আসার এই তো সুযোগ !

একটুকরা জ্বলন্ত কাঠ হাতে তুলে নিয়ে বারাব্বাস উন্মাদের মত রোম নগরীর বাড়ির পর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে চলে।

গ্রেপ্তার হবার পর কিন্তু বারাব্বাস নিজের পরিচয় দিল একজন খ্রীষ্টান বলে। তার এই উক্তির ফলে রোমের সকল খ্রীষ্টানদের কারারুদ্ধ করা হল। জেলে আসল খ্রীষ্টানরা ক্রমে জানল তার সত্য পরিচয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাভরে তারা সকলে অস্বীকার করল বারাব্বাসকে। এতগুলি লোকের ঘৃণার শরশয্যার ওপর বসে বারাব্বাস দুই হাতে মুখ ঢেকে চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

বন্দীদের ভিতর থেকে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বারাব্বাসকে জানায়, যে আগুন দেখে সে উৎসাহিত হয়েছিল সে আগুন যীশু লাগান নি ; সে কু-কীর্তি সীজারের। অতএব সে যীশুকে সাহায্য করে নি, করেছে সীজারকে। যীশুর আদর্শ প্রেমের, হিংসার নয়, নয় তা ধ্বংসের।

এবার বৃদ্ধ ওদের দিকে ফিরে বলে, ওকে তোমরা ঘৃণা করো না, ও যে করুণার পাত্র। দেখ, যীশুর নাম অঙ্কিত চাক্‌তিটি লাঞ্ছিত হলেও সেটি ও ত্যাগ করে নি ; এখনও ওর গলায় ঝুলছে। বেচারা চাইছে যীশুর ওপর অখণ্ড বিশ্বাস আনতে কিন্তু ওর মনের দ্বিধা আর সংশয় করছে ওর সঙ্গে শত্রুতা। সত্যের প্রতি সন্দেহ করেছে ওর জীবন বিষময়। ভেবে দেখ, বারাব্বাসের জীবনে শান্তি কোথায় ? ও যে আমাদেরই সগোত্র।

সারি সারি ক্রুশের ওপর বন্দী খ্রীষ্টানদের বিদ্ধ করা হয়েছে ; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তারা পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা দিয়ে লাঘব করছে তাদের যন্ত্রণা।

বারাব্বাস অপাঙ্‌ক্তেয়, কেউ কথা বলে না ওর সঙ্গে। সে একটু দূরে। তাকেও এক সময় ক্রুশবিদ্ধ করা হল কিন্তু সকলের থেকে দূরে। শরীরের যন্ত্রণা অপেক্ষা তীব্রতর হয়ে বারাব্বাসকে বিদ্ধ করছিল সগোত্রের ঘৃণা।

তখন চারিদিকে অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখা গেল, বারাব্বাসের পাংশু ঠোঁট দু'টি তখনও আস্তে আস্তে নড়ছে। শোনা গেল, সে ক্ষীণ কণ্ঠে মিনতি করছে,—

'প্রভু, তুমি আমাকে গ্রহণ কর। আমার আত্মা তোমার সঙ্গে মিলিত হোক্।'

প্রেমের মরুভূমি

ফরাসী লেখক ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক (Francois Mauriac)-এর 'দি ডিজ্যারট্ অব লাভ' (The Desert of Love), ১৯২৫, উপন্যাসের গল্প।

'মারিয়া'—

নামটি বলেই মেয়েটি আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে গিয়ে বিরাট বাড়িটির ভিতরে মিলিয়ে গেল।

সেই নামটি শুনে তরুণ রেমণ্ড কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সে মনে মনে উচ্চারণ করে,—মা-রি-য়া! রেমণ্ড ভাবে, আশ্চর্য! এও কি সম্ভব। সত্যিই কি এই সেই মারিয়া, যে নামে মোহ ছড়ায়। যে নামটি সহরের আলোচনার বিষয়; যার একটু কৃপাদৃষ্টির জন্য ছেলে-বুড়ো পাগল হয়ে ওঠে। এরই সঙ্গে সে রোজ এক ট্রামে বাড়ি ফিরেছে এতদিন, হয়েছে কতদিন তাদের চোখের বিনিময়। অদ্ভুত!

রেমণ্ড নিজের কানকে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু সেই মধুর কণ্ঠের রেশ তখনও রয়ে গেছে তার কানে। তার কণ্ঠে ছিল না প্রতারণা, ছিল আশ্বাসের সুর। রেমণ্ড আবার ভাবে, না মেয়েটি হয়ত ঠিকই বলেছে, সে তাকে ধোঁকা দেয় নি। হাঁ, এ তো সেই বাড়িতেই ঢুকল। কিন্তু রেমণ্ড ভেবে পায় না, তার বাবার নাম শুনে মেয়েটি অমন করে চম্‌কে উঠল কেন? কেনই বা সে তাদের এই মিলনের কথা ওর বাবার কাছে প্রকাশ করতে বারণ করলো। যাক্ গে।

রোমাঞ্চিত দেহ-মনে রেমণ্ড বাড়ি ফিরে এল। সে আনমনা। একটি মধুর কণ্ঠস্বরে তার মন ভরে আছে, সে ভুলে গেল তার পেটের ক্ষুধা। ঠাকুমার তাগিদে সে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল বটে কিন্তু

খেতে সে পারল না। টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে বাপ তার ছেলেকে লক্ষ্য করছিল। চিন্তাশীল বাপ ভেবে পাচ্ছিল না, ছেলের ভাবান্তরের কারণ। ঠিক এমনি সময় ছেলে বাপের মুস্কিল আসান করল—

'বাবা, আমি মারিয়াকে চিনি, তার সঙ্গে আজ আমার আলাপ হল। মেয়েটি কিন্তু খুব মিষ্টি, সত্যি বলছি বাবা।'

ছেলের উক্তি শুনে বাপ ভ্রূকুঞ্চিত করেন। তিনি আরও একটু গম্ভীর হলেন। অবাক বিস্ময়ে বাপ ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মারিয়া একটি শিশু সন্তান নিয়ে বিয়ের কিছুদিন বাদে বিধবা হয়েছে। ভিক্তর লারুসেলের এক বাড়িতে আশ্রিতা। ছেলের চিকিৎসার জন্য হল ডাক্তার কুরাজের সঙ্গে পরিচয়। কুরাজ সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তিনি চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। ছেলেটি কিন্তু তবুও বাঁচল না। মাকে ছেড়ে ছেলে একদিন চিরদিনের মত চলে গেল। কিন্তু তার মার কাছে ডাক্তারের যাতায়াতটা থেকে যায়।

ডাক্তার কুরাজ গম্ভীর প্রকৃতির, অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ লোক। তাঁর কাছে হৃদয়বৃত্তি প্রশ্রয় পায় না। এমন কি স্ত্রী, পুত্র বা পরিজনদের কারো সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা নেই। তাঁর মন নিঃসঙ্গ।

হঠাৎ বহুনিন্দিতা এই মারিয়ার প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ জাগে। সে-আকর্ষণ দুর্জয়। সমস্ত দিনের নীরস কাজের মধ্যে, কঠিন কর্তব্যের মধ্যেও সেই পরম মুহূর্তটির জন্য ডাক্তার লালায়িত হয়ে থাকেন—কখন মারিয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। মারিয়ার কোমল হাতের স্পর্শ পাবার জন্য কখনও বা ডাক্তার তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে,—

'না, না, ডাক্তার আজ আর আমার জ্বর নেই। বিশ্বাস না হয় এই দেখ না হাত। তার চেয়ে তুমি বলো ঐ ওষুধগুলি খাওয়া আমি বন্ধ করি···'।

ডাক্তার একটি কোমল হাতের স্পর্শ পান বটে কিন্তু সে হাত

মারিয়ার নয়, সে হাত তাঁর রোগিণীর। আহত মনে ডাক্তার তাঁর হাত গুটিয়ে নেন ; সেই সঙ্গে তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে আসে শুধু একটি শব্দহীন গভীর নিঃশ্বাস।

নতুন আশা, উদ্দীপনা নিয়ে ডাক্তার কুরাজ তবুও আবার যান মারিয়ার কাছে। কিন্তু ফল হয় না। মেটে না ডাঃ কুরাজের কামনার আগুন। শ্রীমতী মারিয়ার সঙ্গে দেখা হলে তিনি ভুলে যান তাঁর সব পূর্বকল্পিত কথার বুনন, ভুলে যান মানুষ কুরাজের অন্তরের হাহাকার, তাঁর সত্তা। তাঁর ভিতর প্রকাশ হয় ডাক্তার কুরাজ। তাই আবার তাঁকে ফিরতে হয় মারিয়ার বাড়ি থেকে শূন্য মনে। এমনি করেই দিন যায়।

মারিয়া ডাক্তারকে শ্রদ্ধা করে। তার বেশি কিছু সে দিতে পারল না তাঁকে। একদিন এক চিঠি দিয়ে শ্রীমতী মারিয়া তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিল। চিঠিতে সে তুলে দিয়েছে মেতারলিঙ্কের একটি লাইন : 'এমন দিন আসছে, এবং সেদিন খুব বেশী দূরে নেই, যেদিন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করা যাবে।'

এ চিঠি পেয়ে ডাক্তার ব্যথা পেলেন, হলেন আশাহত। তবুও তিনি মারিয়াকে ভুলতে পারেন না। মারিয়াকে ভোলা তাঁর পক্ষে কষ্টকর। তবুও ডাক্তার তার জন্য অপেক্ষা করেন, অপেক্ষা করবেন তিনি আজীবন। মারিয়াহীন জীবন তাঁর কাছে অর্থহীন।

ডাক্তার কুরাজের ছেলে রেমণ্ড তখন স্কুলে পড়ে। কতই বা তার বয়স! কিন্তু অল্প বয়সেই সে বখাটে নাম কিনেছে। বলিষ্ঠ চেহারা। স্কুল থেকে ফেরবার পথে ট্রাম স্টপে একদিন মারিয়ার সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল। সে আলাপ ক্রমে গাঢ় হয়। মারিয়ার নামের সঙ্গে অপবাদ জড়িত ছিল, তাই উদ্ভিন্নযৌবন রেমণ্ড সহজেই রূপসী মহিলার প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়।

মারিয়ার ব্যবহারে রেমণ্ড উৎসাহিত হয়। সে তাকে অভ্যর্থনা জানায়, ইঙ্গিতে কথা বলে। একদিন কামনাজর্জর চিত্তে রেমণ্ড গেল মারিয়ার নির্জন বাড়িতে, মারিয়া কিন্তু সাড়া দিল না। মারিয়া বলে,—

'রেমণ্ড, তুমি কি মনে কর কোন মেয়েকে জোর করে পাওয়া যায়! তোমার আর কতই বা বয়স হয়েছে? তুমি আমার স্বর্গত খোকার বয়সী।'

মারিয়ার উক্তি শুনে রেমণ্ড অপ্রস্তুত হয়। আহত হৃদয়ে অতৃপ্ত কামনা নিয়ে ফিরে এল রেমণ্ড। কিন্তু ঘরে নয়।

রেমণ্ডের জীবনে নূতন অধ্যায় সুরু হয়। পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচল। লেখাপড়ায় সে ইস্তফা দিল। সে চলে গেল প্যারিসে। একটি মেয়ের কাছ থেকে চেয়ে সে যা পায়নি প্যারিসের অলিতে গলিতে হাজারো মেয়ের মধ্যে সে তাই খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তবুও তার কামনার নির্বাণ হয় না। অতীত থেকে একটি অচুম্বিত মুখ সিনেমার ক্লোজ আপের মতো ক্রমশঃ বড় হয়ে দিবারাত্র তার সামনে ভেসে বেড়ায়। রেমণ্ডের মনে শান্তি নেই।

এত মেয়েকে সে জেনেছে, তবু রেমণ্ডের মনে হয় বুঝি সেই একটি মেয়ের অভাবে তার কৌমার্য ঘুচল না। জীবনের মাত্র একটি কামনা, তাও হল না তৃপ্ত; অথচ এর জন্য সে তার জীবনটাকে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিয়েছে। সে ঘরছাড়া হয়েছে। এ জীবন ব্যর্থ, এ জীবন তার কাছে মনে হয় অসহ্য।

দীর্ঘ সতেরো বছর কেটে গেল।

রেমণ্ড মারিয়াকে ভোলে নি। এই দীর্ঘকাল সে আশা করেছে মারিয়া ক্রশের সঙ্গে একদিন তার আবার দেখা হবে। এত বছর বাদে অন্তত তার সেই আশাটুকু সেদিন পূর্ণ হল।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। রেমণ্ড রেস্তোরাঁয় বসে আছে, সে নিঃসঙ্গ। তখনও ভীড় জমে ওঠে নি ; দু'চার জন আসতে সুরু করেছে। হঠাৎ সে দেখল দূরে এক কোণে বসে আছে মারিয়া তার সঙ্গে ভিক্তর লারুসেল। দূর থেকে দু'জনে দু'জনকে লক্ষ্য করতে লাগল। পরস্পর পরস্পরকে চিনতে ওদের অসুবিধা হয় না। একসময় লারুসেলের আহ্বানে সে মারিয়ার কাছে আসবার সুযোগ পেল। একদল লাস্যময়ীর আবির্ভাবে লারুসেল চঞ্চল হয়ে ওঠে, সে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায়। সে রেমণ্ডকে বসিয়ে উঠে চলে যায়। রেমণ্ড পায় মারিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ।

একদিন মারিয়া ভিক্তর লারুসেলের রক্ষিতা ছিল সেই বাগান বাড়িতে, রেমণ্ডের ছাত্র জীবনে। সে জানল, আজ মারিয়া বিবাহিত ; লারুসেল তাকে বিয়ে করেছে। রেমণ্ড তার পূর্ব স্মৃতি দিয়ে মারিয়াকে জাগাতে চেষ্টা করে। কোন ফল হয় না। মারিয়ার দৃষ্টি উদাস। রেমণ্ড তবুও হার মানতে চায় না।

খানিক বাদে লারুসেল মাতাল হয়ে পড়ে গিয়ে পেল প্রচণ্ড আঘাত। অসহায় মারিয়াকে রেমণ্ডের শরণাপন্ন হতে হয়। খুশী মনে রেমণ্ড এগিয়ে যায় তাকে সাহায্য করতে– ওরা এবার দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়।

রেমণ্ডের সাহায্যে অচৈতন্য স্বামীকে বাড়ি নিয়ে এল মারিয়া।

একটা চিকিৎসক-সম্মেলন উপলক্ষে ডাক্তার কুরাজও প্যারিসে পৌঁছেছিলেন সেদিন। রেমণ্ডের থেকে সে-খবর জেনে মারিয়া ডাক্তারকে টেলিফোন করে আনালো।

মারিয়ার আকুল আহ্বানে সেই গভীর রাত্রে ছুটে এলেন ডাক্তার কুরাজ, নিজের শরীর তুচ্ছ করে। রোগীর ব্যবস্থা করে বিদায় নেবার সময় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেমন করুণ ভাবে ডাক্তার তাকিয়ে থাকেন মারিয়ার দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ মারিয়ার বুঝতে

অসুবিধা হয় না। তবুও নেহাত সৌজন্যের খাতিরে মারিয়া দু'চারটা কথা বলে একরকম জোর করে বিদায় দিল ডাক্তারকে। বাপের পিছনে রেমণ্ডও বেরিয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, ডাক্তার ভোলেন নি মারিয়াকে। বরং এতদিনের ব্যবধানে সে আকর্ষণ হয়েছে আরও গভীর। মারিয়া হাসতে হাসতে স্বামীর কাছে ফিরে এসে বলল ঃ 'তুমি বিদ্রূপ করো না কিন্তু ; আজ মনে হচ্ছে, ডাক্তার আমাকে সত্যিই ভালবাসত।'

স্বামী ঘুমোবার পর রেমণ্ড যেখানে বসেছিল সে জায়গাটিতে মারিয়া তার কম্পিত মুখের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

পথ বিস্তৃত। গভীর রাত্রি। পিতা-পুত্রকে নিয়ে গাড়ী রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলল। উভয়েই নীরব। পরস্পর পরস্পরের চিন্তায় মগ্ন। এক সময় বাপ সেই নীরবতা ভাঙ্গলেন,—

বাপ জানলেন, তিনি ঐ দিনই বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

ছেলে শুধায়,—'আপনার সম্মেলন তো এখনও শেষ হয় নি।'

'না, আমার আর এখানে প্রয়োজন নেই। আমার কাজ, সব প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গেছে। দেখ, আমার বয়স হয়েছে। জীবনে হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তা, তুমি বিয়ে করেছ ?'

'এখনও না',—রেমণ্ড জানায়।

'বিয়েটা এবার তুমি করো, আর্থিক অসচ্ছলতা যখন তোমার নেই। বলছি এজন্য, জীবনে সহজ ভাবে চলার জন্য বিয়েটার প্রয়োজন আছে। আমি নিজে যখনই বিভ্রান্ত হয়েছি, উল্টো রাস্তায় পা বাড়াতে গিয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করেছি তোমার বা তোমাদের মায়ের হাতের স্পর্শ আমার কাঁধের উপর। সেই অনুভূতি সাহায্য করেছে আমাকে সোজা রাস্তায় হাঁটতে।'

রেমণ্ড তার বাবার নূতন পরিচয় পেল ; তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে

ভরে ওঠে রেমণ্ডের মন। তাদের সম্পর্ক শুধু—পিতা-পুত্রের নয়; দু'জনেই মারিয়াকে ভালবেসেছিল, তাকে কামনা করেছিল, কিন্তু দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা তারা একভাবে গ্রহণ করেনি। তার বাবা সংযম ও ধর্মের পথ ধরে চলেছিলেন, আর রেমণ্ড নিয়েছিল পাপের পথ।

রেমণ্ড উপলব্ধি করল: কামনা সংযমের দ্বারা হয় গভীর, ভোগের পথে তা হয় তীব্রতর, জ্বালাকর। তাকে জয় করবার পথ নেই। এই সংসারের মরুভূমিতে মানুষ মরূদ্যানের মতো। দুই মরূদ্যানের মধ্যে দুস্তর অনুর্বর বালুরাশির ব্যবধান। মিলতে চায়, কিন্তু এই ব্যবধানের জন্য তা সম্ভব নয়। তাই অতৃপ্ত কামনা বুকে করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি আমরা।

রেমণ্ডের মনে হল যেন সে একটি কামনার সূর্য; যারা তাকে ভালোবেসে প্রতিদান পায়নি তারা গ্রহ-উপগ্রহের মতো কামনা-সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আর বিকীর্ণ করছে জ্বালাকর উত্তাপ। রেমণ্ড ভেবে পায় না এর হাত থেকে সে কি করে পাবে মুক্তি। হয়ত উপায় নেই, একমাত্র ভগবানের কৃপা ছাড়া।

মুক্তির আহ্বান

আমেরিকার ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (Ernest Hemingway)-এর 'ফর হুম দি বেল টোলস্' (For Whom the Bell Tolls), ১৯৪০, উপন্যাসটির সংক্ষিপ্তসার।

যত সমস্যা ঐ পুলটাকে কেন্দ্র করে। রবার্টের এখন একমাত্র চিন্তা—কি করে ঠিক সময়মত সুষ্ঠুভাবে ইস্পাতের তৈরী ঐ পুলটা উড়িয়ে দেওয়া যায়। তার বিশ্বাস, পুলটা ধ্বংস করে ফেলতে পারলেই সাফল্য তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে।

স্পেনের সারা দেশ জুড়ে তখন গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকার তরুণ শিক্ষক রবার্ট জর্ডান নিজের জীবন তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে স্পেনে। এসেছে সে লয়ালিস্ট গরিলাদের পক্ষ হ'য়ে শক্তিমান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য।

ফ্যাসিস্টদের চোখে ধূলো দিয়ে পাহাড়ী দুর্গম পথ দিয়ে চলছে রবার্ট জর্ডান। যাচ্ছে সে গরিলাদের দলপতির সঙ্গে মিলিত হবার আশায়। বুড়ো আনসেলমো তার পথপ্রদর্শক। তারা যাত্রা করেছিল সূর্যোদয়ের অনেক আগে। চলছে সে বুড়োর পিছু পিছু। রবার্টের মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি এ পথের শেষ নেই ; বুড়ো শেষ পর্যন্ত তাকে হাঁটিয়ে মেরে না ফেললে হয়।

দিনের আলো প্রায় নিভে আসে। তবুও পথের শেষ হয় না। রবার্ট ক্ষুধার্ত, কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও বটে। ক্ষুধার জ্বালা অবশ্য তাকে

মাঝে মাঝে সহ্য করতে হয়। কিন্তু দুশ্চিন্তাকে সে কখনও বড় একটা প্রশ্রয় দেয় না।

রবার্ট নিজের ব্যক্তিগত বিপদ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না। সে জানে, এ রকম ক্ষেত্রে শত্রুব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসা বা তাদের পিছনে চলাফেরা করা প্রায় একই ব্যাপারঃ 'ধরা পড়লে তোমার কি হবে এই কথাটাকে মনের মধ্যে আঁকড়ে থাকলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর যাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে তাদের ওপর কমবেশী আস্থা রাখাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।'

নানা আকারের নানা গড়নের বহু পুল সে এর আগে উড়িয়ে দিয়েছে নিখুঁত ভাবে। শুধু পুল নয়, তার মনে পড়ে তিনটি চলন্ত ট্রেনও সে উড়িয়েছে।

সে ভাবে, আন্‌সেলমো এই পুলটার যত বড় বর্ণনা করুক আসলে পুলটা যদি তার দ্বিগুণও হয় তবুও সেটাকে চমৎকার ভাবে উড়িয়ে দেবার জন্য যতটা বিস্ফোরক দ্রব্য বা অন্যান্য মালমশলার প্রয়োজন হতে পারে, সব তার সঙ্গের ঐ ঝোলা দু'টার মধ্যেই আছে। যে ধরণের পুলই হোক না কেন, তাকে উড়িয়ে দেবার কৌশল তার জানা আছে।

কিন্তু কমরেড সেনাপতি গোল্‌ৎস-এর সতর্ক উক্তি তার মনে পড়ে যায়—

যাত্রা করবার আগের দিন গোল্‌ৎস তাকে বলেছিলেন,—'শুধু পুলটাকে উড়িয়ে দিলে কোন লাভই হবে না কিন্তু। একদম কোন লাভ হবে না।'

'ঠিক কথা, কমরেড সেনাপতি।'

'নির্ধারিত আক্রমণ-কালের ভিত্তিতে হিসাব করে ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে পুলটাকে উড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

রবার্ট জিজ্ঞাসা করেছিল,—'তাহলে কখন ওটা উড়িয়ে দিতে হবে?'

—'আক্রমণ যেই শুরু হবে তক্ষুণি, তার আগে নয়। যাতে করে এই পথ দিয়ে শত্রুর সাহায্যকারীরা এসে পৌঁছুতে না পারে।'

'মনে রেখো, মাত্র এই একটি পথ দিয়েই ওরা সামরিক সাহায্য নিয়ে আসতে পারে। আগে হলে চলবে না। কারণ, কোন কারণে আক্রমণ যদি স্থগিত রাখা হয়, ওরা সেটাকে তাড়াতাড়ি মেরামত করে নিতে পারবে। তাই আক্রমণ শুরু হলেই পুলটাকে উড়িয়ে দিতে হবে। ওখানে শান্ত্রী থাকে মাত্র দু'জন। তোমার সঙ্গে যে লোকটা যাচ্ছে সে সবেমাত্র ওখান থেকে এসেছে। লোকটা নাকি খুব বিশ্বাসী।'

হঠাৎ তার হুঁশ ফিরে আসতে রবার্ট নিজের মনকে শাসন করে—না, আর দুশ্চিন্তা করা চলবে না। দুশ্চিন্তা করা আর ভয় পাওয়া প্রায় একই রকম খারাপ জিনিস। ওতে শুধু কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাতে সহজ কাজ হয়ে ওঠে শক্ত।

ততক্ষণে আন্‌সেলমো দাঁড়িয়ে পড়েছে। রবার্টকে উদ্দেশ্য করে সে বলল—

'তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি।'

সত্যিসত্যিই সে খানিক বাদেই ফিরে এল। তার সঙ্গে এল আর একটি লোক। লোকটির গড়ন ভারী ধরণের, হাত-পাগুলো প্রকাণ্ড বড় বড়। মুখখানা তার গোলাকৃতি তাতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাঁধে একটি বন্দুক ঝোলানো।

বুড়ো এই লোকটিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল—

'ইনিই হলেন পাব্‌লো—এখানকার দলপতি, শক্তিমান পুরুষ।'

রবার্ট জর্ডান উঠে দাঁড়াল। লোকটার উদ্দেশ্যে বলল—

'নমস্কার, কমরেড।'

লোকটি কিন্তু প্রতিনমস্কার জানাল ঈষৎ অনিচ্ছুক ভাবে। তারপর রবার্টের ভারী বোঝাটা পা দিয়ে একটু ঠেলে বলল—'এই-গুলো হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল।'

রবার্ট তার মনের ভাব বুঝে তাকে বলে—

'কি জান, আমি এখানে এসেছি শুধু কর্তব্যের খাতিরে। যাঁরা যুদ্ধ চালাচ্ছেন তাঁদের হুকুমে এসেছি। আমি তোমার সাহায্য-প্রার্থী। অবশ্য তুমি তা অস্বীকার করতে পার। তখন আমাকে খুঁজে নিতে হবে তেমন লোক যারা সাহায্য করতে রাজী আছে।'

একটু থেমে রবার্ট আবার বলতে শুরু করে—

'তোমার কাছে শুধু এইটুকু হলপ করে বলতে পারি যে কাজ করবার হুকুম পেয়ে এসেছি তা অত্যন্ত জরুরী। আমি বিদেশী, সেটা আমার দোষ নয়। জেনো, তোমাদের এই দেশে জন্মাতে পারলে আমি খুশী হতাম।'

রবার্টের উক্তিতে বুঝি কাজ হয়। এবার তারা তিনজন একসঙ্গে চলতে শুরু করে।

ঘন জঙ্গল পার হয়ে তারা ছুটে একটি উপত্যকায় এসে পৌঁছল। সে জায়গাটার আকৃতি অনেকটা একটা বাটির মত। তার এক প্রান্ত পাথরের দেয়ালের মত উঁচু। বোঝা গেল ঐ দেয়ালের নীচেই ওদের আস্তানা।

রবার্টের মনে হল, জায়গাটা আকাশ থেকেও খুঁজে বের করা মুস্কিল। ভালুকের বাসার মত একটি গোপন ডেরা। গরিলাদের উপযুক্ত আস্তানা বটে। ক্রমে ওরা গুহাটির মুখে এসে হাজির হয়।

পাব্‌লো গুহার মধ্যে ঢুকে যায়। ওরা দু'জন বাইরে অপেক্ষা করে।

খানিক বাদে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একটি স্ত্রীলোক। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে। মস্তবড় চেহারা। রোদে পোড়া তামাটে মুখ। গায়ের রং খুব কালো। যেন একটি পাথরের মূর্তি এগিয়ে

এলো। এসেই সে অকথ্য ভাষায় একে ওকে ধমকাতে শুরু করে।

স্ত্রীলোকটি কিন্তু রবার্টকে জানাল সাদর অভ্যর্থনা। খানিক বাদে রবার্ট বুঝতে পারে, ইনিই দলপতির সঙ্গিনী। পাব্‌লোর তুলনায় সে বুদ্ধিমতী, বেশী নির্ভরযোগ্য। মহিলার প্রতাপও কম নয়। সব চেয়ে বড় কথা—মহিলাটি অত্যন্ত দুঃসাহসী, পাব্‌লোর মত নয়; লয়ালিস্টদের জন্য সে যে-কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।

প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীমতী পিলার-এর সঙ্গে রবার্টের কেমন হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।

এবার পিলারের ইঙ্গিতে ওদের সকলকে খাবার পরিবেশন করতে এগিয়ে আসে সুন্দরী মারিয়া। এই স্প্যানিশ তরুণীটিকে দেখে রবার্ট কেমন আকর্ষণ বোধ করে। রবার্টকে দেখে মারিয়ারও মনেও একটু দোলা লাগে বৈ কি! খেতে খেতে মারিয়ার সঙ্গে তার আলাপ হয়। মাঝে মাঝে সে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মারিয়ার দিকে।

রবার্ট জানল, এখানে আসবার আগে ফ্যাসিস্টদের কবলে পড়ে মারিয়াকে চরম লাঞ্ছনা এবং দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। তাদের ঐ পাশবিক অত্যাচারের পর মারিয়ার মনে জেগেছিল গভীর ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা। বেঁচে থাকা মারিয়ার মনে হয়েছিল বিড়ম্বনা মাত্র। সীমান্ত থেকে পালিয়ে আসবার সময় মেয়েটিকে উদ্ধার করে এনেছিল এই গরিলা দলটি। মেয়েটি পিলারের বিশেষ প্রিয়পাত্রী।

মারিয়ার এই দুঃখের কাহিনী শুনে রবার্ট তার প্রতি মমতা বোধ করে। সে গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়।

রবার্টের মনের ভাব মারিয়া বুঝতে পারে। সেও তার প্রতি অনুরক্ত হয়। তাকে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে পাবার জন্য মারিয়ার দেহ-মন উন্মুখ হয়ে ওঠে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে রবার্ট একজন গরিলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায় নিজের চোখে পুলটি একবার দেখবার জন্য। তার সঙ্গে সে মিলিয়ে নিতে চায় সঙ্গের নক্সাটি। তারপর সে তৈরী করবে আক্রমণের পরিকল্পনা।

তখন বিকাল গড়িয়ে গেছে। গাছের আড়াল দিয়ে ওরা দু'জন সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। এমনি করে শেষ দু'শ গজ যাবার পর পাইন গাছের মধ্য দিয়ে ওরা দেখতে পায়—মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরেই সেই পুলটি।

ইস্পাতের তৈরি পুল। একটি মাত্র খিলান। দু'খানা মোটর-গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে এমন চওড়া পুলটা—যেন এক লাফে গভীর খাদটার এপার থেকে ওপারে সেটি চলে গেছে। খাদের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা পার্বত্য নির্ঝরিণী।

রবার্ট তাড়াতাড়ি পুলটির কয়েকটি রেখাচিত্র এঁকে ফেলল; যেখানে যেখানে বিস্ফোরক বসাতে হবে, আপাততঃ সে শুধু সেই জায়গাগুলি চিহ্নিত করে রাখছিল।

আন্‌সেল্‌মো ভাবছিল, পুলের এত কাছে এসে পড়া তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই রবার্ট যতক্ষণ আঁকছিল ততক্ষণ সে পথ, পুল এবং সান্ত্রীঘর দু'টোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। আঁকা শেষ হলে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কাজ সেরে ওরা দু'জন আবার গুহায় ফিরে আসে।

রাত্রে খাবার টেবিলে বসে রবার্ট উপযুক্ত সাহায্য পাবার আশ্বাস পেল পাব্‌লো এবং অন্য একটি দলের নেতার কাছ থেকে। পিলার তাকে এগিয়ে যাবার উৎসাহ দেয়। খুশী মন নিয়ে রবার্ট চলে যায় এবার শুয়ে পড়বার জন্য। সারা দিনের পরিশ্রমে সে ছিল ক্লান্ত।

গরম বিছানার থলির মধ্যে শুয়ে রবার্ট অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

হঠাৎ মাঝ রাতে কি কারণে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানার নীচে রাখা পিস্তলটাকে একটু স্পর্শ করে সে আবার ঘুমোবার উদ্যোগ করে।

ঠিক সেই সময় তার কাঁধের ওপর কার হাতের স্পর্শ পেয়ে সে দ্রুত পাশ ফেরে। তড়িৎ বেগে পিস্তলটা সে তুলে নেয় ডান হাতের শক্ত মুঠোর মধ্যে। কিন্তু আড়ষ্ট চোখ মেলে তাকাতেই সে বলে ওঠে —'ও, তুমি!'

হাতের পিস্তলটি সরিয়ে রেখে রবার্ট তাকে দু'হাতে ধরে ফেলে অনুভব করল, মেয়েটি কাঁপছে। মৃদুকণ্ঠে সে বলল,—'বাইরে ঠাণ্ডা। ভিতরে এস।'

'না, আমার বড্ড ভয় করছে। আমি পারব না।'

'কিচ্ছু ভয় নেই। এদিক দিয়ে ঢুকে পড়।'

মারিয়া থলির মধ্যে ঢুকতে রবার্ট তাকে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে।

'আমার লজ্জা করছে।'

'না, লজ্জা করা চলবে না।'

'যদি তুমি আমাকে ভালো না বাস?'

'সোনামণি, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি।'

হঠাৎ মারিয়ার দেহটা রবার্টের বাহুবন্ধনের মধ্যে কেমন অসাড় হয়ে পড়ে। ভীত কণ্ঠে সে জানায়ঃ 'কিন্তু ওরা যে আমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। তা জেনে তুমি হয়ত আমাকে আর ভালবাসবে না!'

'বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। ওরা কেউ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে নি, সোনামণি।'

রবার্ট অনুভব করে, তার উক্তি শুনে মারিয়ার দেহে আবার উত্তাপের সঞ্চার হয়।

রবার্টের সহসা মনে হ'ল—এমন আনন্দের স্বাদ জীবনে সে আর কখনও পায় নি। সে মারিয়াকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে।

উচ্ছ্বাসে মারিয়া বলে ওঠে—'ভাগ্যিস আমি তখন মরি নি! একি সৌভাগ্য আমার!'

রবার্ট তাকে জানাল, যুদ্ধ শেষে তারা চলে যাবে আমেরিকা। সেখানে তারা দু'জনে সুখের ঘর বাঁধবে। তাই শুনে মারিয়া রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে, কল্পনার জাল বুনতে শুরু করে। মারিয়ার মনে হয় পৃথিবী সুন্দর, জীবন মধুময়।

এবার মারিয়াও রবার্টকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। যেন হারিয়ে না যায়। তারপর শঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'এস—আর দেরি নয়, এইবার তোমার প্রেমের বন্যায় আমার সেই পুরনো পাপের স্মৃতি ধুয়ে যাক। দূর হোক আমার দেহের মালিন্য।'

ভোরবেলা রবার্ট ঘুম থেকে উঠে দেখে, মেয়েটি কখন চলে গেছে। শুধু ঐ দিনটিই তার হাতে আছে। পরের দিন সকালে আক্রমণ শুরু হবে। রবার্ট তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে চলে যায় গুহার দিকে—আক্রমণের তোড়জোড় করতে।

একটু বেলা হতে কিছু মুখে দিয়ে পিলারের সঙ্গে সে বেরিয়ে যায় বাকি সব ব্যবস্থা করতে। ভিন্ গাঁ-এর সেই দলপতির সঙ্গেও আর একবার দেখা হওয়া দরকার! তার আরও কিছু বিশ্বস্ত লোক চাই, চাই কিছু ঘোড়াও। তারা যাত্রা করে।

সন্ধ্যা হ'তে তারা ফিরে এল গুহায়। মোটামুটি একটা আশ্বাস নিয়ে তারা ফিরেছে বটে। রবার্ট কিন্তু খুব বেশী ভরসা পায় না তাতে। যাহোক্ করে এদের নিয়েই সে তৈরি হবে। সে ভাবে, শেষ পর্যন্ত পাব্‌লো আর তার দল ঠিক থাকলেও শেষরক্ষা হবে।

খাওয়া দাওয়া সেরে সে শুতে যায়। কাল সকাল হতেই শুরু হবে আক্রমণ। তাই আজ রাতটা তার পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

মাঝ রাত্রে পিলার এসে রবার্টকে জানাল, তার কিছু জিনিস নিয়ে পাব্‌লো পালিয়েছে। শুনে রবার্ট চম্‌কে ওঠে।

সে পিলারের সঙ্গে ছুটে গিয়ে তার ব্যাগ দু'টো পরীক্ষা করে জানল, সর্বনাশ, বিশ্বাসঘাতক মাতালটা ব্যাটারিটা এবং ডেটনেটার গুলো নিয়ে পালিয়েছে। রাগে, দুঃখে রবার্টের গা জ্বলে যায়।

পিলারেরও এজন্য রাগ বা দুঃখ কম হয় নি। রবার্ট কিন্তু নিজেকে সামলে নেয়। পিলারের কাছে কোন রাগ প্রকাশ করল না। সে জানে, তখন একমাত্র পিলার-ই তার আশা-ভরসা। পিলার রবার্টকে অভয় দেয়, সে পাব্‌লোর ভূমিকায় কাজ করবে।

রবার্ট স্থির করল, বিপজ্জনক হলেও অগত্যা তাকে হাতবোমার সাহায্যে পুলের বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। সে পিলারকে শান্ত হতে বলে।

—'যাও পিলার, তুমি বিশ্রাম করগে, এখনও রাত আছে।'

রবার্ট নিজে তার ঘুমোবার থলিতে ফিরে এসে ঘড়ির গতি লক্ষ্য করতে থাকে। তখন রাত আর বেশি নেই। রবার্ট বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে হাজির হল গুহাতে। ততক্ষণে অন্যান্য সকলেও উঠে পড়েছে। সকলকে তাদের নির্দিষ্ট কাজ রবার্ট বুঝিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে পিলার কিছু খাবারও তৈরী করে ফেলেছে। যাত্রার আগে সকলেই কিছু মুখে দিয়ে নিচ্ছে। ঠিক সেই সময় পাব্‌লো পিছন দিয়ে এসে হাজির হল। ওরকম ভাবে পালিয়ে যাবার জন্য সে অনুতপ্ত। যাহোক্, পাব্‌লো জানালো সে আরও কিছু গরিলা এবং ঘোড়া সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। তারা হুকুমের জন্য অদূরে অপেক্ষা করছে। পাব্‌লো প্রতিজ্ঞা করে সে-ও যথাসাধ্য তাদের সঙ্গে লড়াই করবে।

আবার একবার যে-যার কাজ বুঝে নিয়ে সকলে অন্ধকার থাকতেই রওনা হলো পুলটির দিকে।

পাব্‌লো তার নতুন দলটিকে নিয়ে পিছন দিকে চলে যায়—যাতে করে ওদিক থেকে ফ্যাসিস্ট বাহিনী পুলের দিকে এগুতে না পারে। অন্ততঃ যতক্ষণ রবার্টের কাজ শেষ না হয়।

দু'চার জন এদিক ওদিক পাহারায় রইল। ঘোড়াগুলির কাছে থাকে মারিয়া এবং অদূরে পিলার।

রবার্ট আন্‌সেল্‌মোকে নিয়ে পুলের আরও কাছে এগিয়ে যায়। প্রথমেই তারা পুলের সান্ত্রী দু'টাকে গুলি করে মারলে। তারপর রবার্ট তার বিস্ফোরক এবং অন্যান্য জিনিসগুলি নিয়ে পুলটির ওপর চলে যায়। সে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে তার কাজ সেরে ফেলে।

ততক্ষণে পাব্‌লো খুব জোর আক্রমণ চালিয়েছে। প্রচণ্ড শব্দ করে একটি বোমা ফাটার শব্দ হতে রবার্ট বুঝে নিল—তার সঙ্কেত। তড়িৎ বেগে সে তারে-বাঁধা পিনটি টেনে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ জোরে শব্দ হয়ে মাঝখান দিয়ে ইস্পাতের পুলটি আকাশের দিকে উঠে যায়। আত্মরক্ষার জন্য রবার্ট ছুটে গিয়ে নীচের নালাটির ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বুড়ো আন্‌সেল্‌মোর অদৃষ্ট খারাপ। পুলের একটি তপ্ত লোহার টুকরো উড়ে এসে তার বুকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। বুড়ো আর নড়ল না।

বুড়োর অবস্থা দেখে রবার্টের মন ব্যথায় ভরে ওঠে। সে জানে, ডেটোনেটারগুলি পাব্‌লো ওরকম ভাবে চুরি না করলে এ বিপত্তি ঘটতো না। কিন্তু তখন শোক বা রাগ করবার অবকাশ কোথায়?

রবার্ট ছুটে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় তার দলের সঙ্গে মিলিত হলো। সে জানল, তাদের দলের অনেকে হত হয়েছে; ঘোড়ার লোভে পাব্‌লো তার সঙ্গের গরিলা ক'জনকে হত্যা করেছে।

কিন্তু সেজন্য পাব্‌লোর থেকে কৈফিয়ৎ চাইবারও সময় নেই।

এবার তাদের পালাতে হবে। আরও একটুও দেরি করলে চলবে না। সামনের ঐ বিপজ্জনক রাস্তাটি যে-করে হোক এক্ষুণি তাদের পার হওয়া দরকার। তা ছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই।

এখন পাব্‌লোই পথ-প্রদর্শক। সুতরাং স্থির হল প্রথমে সে যাবে। তার পিছনে যাবে যথাক্রমে—মারিয়া, পিলার এবং অন্য দু'জন গরিলা। সব শেষে যাবে রবার্ট।

প্রথম চারটি ঘোড়া নিরাপদেই ছুটে চলে গেল। বিপদে পড়ে শেষের যাত্রী দু'জন। অবিরাম গুলির বৃষ্টি হচ্ছে সেই রাস্তাটির ওপর। তারই মধ্যে রবার্টের আগের গরিলাটি অনেক কষ্টে পার হয়ে যায়। পিছনে পড়ে থাকে শুধু রবার্ট আর তাদের মালবাহী ঘোড়াটি।

তার দলের লোকরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে গুলির বর্ষণ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। রবার্টের ঘোড়াটি অনড়। তায় মালবাহী ঘোড়াটিকে নিয়ে আরেক সমস্যা। চারিদিক থেকে শুধু 'হুশ-শ্-ক্রড়-কড়াৎ' শব্দ হচ্ছে।

খানিকক্ষণ কোন শব্দ সে শুনতে পায় না। কিন্তু একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে রবার্টের আচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়। সে দেখল, তার বড় ঘোড়াটার নীচে সে পড়ে আছে। ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় দাপাদাপি করছে। রবার্টের বাঁ পা-খানা একদম নিশ্চল হয়ে মাটির ওপর পড়ে আছে। সে নিজেকে ঘোড়ার দেহের চাপ থেকে টেনে বের করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কোন ফল হয় না।

রবার্টের দেরি দেখে তার একটা কিছু বিপদের আশংকা করে তার সঙ্গীরা সেদিকে আবার সকলে ফিরে আসে।

পাব্‌লোকে উদ্দেশ্য করে রবার্ট বলে—

'দেখতেই তো পাচ্ছ আমার অবস্থা। আমার জন্য ভেবো না।

যুদ্ধের সময় এমন অনেক কিছু হয়ে থাকে। মেয়েটির সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য আমি কথা বলব, তারপর তোমরা সরে পড়।'

ওর অবস্থা দেখে মারিয়া কাঁদতে শুরু করে।

'মারিয়া, কেঁদ না। আমাদের মধ্যে যতক্ষণ একজন বেঁচে থাকব ততক্ষণ দু'জনই আছি, জেনো। এইবার তোমাকে যেতে হবে। কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গেই থাকবো সর্বক্ষণ।'

রবার্টের গলা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মারিয়া বলে—'না, আমি তোমার কাছেই থাকবো।'

'না, না এখন আমাকে যা করতে হবে, একলাই করতে হবে। তুমি চলে গেলে আমার উপকার করা হবে।'

'কিন্তু রবার্ট, তুমি দয়া করে আমার কথাটাও একবার ভাবো। তোমাকে ছেড়ে আমি একা কি করে থাকব, বল।'

'আমি জানি তোমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু ভেবে দেখ এখন আমি আর তুমি তো আলাদা নই—একই।'

সে কথা মারিয়ার মন মানে না। সে মাথা নাড়ে।

'এখন আমি তো শুধু তোমার মধ্যেই বেঁচে থাকবো। উঠে দাঁড়াও।'—রবার্টের কণ্ঠে মিনতি।

কাঁদতে কাঁদতে মারিয়া এবার উঠে দাঁড়ায়।

'না, না কান্না চলবে না, সোনামণি। এবার চলে যাও—তাহলে দু'জনেরই যাওয়া হবে।'

মারিয়া তবুও দাঁড়িয়ে থাকে। তখন রবার্টের ইঙ্গিতে পিলার মারিয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়।

'এইবার তোমরা চলে যাও। মেয়েটির ওপর একটু নজর রেখো। আর দেরি করো না তোমরা।'—রবার্টের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

মারিয়া পিছন ফিরে রবার্টের দিকে তাকাতে যাচ্ছিল। তা দেখে শান্ত কণ্ঠে রবার্ট বলে ওঠে—'না, না ফিরে তাকিও না। আমি তোমার সঙ্গেই আছি। এগিয়ে যাও।'

রবার্ট তাদের গতিপথে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে রবার্ট হঠাৎ দেখল, তাদের ঘোড়ার পদচিহ্নের ওপর নজর রেখে ফ্যাসিস্ট লেফ্‌টেনাণ্ট তার সাব-মেশিন গানটা উঁচু করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। যেন মৃত্যু চুপি চুপি এগিয়ে আসছে।

ততক্ষণে অত্যন্ত সাবধানে সে নিজের দেহটাকে তুলে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নিয়েছে। দেহের যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। তবুও সে তার বন্দুকটি একবার পরীক্ষা করে সেটি হাতে তুলে নিল। রবার্ট প্রস্তুত। এখন সে ঐ অফিসারটির জন্য প্রতীক্ষা করছে।

স্বাধীনতার পণ

আইসল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ লেখক হালডোর কিলিয়ান ল্যাক্সনেস (Halldor kiljan Laxness)-এর 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পীপ্‌ল' (Independent People), ১৯৩৫, উপন্যাসের গল্পরূপ।

নায়েব জন-এর জমিতে বিয়ারতুর মজুরের কাজ করে। মজুর নয় তো যেন ক্রীতদাস। তার জীবনে কোন আশা নেই, ভরসা নেই—নেই কোন সম্ভাবনা। তবুও সে কল্পনা-বিলাসী। বিয়ারতুর মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে,—একদিন সেও জমির মালিক হবে।

বামন কোনদিন চাঁদের নাগাল পেয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে অসম্ভব-ও কখন কখন সম্ভব হয়।—আঠারো বছর পরে বিয়ারতুরের স্বপ্ন সত্যই একদিন সফল হ'ল।

সে জমি পেল ; জমির মালিক হ'ল।

—লোকালয় থেকে দূরে, পাহাড়ের গায়ে বরফে ঢাকা প্রায় অকেজো এক ফালি মাঠ। তবুও ত জমি! এ জমিটা কোনদিন কারুর কোন কাজে লাগবে বলে কেউ কখনও ভাবে নি। জমির মূল্য বিয়ারতুরকে নগদ গুণতে হল না। দক্ষিণাটা অবশ্য তাকে একটু মোটা কিস্তিতে শোধ করতে হবে! তা হোক্। বিয়ারতুর হাতে স্বর্গ পেল। তার আনন্দের সীমা নেই। এখন সে আর মজুর নয়, রীতিমত জমির মালিক।

বিয়ারতুর এবার মনে মনে ঠিক করে,—সে এখন থেকে কোন

জমিতে আর মজুরের কাজ করবে না। সে ভেড়ার ব্যবসা করবে। তাতেই ভাগ্য খুলবে বলে সে আশা করে।

এবার সে ঘর বাঁধতে চায়—ঘরণীর সঙ্গ পেতে চায়।

আগেকার সহকর্মিণী রোজাকে বিয়ে করে সেই জনহীন প্রান্তরে বিয়ারতুর একদিন ঘর বাঁধল। রোজা স্বামীর ঘর দেখে হতাশ হয়। এদিকে বিয়ারতুরও রোজাকে বিয়ে করে সুখী হ'তে পারে কই? ছ'দিন বাদেই সে বুঝতে পারে,—রোজাকে সে যতটা নিরীহ মনে করত আসলে সে মোটেই তা নয়। সে জানতে পারল—বিয়ের আগেই রোজা অন্য পুরুষকে আত্মদান করেছিল। তার বিষফল সে এড়াতে পারে নি। সেই অবৈধ মিলনের স্বাক্ষর রোজার দেহে এখন ফুটে বেরিয়েছে। এ কথাও বিয়ারতুরের অজানা রইল না,—নায়েবের ছেলে ইঙ্গলফুর-ই রোজার এই অবস্থার জন্য দায়ী।

বিয়ারতুর কিন্তু স্ত্রীকে ত্যাগ করল না। রোজা স্বস্তি পেল।

স্থানীয় লোকদের ধারণা—বিয়ারতুরের এলাকা অপদেবতার রাজত্ব। রোজা স্বামীকে মিনতি করে, পূজা দিয়ে তাঁদের রোষ তুষ্ট করতে। তা না হলে সংসারের অমঙ্গল হবে। স্ত্রীর এ অনুরোধকে বিয়ারতুর মেয়েসুলভ দুর্বলতা বলে মনে করে; তার উক্তি সে হেসে উড়িয়ে দেয়। স্ত্রীর কান্নাও স্বামীর দৃঢ়তাকে টলাতে পারে না।

স্বাধীনতার স্বাদ আলাদা। আঠারো বছর পর স্বাধীনতা পেয়ে কারুর কাছে মাথা নোয়াবার কথা বিয়ারতুর এখন ভাবতে পারে না। ইতিমধ্যে তাকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। কিন্তু ভূত-প্রেতের কাছে নতি স্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে তা কোনদিন করে নি, করবেও না।

জমির দেনা শোধ করবার জন্য বিয়ারতুরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সে কষ্ট করে দিন কাটায়। শুকনো নোনা মাছ তার

প্রধান খাদ্য। রোজা স্বামীর মত অত কষ্টে অভ্যস্ত নয়। তাছাড়া ঐ একঘেঁয়ে শুকনো মাছও তার রুচতে চায় না। একটু মাংসের ঝোলের জন্য রোজা মাঝে মাঝে লালায়িত হয় বৈ কি।

বিয়ারতুর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়,—কি জান, কষ্টটা জীবনে বড় কথা নয়। সঙ্কল্প হচ্ছে আসল কথা। সবার আগে তাকে জমির দেনা শোধ করতে হবে। স্বাধীন চাষী হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে। বিয়ারতুর দৃঢ় কণ্ঠে জানায়,—

'স্বাধীন ব্যক্তির জন্য ক্ষুদই যথেষ্ট; স্বাধীনতা মিষ্টান্ন হতেও প্রিয়।'

—রোজা স্বামীর উক্তি নীরবে মেনে নেয়।

বিয়ারতুর এবার ভেড়ার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। ক'দিন বাদে বাড়ী ফিরে সে জানতে পারল স্ত্রী সন্তানকে জন্ম দেবার সময় ইতি-মধ্যে মারা গেছে। শিশু কন্যাটিকে দেখে সে কিছুটা সান্ত্বনা পায়। সে ভুলে যায় শিশুর জন্মের ইতিহাস—তার জন্মদাতার কথা। বিয়ারতুর শিশুটিকে বুকে তুলে নেয়। বিয়ারতুর আদর করে মেয়ের নামে রাখে,—"অস্টা" সোলিলিয়া অর্থাৎ 'স্বাধীনা'—দেহে মনে স্বাধীন।

নায়েবের স্ত্রী দুঃস্থা ফিনা এবং তার মা-কে পাঠাল বিয়ারতুর ও তার শিশুটিকে দেখাশুনা করবার জন্য। ফিনার বয়স প্রায় চল্লিশ। কিন্তু বিগত-যৌবনা নয়। তার স্বাস্থ্য এখনও আকর্ষণ করে। বিয়ারতুর তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবস্থাই করল। সে ফিনাকে বিয়ে করল। অবশ্য শাশুড়ীও তার বাড়িতে থেকে যায়।

ফিনা প্রতি বছর সন্তানের জন্ম দেয়—অবশ্য তাদের মধ্যে মরা সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়। ফলে, ক'বছরের মধ্যে বিয়ারতুরের সংসার বেড়ে যায়।

চোদ্দ বছর পশুর মতো খেটে বিয়ারতুর জমির দেনা শোধ করল। সে এখন স্বাধীন। এই স্বাধীনতার জন্য কোন মূল্য দিতে সে কসুর করে নি।

বিয়ারতুর গরু পালন পছন্দ করে না। তার পেছনে খরচ বড্ড বেশী, লাভ সামান্য। সেই টাকা ভেড়ার পেছনে খরচ করলে লাভ বেশী। ভেড়ার মূল্য অনেক—বিদেশে রপ্তানি হয়। ভেড়ার দৌলতেই আজ তার দেনা শোধ হয়েছে, তার অবস্থা ফিরেছে। সে বাঁচবার শক্তি পেয়েছে—তার আত্মপ্রত্যয় হয়েছে।

একবার কি একটা রোগ এল বিয়ারতুরের ভেড়ার পালে। ভেড়াগুলি পর পর মারা গেল চোখের ওপর। লোকে বলল, অপদেবতার রোষদৃষ্টি পড়েছে। দেবতার রোষ শান্ত করার জন্য তারা বিয়ারতুরকে উপদেশ দেয়—পূজা দেবার জন্য। অসম্ভব! বিয়ারতুর ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। ভেড়ার মড়কে তার ক্ষতি হল বিস্তর। তার রোজগারের পথও প্রায় বন্ধ।

কিন্তু বিয়ারতুরকে বাঁচতে হবে। হতাশ হলে চলবে কেন? ছেলে-মেয়েদের মুখে অন্ন যোগাতে হবে—সংসার বাঁচাতে হবে। তাকে বাঁচতে হবে। আবার তাকে ভেড়া কিনতে হবে। কিন্তু অর্থ কোথায়? তাই বিয়ারতুর স্থির করে সে সহরে যাবে, চাকরি করে অর্থ উপার্জন করবে।

তাকে কিছুদিন সহরে থাকতে হবে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ততদিন বন্ধ থাকতে পারে না। তাই যাবার আগে ওদের জন্য বিয়ারতুর একজন মাস্টার বাড়িতে রেখে যায়।

পিতার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই বাউণ্ডুলে মাস্টারের সঙ্গে অস্টার একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস। পিতা

বাড়ি ফিরে দেখে তার মেয়ে সন্তানসম্ভবা। রাগে, দুঃখে সে আদরিণী মেয়েকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

অস্টা তখন রঙিন স্বপ্নে বিভোর। প্রেমিকের ঘরণী হবার বাসনায় অস্টা খুশী মনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু মাস্টারের বাড়ি এসে তার আশাভঙ্গ হয়। জানল, তার প্রেমিক শুধু বিবাহিত-ই নয়, সে বহু সন্তানের বাপ ; আরও একটি আসি আসি করছে।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। য়ুরোপে আইস্‌ল্যাণ্ডের সব জিনিসপত্রের চাহিদা বেড়ে গেছে। ভেড়াও চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। দেশের অবস্থা দ্রুত ফিরছে। জমির দামও বেড়ে গেছে অনেক। বিয়ারতুর কিন্তু চড়া দাম পেয়েও তার জমি বিক্রির কথা ভাবে না।

বিয়ারতুরের অবস্থা এখন ভাল। যদিও ইতিমধ্যে সে অনেক প্রিয়জন হারিয়েছে।—স্ত্রী দু'জনই মারা গেছে। এক ছেলে বরফ ঢাকা পাহাড়ের কোন এক চোরা-গহ্বরে হারিয়ে গেছে। অস্টা নেই। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই ছোট ছেলে নোন্নি বড় হবার স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকায় চলে গেছে। এবার ছোট ছেলের আদর্শে সতেরো বছরের ছেলে গোয়েন্দুর এসে বাবাকে জানাল,—সেও যাবে আমেরিকায়। বিয়ারতুরের আশা ছিল এ ছেলেই জমির কাজকর্ম শিখবে—তাকে সাহায্য করবে। তার সে আশা পূর্ণ হল না।

স্বাধীনতার পূজারী বাপ ছেলের পথে দাঁড়াল না। শুধু বলল,—'নিজের রাজত্ব ছেড়ে তুমি যাচ্ছ অন্যের দাসত্ব করতে ; যাও, আমি তোমাকে বাধা দেব না। যতদিন বাঁচব একাই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকব।'

ইতিমধ্যে নায়েব-নন্দন ইঙ্গলফুরের পরিচালনায় দেশে সমবায় সমিতি, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি চালু হয়েছে—দেশের উন্নতির জন্য।

পাকা বাড়ি তৈরি করবার জন্য সমবায় সমিতি একদিন বিয়ারতুরকে মালমশল্লা গছিয়ে দিয়ে গেল। পাকা বাড়ির লোভ বিয়ারতুর সামলাতে পারল না।

বাড়ি করতে গিয়ে বিয়ারতুরের অনেক ঋণ হয়ে গেল ব্যাঙ্কের কাছে। এদিকে যুদ্ধ থেমে যাওয়াতে ভেড়ার দাম দ্রুত নামতে থাকে। আসল টাকা দূরের কথা, সুদ শোধ করবারও ক্ষমতা নেই বিয়ারতুরের। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ শোধ করতে না পারায় বিয়ারতুরের সম্পত্তি নিলামে উঠল। যে খামার সে বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল—নিমেষে তা সব শেষ হয়ে গেল। গৃহ প্রবেশের আগেই তাকে গৃহ-হারা সর্ব-হারা হতে হ'ল।

বিয়ারতুরের বয়স কম হয় নি। শক্তি সামর্থ্য কমে গেছে অনেক। তবুও কিন্তু সে দমবার পাত্র নয়। সে স্থির করে,—লোকালয় থেকে আরো অনেক দূরে নির্জন পাহাড়ের গায়ে আবার একটা নতুন খামার সে গড়ে তুলবে।

তার নিরুদ্দেশ যাত্রার আয়োজন হয়। সঙ্গী হল বুড়ী শাশুড়ী আর বহুদিনের প্রিয় জরাগ্রস্ত ঘোড়াটা। ঘোড়াটাকে সে চাষের কাজে লাগাবে। বিয়ারতুরের আজ অস্টাকে বড্ড মনে পড়ে—

পথে অস্টার সঙ্গে তার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যায়। বিয়ারতুর জানল, মাস্টার অস্টাকে বহুদিন আগেই ত্যাগ করেছে। বিদায় দেবার আগে প্রেমিক তাকে ক্ষয় রোগটি উপহার দিয়েছিল। তবুও বাপের মত মেয়েও আজ স্বাধীন। যদিও এখন সে তৃতীয় সন্তানের মা হতে চলেছে; নাই বা থাকল তার শেষের দু'সন্তানের পিতৃ-পরিচয়। অস্টা বাপের পাশে এসে নীরবে দাঁড়ায়। বাপ মেয়েকে বুকে তুলে নেয়।

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ারতুর আবার চলতে শুরু করে। তাদের চলার পথে এক সময় ইঙ্গলফুর এসে হাজির হয় অস্টার সামনে।

অস্টাকে সে জানায়—সেই তার জন্মের জন্য দায়ী। অস্টা তার আত্মজা। ইঙ্গলফুর অস্টার এ দুঃসময়ে তাকে আশ্রয় দিতে চাইলে অস্টা তার সে করুণা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে।

বৃদ্ধ বিয়ারতুর আরও উত্তর দিকে এগিয়ে চলে—নতুন আশ্রয়ের আশায়, নতুন অঞ্চলের ভরসায়।—যেদিকে পথের নিশানা নেই, পড়েনি মানুষের পায়ের চিহ্ন। বিয়ারতুর সেখানে আরও কঠিন জীবন যাপন করবে, আরও কঠোর পরিশ্রম করবে। সেখানে সে আবার বিজয়-নিশান ওড়াবে।

মহামারী

ফরাসী সাহিত্যিক আলবেয়ার কামু (Albert Camus)-এর 'দি প্লেগ' (The Plague), ১৯৪৭, উপন্যাসের সারাংশ।

১৯৪০ সাল।

আলজিরিয়ার ওঁরা সহরে হঠাৎ ইঁদুরের মড়ক সুরু হোলো। শহরের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার বেরনার রিঁয়ো-ও ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন কিন্তু কিছু সন্দেহ করলেন না। ক'দিন বাদে তাঁর বাড়ীর সিঁড়িতেও একদিন সকালে তিনটি সদ্য-মরা ইঁদুর দেখা গেল। বাড়ীর দারোয়ান ইঁদুরের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে বিচলিত হয়ে কর্তার গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলো—কিন্তু কোন ফল হোলো না।

ডাক্তার একেই ব্যস্ত মানুষ—তার ওপর তখন রুগ্না স্ত্রীর স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জায়গা পরিবর্তনের একটা ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে—তাই তিনি আরও ব্যস্ত। অন্য কিছু নিয়ে ভাববার ডাক্তারের সময় কোথায় ?

এদিকে শহরে ইঁদুরের মড়ক ক্রমেই বেড়ে চললো। ডাক্তার রিঁয়ো কিন্তু তবুও নিরুদ্বিগ্ন। এই সময়ে বাড়ীর সেই দারোয়ান একদিন প্রবল জ্বর আর অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে মারা গেল। এবার কর্তার মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগে। ডাক্তার একটু চিন্তিত হলেন। তবে কি—! অন্যান্য ডাক্তারদের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে ব্যাপারটা এবার তিনি বুঝতে পারলেন। পাছে সহরের লোক বেশী বিচলিত

হয়ে পড়ে—এই ভেবে কর্তৃপক্ষ গোড়ার দিকে এই মারাত্মক প্লেগের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু লোকের দৈনিক মৃত্যুর হার ত্রিশ পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারিস থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এলো। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হোলো—শহরে প্লেগ শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শহর থেকে কারো বাইরে যাওয়া বা বাইরে থেকে শহরে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। চিঠিপত্র বা টেলিফোনের ব্যবস্থাও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হোলো। একমাত্র টেলিগ্রাফের ক্ষীণ যোগসূত্র ছাড়া শহরবাসী বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

মহামারীর বিভীষিকা আর রোগের বলি দিন দিন বাড়তে থাকে। গাড়ী গাড়ী মৃতদেহ পরিষ্কার করেও কূল পাওয়া গেল না। কে সেবা করবে? কে-ই বা মৃতের সৎকারের কথা ভাববে?

এর মধ্যেই ডাক্তার রিঁয়োর নেতৃত্বে এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠলো। শুরু হোলো মৃতদেহের সৎকারের প্রয়াস, শহরের আবর্জনা পরিষ্কার আর সেই সঙ্গে আর্তরোগীর সেবা। ডাক্তার রিঁয়ো নিজে হাঁসপাতালের রোগীদের চিকিৎসার ভার নিলেন।

রিঁয়োর চার পাশে ছিল আরও কয়েকটি চরিত্র—রেমণ্ড র‍্যাঁচার, প্যারিসের সাংবাদিক, প্লেগ শুরু হবার আগেই এ শহরে এসেছিলেন স্থানীয় শ্রমিকদের সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। শহরে কোয়েরাণ্টাইন জারী হবার পর তিনি শহর থেকে পালাবেন বলে ভেবেছিলেন কিন্তু মহামারীর মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তিনি শুধু অভিভূতই হলেন না—রোগের প্রতিরোধে নাগরিকদের উদ্যোগ দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন ডাক্তার রিঁয়োর সেবাবাহিনীতে।

এই মহামারী আরম্ভ হবার পর স্থানীয় পাদ্রী প্যানেলা নাগরিকদের বাণী দিলেন, তাদের পাপের শাস্তি হিসাবেই ঈশ্বর এই কাল-

ব্যাধি পাঠিয়েছেন। ক'দিন বাদে একটি নিষ্পাপ বালকের মর্মান্তিক মৃত্যুর দৃশ্য দেখে ঈশ্বরের বিচারের ওপর তাঁর আগেকার বিশ্বাসে ফাটল ধরলো। তিনি এবার বাণী দিলেন—'সব অবস্থাতেই মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা সহজ ভাবে মেনে নিতে হবে।' তারপর, নিজে যখন প্লেগে আক্রান্ত হলেন তখন পাদ্রী প্যানেলা তাঁর বাণীর কথা ভুলে গিয়ে অসহায়ভাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন সেই ডাক্তার রিঁয়োর-ই হাতে।

কিন্তু প্যানেলা বাঁচলেন না।

পাবলিক প্রসিকিউটারের ছেলে—তাঁরো। গৃহত্যাগ করে রাজনৈতিক দলে সে যোগ দিয়েছিলো। এবার সে-ও এই স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তার জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজে পেল।

সামান্য বেতনের কেরাণী গ্রঁা—অদ্ভুত চরিত্র তার। কোন পদোন্নতি হয়নি, ভবিষ্যতে হবার আশাও নেই। রোজ অফিস-ফেরত সে তার বহুদিনের কল্পিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে বসে। এতদিনে তার বক্তব্যের শুধু প্রথম কথাটিই লেখা হয়েছে। বছরের পর বছর প্রতিদিন সে ঐ একটি কথাকেই নতুন করে লেখে—সেই এক লাইনের বেশী আর এগুতে পারে না। এদিকে স্ত্রী জেনীও তাকে ত্যাগ করে গেছে এক সময়।

পুরোনো আসামী কটার্ড! সুযোগ বুঝে কোন ফাঁকে এই শহরে পালিয়ে এসে কোয়েরাণ্টাইনের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। এখানে এসে তার সুখেই দিন কাটছিল—কিন্তু তার বরাতে সে সুখ বেশী দিন সইল না। শহরের অবস্থার একটু উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হোলো।

আট মাস পর।

জানুয়ারী মাসে ঠাণ্ডা হাওয়া ফিরে এলো ; সঙ্গে সঙ্গে শহরকে মুক্তি দিয়ে এই কাল ব্যাধি প্লেগও বিদায় নিল। রাজপথ আবার জনতায় মুখর হয়ে ওঠে। দুঃসহ বিচ্ছেদের অবসানে স্বামী-স্ত্রী ও প্রেমিক-প্রেমিকার আনন্দমিলনে এবার আর কোন বাধা থাকে না।

ডাক্তার রিঁয়ো সবে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছেন, এমন সময় এলো তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ।

এর মধ্যে তাঁকে অনেক সহকর্মী বন্ধুকে হারাতে হয়েছে—সহ্য করতে হয়েছে অনেক দুঃখ আর গ্লানি! তবু নিরাসক্ত মনে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি প্লেগের বিভীষিকার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন—মানুষের রোগে দুঃখে সেবা করার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন।

স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদেও আজ তাই তিনি বিচলিত হলেন না।

রোগমুক্ত শহরের রাজপথ বহুদিন পরে আবার আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে।

সেই জনপ্রবাহের দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাক্তার রিঁয়ো পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ডক্টর জিভাগো

রাশিয়ান ঔপন্যাসিক বোরিস পাস্তেরনাক (Boris Pasternak)-এর 'ডক্টর জিভাগো' (Doctor Zivago), ১৯৫৮, উপন্যাসটির সংক্ষিপ্তসার।

জিভাগো বহু কল-কারখানা এবং ব্যবসায়ের মালিক। তিনি মস্কো শহরের একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী।

নিয়তির পরিহাস। জুয়া এবং সুরার স্রোত অল্প দিনেই তাঁর সেই বিপুল ঐশ্বর্য ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কুসঙ্গের ফাঁদে পড়ে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে অসহ্য। একদিন তিনি একটি চলন্ত রেলগাড়ীর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে-জীবন থেকে মুক্তি পেলেন।

জিভাগোর একমাত্র ছেলে য়ুরি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল। সে তার মা'র সঙ্গে থাকত। পিতা যে মা'কে ত্যাগ করেছিলেন সে-কথা তার জানা ছিল না—প্রয়োজনও বোধ করে নি। দশ বছর বয়সে য়ুরি মাকেও হারাল।

অনাথ য়ুরি আশ্রয় পেল তার মামা নিকোলের কাছে। মামা রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য সদাব্যস্ত। তিনি আদর্শবাদী ভাবুক—তলস্তয়ের আদর্শে বিশ্বাসী। নিকোলে এমন এক পথের সন্ধান করছেন যে-পথ দিয়ে দুনিয়াতে আসবে শান্তি ও সমৃদ্ধি।

ভাগ্নের পড়াশুনা তদ্বির করবার মামার সময় কোথায়? তাই য়ুরিকে রাখা হল মস্কো শহরে অধ্যাপক গ্রোমেকোর বাড়িতে। য়ুরি শিক্ষাগুরুর সঙ্গে সেখানে একজন মনের মত সঙ্গীও পেল—অধ্যাপকের মেয়ে তোনিয়া, য়ুরির সমবয়সী।

১৯১২ সাল। শ্রীমতী তোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি লাভ করল। য়ুরি পাশ করল চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতক পরীক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে য়ুরি চাকরি পেল এক হাসপাতালে। য়ুরি এবার পরিচিত হল 'ডক্টর জিভাগো' নামে।

কিছুদিন পরের কথা। অধ্যাপকের স্ত্রী শ্রীমতী আন্না'র কাছে পরপারের ডাক এল। মৃত্যুশয্যায় তিনি তোনিয়া এবং পুত্রসম জিভাগোর হাত দুটি একত্র করে অনুরোধ করলেন—'তোমরা বিয়ে কোরো'।

মৃত্যুপথের যাত্রীর শেষ অনুরোধ ওরা রেখেছে: তারা দু'জন বিয়ে করেছিল। সুখেই ওদের দিন কাটছিল। ডাঃ জিভাগো থাকেন হাসপাতালের কাজ নিয়ে; আর দামাল ছেলেকে নিয়ে কি করে যে সময় কেটে যায় তোনিয়া টের পায় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সারাদেশ জুড়ে এলো অশান্তি। জর্মনদের সঙ্গে যুদ্ধ—হোয়াইট রাশিয়ানদের সঙ্গে বিবাদ।

সীমান্তের হাসপাতালে আহতের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলে। সেই দূরের কোন এক হাসপাতাল থেকে ডাঃ জিভাগোর ডাক আসে। তাঁকে সেখানে ছুটে যেতে হয়। ইতিমধ্যে জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হতে জিভাগোর মস্কো শহরে ফিরে আসতে দেরী হয়।

নিঃসঙ্গ প্রবাসে জিভাগো নতুন করে পরিচিত হবার সুযোগ পান মস্কোর মেয়ে—হাসপাতালের নার্স লারার সঙ্গে। স্কুলজীবনে জিভাগো একবার এক বিশ্রী পরিবেশে এই লারাকে অকস্মাৎ দেখেছিলেন—

ধূর্ত আইনজীবী কোমারোস্কোভ ছিল লারার পিতৃবন্ধু। তাদের পরিবারের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিশোরী লারার ওপর সে যে কুৎসিত প্রভাব বিস্তার করেছিল তা থেকে অবশ্য মেয়েটির মুক্তি

পাওয়া কঠিন ছিল। কোমারোস্কোভ এবং লারাকে ছেলেবেলায় যে ইঙ্গিতময় পরিবেশে দেখেছিলেন জিভাগো আজ পর্যন্ত সে স্মৃতি ভুলতে পারেন নি।

কিন্তু বড় হয়ে লারা নিজের অবস্থা উপলব্ধি করেছিল। তাই সে কোমারোস্কোভের ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে—সেই বদমাইশকে সে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

লেখাপড়া শিখে লারা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়েছিল। সে বিয়েও করেছিল—স্কুল-শিক্ষক পাশাকে। গোড়াতে ওদের বিবাহিত জীবন অ-সুখী হয় নি। লারার একটি ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে।

তবুও কি জানি কেন? একদিন লারাকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ পাশা স্বেচ্ছায় সেনাদলে নাম লিখে উধাও হয়ে যায়।

স্বামীর অনেক খোঁজ করল লারা। কোন ফল হল না। বহু দিন কেটে গেল। পাশার কোন খবর না পেয়ে লারা হয় উৎকণ্ঠিত। লোকের মুখে শুনল সে নানা কথা, শুনল তার স্বামী আর বেঁচে নেই।

তবুও লারা কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে না। সেনাদপ্তরে স্বামীর খোঁজ করে চিঠি লিখলো। কিন্তু বেচারী সেখান থেকে কোন জবাব পায় না। তাতেও লারা হতাশ হয় নি। আশায় বুক বেঁধে সে হাসপাতালে নার্স হয়ে এসেছে: হয়ত নানা অঞ্চল ঘুরে একদিন তার স্বামী আসবে এখানে আহত হয়ে; না এলেও এখানে থেকেই সে পাবে তার স্বামীর সঠিক খবর।

সুন্দরী, বুদ্ধিমতী লারাকে দেখে ডাঃ জিভাগো মুগ্ধ হলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে একটা যোগসূত্রও খুঁজে পেলেন: লারা ও তাঁর জীবনের দুঃখের মূল এক—

জিভাগো জানতেন এই দুষ্ট কোমারোস্কোভ তাঁর পিতারও উকিল ছিল। পিতাকে অসৎ পথে নিয়ে সে বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

শেষ পর্যন্ত পিতাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেবার মূলেও ছিল এই কোমারোস্কোভ।

সুতরাং লারার প্রতি জিভাগো মমতা বোধ করেন, আকর্ষণ বোধ করেন তার প্রতি।

দেশে তখনও বিপ্লব শেষ হয় নি। তবু জিভাগো কি করে মস্কো শহরে ফিরে আসবার সুযোগ পেলেন।

দীর্ঘ তিন বছর তিনি পরিবার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন। বুকভরা আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে তিনি এখন বাড়ি ফিরছেন। চলন্ত ট্রেন থেকে জিভাগো দেখতে পান—চলার পথে দু'দিকেই যুদ্ধ এবং বিপ্লবের চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

মস্কো শহরে পৌঁছে জিভাগো বুঝলেন শহরের অবস্থাও ভাল নয়। অলিতে গলিতে বন্দুকের লড়াই চলছে বিভিন্ন দলের মধ্যে দিনের আলোতেও। খাদ্য এবং জ্বালানির দুর্ভিক্ষ। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রিয়জন কে কোথায় হারিয়ে গেছে।

অক্টোবরের শেষের দিক। খবর বের হল—রাশিয়ায় সোভিয়েত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই সময় শহরে টাইফাস জ্বরের মহামারী শুরু হল। নতুন সরকারের থেকে ডাঃ জিভাগোর ডাক এল। তাদের নির্দেশে জিভাগো হাসপাতালের কাজে যোগ দেন। ডাক্তার কাজের ভিতর ডুবে গেলেন। মুহূর্তের জন্যও তিনি আর অবসর পান না।

জিভাগোকে দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। দু'দিন বাদেই ক্লান্তি আর অবসাদে তাঁর দেহ ভেঙ্গে পডতে চায়। কাজ করবার ক্ষমতা তিনি পাবেন কি করে? দু'বেলা পেট ভরে খেতেও পান না। শুধু কি তাই? তার ওপর সর্বক্ষণের সঙ্গী দারুণ দুশ্চিন্তা ছায়ার মত পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে: নতুন গভর্নমেণ্ট কখন যে

কাকে অকারণে গ্রেপ্তার করবে বা নির্মমভাবে হত্যা করবে কে জানে ?

জিভাগোর ভবিষ্যৎও বিপদ-মুক্ত নয়। সেকথা তাঁর অ-জানা নেই। তবুও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে আপন কাজ করে যান। অগত্যা স্ত্রী এবং বৃদ্ধ শ্বশুরের একান্ত অনুরোধে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে দূরের কোন পল্লীগ্রামে তিনি চলে যেতে রাজী হন।

যাত্রার আয়োজন হয়—রেল-পথে। মস্কো স্টেশন তখন উদ্বাস্ত-অধ্যুষিত। সে দৃশ্য বড়ই করুণ, মর্মান্তিক। তাঁর এই ট্রেণ-ভ্রমণকে কেন্দ্র করে জিভাগোর বর্ণনায় ফুটে ওঠে সমসাময়িক রাশিয়ার ছবি।

উরাল অঞ্চলের কোন এক অখ্যাত গ্রামে এসে জিভাগো হাজির হলেন। সেখানে সপরিবারে তিনি নতুন জীবন শুরু করলেন। সব কিছুই জিভাগোকে নিজের হাতে করতে হয়। তাতে তাঁর খেদ নেই। নতুন জগৎ সৃষ্টির আনন্দে জিভাগো মশগুল হয়ে থাকেন। কিন্তু সে শান্তি তাঁর বরাতে বেশী দিন সইল না—

সেদিন মহকুমা শহর থেকে জিভাগো তাঁর বাড়ি ফিরছিলেন। পথে অতর্কিতে তিনি বন্দী হলেন একদল বিদ্রোহী কসাকের হাতে।

জিভাগো জানলেন বিদ্রোহীদের দলের চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে ; তাঁকে সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে হবে। শুনে জিভাগোর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। বন্দী অবস্থায় তাঁকে এগোতে হয় সেই কুখ্যাত সাইবেরিয়ার দিকে। তোনিয়া বা আপনজনের ভিতর কেউ এ খবর জানতে পারল না।

নীরবে জিভাগো বিদ্রোহীদের অনুসরণ করেন। সাইবেরিয়ার কথা ভেবে তিনি শিউরে ওঠেন। তোনিয়ার কথা মনে হতে বুক ভেঙ্গে তাঁর কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু বেরিয়ে আসে শুধু চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

দু'বছর বাদে ভিক্ষুকের বেশে ডাঃ জিভাগো একদিন ফিরে এলেন উরালের মহকুমা-শহরে। তিনি পালিয়ে এসেছেন এই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে।

ঘুরতে ঘুরতে জিভাগো এসে হাজির হন পুরনো বান্ধবী—লারার বাড়িতে। লারা কিছুদিন থেকে কাজ করছিল এই শহরে। লারার কাছ থেকে জিভাগো জানলেন, তোনিয়ারা চলে গেছে সে-অঞ্চল ছেড়ে কোন এক অজানা জায়গায়।

ক'দিন বাদে প্রায় পাঁচ মাস নানা জায়গা ঘুরে তোনিয়ার এক চিঠি এসে পৌঁছল ওঁদের হাতে। তোনিয়া জানিয়েছে, নতুন সরকারের কৃপায় মামা নিকোলে এবং কয়েকজন পরিচিত অধ্যাপক নির্বাসিত হয়েছেন। তোনিয়া তার ছেলেকে নিয়ে প্যারিস চলে যাচ্ছে—তাদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না।

সে চিঠি পড়ে দু'জনেই মুখের ভাষা হারালেন। জিভাগোর দৃষ্টি হয় উদাস।

খানিক বাদে লারাই মৌনতা ভাঙ্গল। সে বলল,—

'এখন তোমাকে শুধু ওদের কথা ভাবলে চলবে না। ভুলে যেও না—তোমার নিজের মাথার ওপরও শাণিত খড়্গ ঝুলছে।'

একটু থেমে লারা আবার বলতে শুরু করে—

'তারা জানে তুমি কোটিপতির ছেলে; তোমার স্ত্রী তোনিয়াও জমিদারের মেয়ে; তুমি সম্প্রতি কাজ ছেড়ে পালিয়ে এসেছ : এগুলি তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। এ থেকে তোমার রেহাই পাওয়া মুস্কিল। আমি বলি, যত শীঘ্র হয় শহর ছেড়ে কোথাও গিয়ে তুমি আত্মগোপন করে থাকগে।'

লারার উক্তি শুনে জিভাগো চিন্তিত হলেন। খানিক বাদে তিনি জানালেন—'তোমার পরামর্শ মেনে নিতে আমি রাজী আছি, কিন্তু এক সর্তে।'

—'বল।'

—'যদি তুমিও আমার সঙ্গে যাও !'

—'কি যে তুমি ছেলেমানুষের মত বল ?'

লারা স্পষ্ট করেই জিভাগোকে জানিয়েছিল, অন্য কোন পুরুষকেই সে স্বামীর মতো ভালোবাসতে পারবে না ; পাশা যদি কোনদিন ফিরে আসে তাহলে সে আবার তার সঙ্গেই ফিরে চলে যাবে।

লারার কাছ থেকে যতটুকু পেলেন তাতেই যেন জিভাগোর জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি বললেন—'তথাস্তু।'

কিন্তু এ-পূর্ণতা বেশীদিন রইল না। দুষ্ট কোমারোস্কোভ একদিন ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হল তাদের জীবনে। সে জানাল,—'তোমাদের দু'জনের জীবনই বিপন্ন ; একমাত্র আমিই তোমাদের রক্ষা করতে পারি। মঙ্গল চাও তো এখনই তোমরা আমার সঙ্গে চলো।'

ওরা জানে, কোমারোস্কোভ এখন পার্টির একজন পদস্থ পরামর্শদাতা—ক্ষমতাবান পুরুষ।

লারা যেতে রাজী আছে যদি জিভাগো সঙ্গে যান। কিন্তু জিভাগো যেতে রাজী নন।

তখন কোমারোস্কোভ জিভাগোকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল,—'কাল লারার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এখন ওর পালা। ওকে রক্ষা করা কি তোমার ধর্ম নয় ?'

তার কথা শুনে জিভাগো মনে মনে ফন্দী আঁটেন। লারাকে বললেন,—'তুমি যাও ওর গাড়িতে। আমি ঘোড়ায় চেপে আসছি তোমাদের পেছনে।'

তাঁর এ প্রস্তাবে লারা খুশী হল। লারা উঠে গিয়ে গাড়িতে চেপে বসল। মসৃণ বরফের উপর দাগ কেটে ওদের গাড়ি ছুটে এগিয়ে যায় ; লারা হল অদৃশ্য। জিভাগো সেখানে বসে রইলেন স্থাণুর মত।

দূরে মাঞ্চুরিয়াগামী গাড়ির এক প্রকোষ্ঠে শুধু লারা আর কোমারোস্কোভ। গাড়ি ছুটে চলেছে, নামবার উপায় নেই।

গভীর রাত্রে এক অপরিচিত অতিথি এল—লারার স্বামী পাশা। জিভাগোর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত তার নানা কথা হল।

পরেরদিন ভোরবেলায় জিভাগো তাঁর বাড়ির বাইরে পাশার মৃত-দেহ আবিষ্কার করলেন। তখনও বরফের উপর খানিকটা রক্ত জমাট হয়ে আছে।

এ ঘটনার আরও কয়েক বছর পরে মস্কোর রাজপথে জিভাগোর মৃত্যু হল হৃদ্‌রোগে। ঘটনাচক্রে সেদিন লারা মাঞ্চুরিয়া থেকে মস্কো এসে পোঁছেছে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

জিভাগোর কাগজপত্র ঘেঁটে লারা জানতে পারল পাশা তার খোঁজ করতে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার কোথায় উধাও হয়ে যায়।

লারার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেতু

যুগোস্লাভ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক ইভো আন্দ্রিচ (Ivo Andric)-এর 'দি ব্রীজ অন দি ড্রিনা' (The Bridge on the Drina), ১৯৫৯, উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

১৫১৬ সাল। বোসনিয়া তখন অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টান প্রজাদের সম্রাটকে দিতে হত 'রক্ত-কর'। অর্থাৎ বোসনিয়ার পিতারা পালা করে প্রতি বছর সম্রাটের হাতে তুলে দিত তাদের কিশোর ছেলেদের উপহার হিসাবে। সেই বালকদের বাড়ির সঙ্গে থাকত না আর কোন সম্পর্ক। এরা হত মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত। তারপর নতুন নামকরণ করে তাদের ভর্তি করা হত সম্রাটের কাজে।

সেদিন এমনি একদল কিশোরকে সম্রাটের কর্মচারীরা নিয়ে যাচ্ছিল বোসনিয়ার পথ দিয়ে, যাচ্ছিল তারা ইস্তানবুল। একটু দূর থেকে তাদের অনুসরণ করছিল কয়েকজন নারী। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তিতে, অনাহারে এবং শোকে মহিলারা শ্রান্ত, প্রায় উন্মাদিনী। তবুও তারা পিছু পিছু চলছে; বেশী নিকটে যেতে পারে না, পাহারাদার অমনি লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে আসে। সামনে চলছে বন্দী কিশোরদল, তাদের মধ্যে আছে এদের কারো আত্মজ, কারো বা অনুজ।

ড্রিনা নদীর তীরে এসে থামল ওরা। ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক ছিল। রাজকর্মচারীরা কিশোরদের নিয়ে ওপারে চলে যায়। এ-পারে পড়ে থাকে দুঃখী মা-বোনের দল।

এই কিশোরদের মধ্যে একজন তার কর্মদক্ষতার জন্য সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। ছেলেটির গুণে মুগ্ধ হয়ে শেষে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন সুলতান। ধীরে ধীরে সে অটোম্যান সাম্রাজ্যের এক শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে ওঠে। কোথায় কোন্ গ্রামে তার বাড়ি ছিল মনে রইল না। সে ভুলে গেল তার মা-বাবার নাম, ভুলে গেল তার নিজের আসল নামটি পর্যন্ত। লোকে জানল তাকে মহম্মদ পাশা সোকোলি বলে, সে-ই নামেই সে বিখ্যাত।

ক্রমে সোকোলির বয়স হল। এখন সে ষাটের কম নয়। নাম, যশ, অর্থ, এমন কি পারিবারিক শান্তি, কিছুরই তার অভাব নেই; পরিপূর্ণ জীবন। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ মাঝে মাঝে একটা অসহ্য বুকের ব্যথায় সে কিছুক্ষণ কষ্ট পায়। চিকিৎসায় কোন ফল হয় না।

এমনি যন্ত্রণার আক্রমণে সোকোলি একদিন আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়, একটা পুলের ছবি ভেসে উঠল তার সামনে। সে দেখল নদীর উপর পাথরের তৈরী একটি সুন্দর পুল,—তার উপর দিয়ে চলাচল করছে কত লোক, শুনতে পেল, কে যেন তাকে বলছে—তুমি ড্রিনা নদীর উপর এ রকম একটি পুল তৈরী করে দাও, তাহলে দূর হবে তোমার বুকের সব যন্ত্রণা, ব্যথা।

তার মা পার হতে পারেন নি ড্রিনা নদী, আসতে পারেন নি তার সঙ্গে। দুঃখী মা'র সেই বুকফাটা কান্না কিশোরের অবচেতন মন আশ্রয় করে সংগোপনে বেঁচে ছিল এতদিন। মার সে কান্না আজ ছেলের বুক ফেটে বের হতে চায়।

তন্দ্রা ছুটে যেতে সোকোলি বিছানা ছেড়ে উঠে এল। দৃঢ় কণ্ঠে সে ঘোষণা করল, ড্রিনা নদীর উপর পুল তৈরী করা হবে। সে-পুলের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবে সে নিজে, রাজকোষ নয়।

ড্রিনা পার্বত্য নদী—বোসনিয়া এবং সার্বিয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে

চলেছে আপন মনে। নদীটি ছোট্ট কিন্তু তার স্রোত প্রখর। স্থির হল ছোট্ট গ্রাম ভিশেগার্ড থেকে এই পুল শুরু হবে। পুল তৈরী হলে শুধু যে বোসনিয়ার সঙ্গে সার্বিয়া যুক্ত হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে এটি হবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মিলনের সেতু।

দেখতে দেখতে ভিশেগার্ড সরগরম হয়ে উঠল, ছোট্ট গ্রামটি ক্রমশঃ শহর হয়ে উঠতে লাগল। রোম থেকে, গ্রীস্ থেকে আরও কত জায়গা থেকে খুঁজে পেতে আনা হল পাথরের কাজ জানা সুদক্ষ কারিগর ও মিস্ত্রী। শ্বেত পাথরের বড় বড় খণ্ড এসে পৌঁছল ; এল নানা রকম যন্ত্রপাতি আর মাল-মশলা। আবিদাগারের ওপর পড়ল পুলের কাজ তত্ত্বাবধানের কঠিন দায়িত্ব।

স্থানীয় লোকে বিশ্বাস করতে পারে না, ড্রিনার উপর সত্যি পুল হবে। তাদের ধারণা, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় ড্রিনার স্রোতের উপর দিয়ে মানুষ হেঁটে যায়। সে ইচ্ছা থাকলে তবে তিনি এই নদী সৃষ্টি করলেন কেন? তারা ভাবে,—জলপরীরাও ছাড়বার পাত্র নয়। পুল তৈরী করতে গেলে সেই পরীরা নিশ্চয়ই বাধা দেবে।

পুল তৈরীর কাজে বেগার খাটবার জন্য চারপাশের ক্ষেতখামার থেকে চাষীদের ধরে আনা হয়। জবরদস্তিটা অবশ্য বেশি হল খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর। চাষ আবাদের কাজ পড়ে রইল।

তিন বছর কেটে গেল। পুলের কাজের অগ্রগতি বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। তাই লোকের মনের সন্দেহ দৃঢ় হয়,—এ পুল তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু আবিদাগারের উৎসাহ শিথিল হয় না। সে বেগার খাটিয়ে নিচ্ছে নির্মম ভাবে। ক্রমে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ করবার সাহস হয় না কারুর। রাদিসাভ গোপনে সহকর্মীদের উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে। সে জানায়, আর কতদিন এই অসহ্য অত্যাচার সহ্য করা যায়! গোপনে প্রতিশোধ নিতে সে নিজেই এগিয়ে যায়। দিনে

যতটুকু কাজ হয় রাত্রির অন্ধকারে রাদিসাভ তা ভেঙ্গে দেয়। গুজব রটল নদীর দেবী স্বয়ং পুলের কাজ ভেঙ্গে দিয়ে যান।

গুজবে আবিদাগারের বিশ্বাস নেই। সে চতুর লোক। তার নির্দেশে রাত্রিতে কড়া পাহারা বসবার ফলে রাদিসাভ একদিন ধরা পড়ল। তারপর পুল যেখানে তৈরী হচ্ছিল সেখানে তাকে শূলে চড়ানো হল। মুমূর্ষু রাদিসাভের শেষ অসংলগ্ন উক্তি শোনা গেল ঃ তুর্কীরা—তুর্কীরা—পু-ল।

শূলবিদ্ধ রাদিসাভ দর্শকদের মনে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করল। মনে মনে সবাই তাকে শহীদ বলে মেনে নিল।

এরপর এল নতুন তত্ত্বাবধায়ক। পুলের কাজ এবার দ্রুত এগিয়ে চলে। পুল একদিন সত্যিই শেষ হয়। বিরাট ভোজ দিয়ে পুল সমাপ্তির উৎসব হয়। সে নিমন্ত্রণ থেকে ঐ অঞ্চলের কেউ বাদ পড়ে না। সাদা পাথরে তৈরী সেই সুন্দর পুলের রূপে সকলে মুগ্ধ, সবাই খুশী। কিন্তু সেই আনন্দ ম্লান করতে পারল না—শহীদ রাদিসাভের স্মৃতি।

নদী পার হবার জন্য বহুদূর থেকে আসে বিস্তর লোক, আসে সেই পথ দিয়ে। তারা যায় এই পুলের উপর দিয়ে। এই পুলের জন্য হল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ; ভিশেগার্ড হল বড় শহর। এই পুলের উপর দিয়ে যায় শোভাযাত্রা, যায় মৃতের শোকযাত্রাও। শত্রু সৈন্য ঠেকাবার জন্য পুলের মুখে বসে সামরিক পাহারা। পুল নয় তো, ভিশেগার্ডের নাগরিকদের একটি বিশ্বস্ত বন্ধু। পুলের উপর আছে প্রশস্ত খোলা জায়গা, বসে গল্পগুজব করবার জন্য আছে বেঞ্চ। সেখানে খোলা হয়েছে কফি আর ফলের দোকান। নাগরিকদের আড্ডা জমাবার আদর্শ জায়গা বটে। অনেক জটিল বিষয়ের পরামর্শও হয় এইখানেই। কত ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের স্মৃতি এই পুলের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত হয়ে পড়েছে! শহরের সেরা

সুন্দরী ফাতা, যার নামে স্থানীয় তরুণরা হয়ে উঠত উন্মত্ত—প্রেমহীন বিয়ের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবার আশায় শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে এই পুলের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে করেছিল আত্মহত্যা। আবার এই পুলের উপর পাহারারত তরুণ সৈনিক ফেহ্নন বোরখা-পরা এক তুর্কী মেয়ের কালো চোখ দেখে ভুল করেছিল। তার জন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল প্রাণ দিয়ে।

এই পুলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বোসনিয়ার ইতিহাস। কত যুদ্ধ হল, কত রাজা এল আর চলে গেল! সবকিছুর নীরব সাক্ষী এই পুল।

এল নতুন যুগ। ভিশেগার্ড শহরে হল মিউনিসিপ্যালিটি। সে শহরের পথঘাট এবং পুলটি বৈদ্যুতিক আলোয় হল আলোকিত। শ্রমিকরা গঠন করেছে তাদের সঙ্ঘ—'ট্রেড্ ইউনিয়ন'। পুলের ধারের সেই ঝরণাটি আছে এখনও। কিন্তু এখন আর দল বেঁধে মেয়েরা আসে না সে ঝরণায় জল নিতে ; বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেছে কলের জল। আরও কত কি এসেছে এই শহরে। এসেছে রেল-পথও এই শহরে পুল পর্যন্ত।

ভিশেগার্ডে সে যুগের মেয়েরা থাকত পর্দার আড়ালে, থাকত তারা ঘরের মধ্যে। কিন্তু পুলের যুগের মেয়েরা শিখেছে লেখাপড়া, দূর করেছে তারা সেই সংকোচের বালাই। তারা আজ অসংকোচে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে আসে এই পুলের উপর। শিক্ষিকা জোরকা প্রেমে আশাহত হয়েছিল এই পুলেরই উপর।

আলিহোজা বৃদ্ধ হয়েছে। আলিহোজা সেই পরিবারের শেষ বংশগৌরব, আজ থেকে সাড়ে তিনশ' বছর আগে যে পরিবারের কর্তার উপর এই পুল তৈরীর ভার পড়ে ছিল। শহরে একটি দোকানের সে মালিক। সেই দোকান থেকে সামনে তাকালেই

পুলটি পরিষ্কার দেখা যায়। দেখা যায় শ্বেত পাথরের পুলটি রোদে কেমন ঝক্ ঝক্ করে, আর তার নীচে কেমন বয়ে চলেছে ড্রিনা নদী। আলিহোজা মাঝে মাঝে চুপ করে চেয়ে থাকে পুলটির দিকে। ভিশেগার্ডের এই নব রূপায়ণ তার ভালো লাগে না। কখনও বা আলিহোজা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে জীবনের এই দ্রুত পরিবর্তন দেখে।

আলিহোজা ভাবে, মানুষের জীবনের ধারা বুঝি বয়ে চলে ঐ ড্রিনা নদীর স্রোতেরই মত। রাষ্ট্র, ধর্ম এমন কি সমাজ পর্যন্ত ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলে। ব্যক্তি তার জীবনের স্রোতে যায় হারিয়ে। আশ্চর্য, তবু জীবন চিরন্তন, ক্ষয় নেই তার। ড্রিনার স্রোতোধারা, উপরকার অচঞ্চল সেতুটি এবং ব্যক্তি জীবনের গতিপ্রবাহ হয়ত জীবনের চিরন্তন অংশেরই প্রতীক।

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভিশেগার্ড এবং পুলটি এখন অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীর হাতে। শহরে থমথমে ভাব। হাট-বাজার, দোকান-পাট সব বন্ধ। আলিহোজার দোকানটিও বন্ধ থাকে। সেই বন্ধ দোকান-ঘরের মধ্যে থেকে আলিহোজা শুনতে পায়—দূর থেকে কামানের গোলা এসে পড়ছে ড্রিনার জলে, কখনও বা পুলের উপর। হঠাৎ একটি প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে আলিহোজা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান হবার পর সামনে চেয়ে দেখে পুলের মাঝখানটা ফাঁকা। সে বুঝতে পারল, শত্রুর গোলায় পুল ভেঙ্গে গেছে। পুল ভাঙ্গল না, যেন তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেল। পুলের ঐ অবস্থা দেখে আলিহোজার জীবনের ভিত্তিভূমি যেন টলে ওঠে। এই পুল কখনো ভাঙ্গতে পারে তা সে কল্পনাও করে নি।

পূর্ব-পুরুষের কাছ থেকে আলিহোজা পেয়েছিল পুলের অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ একজন মানুষ ও তার কীর্তি হারিয়ে যাবে? পুল তো থাকবার কথা ছিল শাশ্বত কাল ধরে।

আলিহোজা আর ভাবতে পারে না। সে বাঁচবার অবলম্বন খুঁজে পায় না। হঠাৎ বুকে একটা ব্যথা অনুভব করায় সে বাড়ীর পথে পা বাড়ায়।

আলিহোজা ভেবে পায় না, এত পরিচিত টিলাটির উপর উঠতে আজ তার এত কষ্ট হচ্ছে কেন। সে ধুঁকছে তবুও এগিয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সে উপলব্ধি করল,—ঈশ্বর মঙ্গলময়, জীবনের চরম শিক্ষাদাতা—ভাঙ্গাগড়ার খেলাই চিরন্তন, কালের স্রোতপ্রবাহে মানুষের তৈরী কোন কিছুই শাশ্বত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, থাকতে পারে না।

ক্লান্ত আলিহোজা আর ভাবতে পারলে না,—মাথা ঘুরে সে সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল—আর উঠল না।

শেষ আশ্রয়

আমেরিকার লেখক জন স্টেইনবেক (John Steinbeck)-এর 'দি গ্রেপস্ অব র‍্যথ' (The Grapes of Wrath), ১৯৩৯, উপন্যাসটির কাহিনী।

নিছক আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তার হাতে লোকটি মারা যায়। তবুও আইনের চোখে টম যোয়াত হয়েছিল অপরাধী। বিচারে হয়েছিল তার ক'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

হঠাৎ টম যোয়াত একদিন মুক্তি পেল। সে মুক্তি পেল নির্ধারিত সময়ের আগেই। জেলখানা ছেড়ে বাইরে এসে মুক্ত হাওয়ায় দাঁড়িয়ে টম প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল।

বন্দী জীবনে টম বাইরের দুনিয়ার কোন খবর রাখত না। রাখত না সে নিজের বাড়িরও কোন খবর। আজ বাইরে এসে বাড়ির জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। টম বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

পথ দীর্ঘ এবং সুবিস্তৃত। দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলে সে পথ আজ হয়েছে কঠিন এবং রুক্ষ। টম পা চালিয়ে এগিয়ে যায়।

চলার পথে জিম কেজীর সঙ্গে টমের আলাপ হয়। জিম ছিল তার সমবয়সী। এককালে সে ছিল মজুরদের নেতা। অল্প সময়ের আলাপে ওদের পরস্পরের মধ্যে হয় বন্ধুত্ব। দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে চলে টমের গাঁয়ের দিকে।

বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ে ঢুকে টম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। আরও এগিয়ে গিয়ে তারা হাজির হয় টমের বাড়ির কাছে। এবার টম হয় হতভম্ব।

আশ্চর্য! শুধু তাদেরই নয়, চারিদিকের সব ঘরদোর শূন্য।

টমের মনে হয়, সে সব বাড়িগুলি যেন পরিত্যক্ত। বিমূঢ় টম খুঁজে পায় না এর রহস্য। সে স্থির করতে পারে না তার কর্তব্য।

এই সময় দূর থেকে একটি স্থানীয় দুঃস্থ চাষী এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। তার থেকে টম এবং জিম জানল, সে অঞ্চলের প্রায় সব পরিবার ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেছে। বাকী যারা এখনও আছে তারাও দু' একদিনের মধ্যেই সেখানে চলে যাচ্ছে।

লোকটি জানালো, টমের পরিবারের সকলেই কাছেই আছে—তাদের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে। তারাও ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রার উদ্যোগ করছে।

কথা বলতে গিয়ে চাষীটির গলা শুকিয়ে আসে, তার চোখ দুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। একটু দম নিয়ে চাষীটি আবার বলতে শুরু করে—

'অনাবৃষ্টির ফলে দেশে চাষ হয় না। চাষীদের অর্থ নেই, ঋণও জোটে না তাদের। এদিকে সরকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করতে চেষ্টা করছে। বহুদিন থেকে চাষীদের অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটছে। সুযোগ বুঝে লোভী সমাজ-বিরোধীর দল এগিয়ে এল চাষীদের সেই জমি গ্রাস করতে। অসহায় চাষীরা বিপাকে পড়ে তাদের সব জমি বিক্রী করে দেয় যে-কোন মূল্যে। তাদের ঘরে নেই অন্ন। তারা এখন নিঃস্ব। চাষীদের সামনে কোন আশা নেই, নেই কোন আশ্বাস।

এলো সারা দেশ জুড়ে দারুণ বিপর্যয়। চাষীরা সকলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। বসে বসে তারা নীরবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।

এমন সময় সে অঞ্চলে কি করে রটে যায় ক্যালিফোর্নিয়ায় অনেক চাষী মজুরের প্রয়োজন আছে। সে দেশ সোনার দেশ—সেখানে নেই কোন কাজের অভাব, না অন্নের। এখানের চাষীরা সেখানে গেলে তারা থাকবে সুখে, তাদের দিন কাটবে নিশ্চিন্ত আরামে।

পেটের ক্ষুধা দুর্জয়। অন্নের আশ্বাসে মৃতপ্রায় চাষীরা সব জেগে ওঠে। ঘর ছেড়ে তারা সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। হাজার হাজার চাষীরা সব দল বেঁধে পায়ে হেঁটে যাত্রা করে দুর্গম পথে—সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশ্যে ; শুধু পেটের তাগিদে।'

টম এবং জিম দুজনেই এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিল চাষীদের দুঃখের কাহিনী। কিন্তু বক্তা কোন্ ফাঁকে সেখান থেকে চলে গেছে, শ্রোতা দু'জন কেউ টের পায় নি।

এবার বন্ধু জিমকে সঙ্গে নিয়ে কাকার বাড়ি এসে টম দেখে সেই চাষীটি মিথ্যা বলে নি। সেখানে তার পরিবারবর্গ যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত। কারুর দম ফেলবারও যেন সময় নেই। ছোট বড় সকলের চোখে একটা দারুণ উত্তেজনার আভাস।

টমের মা-বাবা, ভাই-বোন এমন কি তাদের বুড়ো দাদু ঠাকুরমা এবং পাগলাটে ভাইটি পর্যন্ত যাবার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে। তাদের আসন্নপ্রসবা বোন এবং ভগ্নীপতি কনিও যাবে এই দলের সঙ্গে।

টমের ছোট ভাই ইতিমধ্যে কোথা থেকে একটি পুরানো ঝরঝরে মোটর লরি এনে হাজির করেছে। যাত্রার আগের দিন রাত্রে খুঁজে পেতে কয়েকটি শূয়োর ধরে মারা হল। সেগুলোকে একটু আগুনে ঝলসিয়ে নিয়ে নুন মাখিয়ে নেওয়া হল—রাস্তার খাদ্য হিসাবে।

স্থির হল, পরের দিন ভোর হলেই যাত্রা শুরু হবে। টমের ঠাকুরদা কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে এক কোণে বসে আছেন। নীরবতা ভেঙ্গে বৃদ্ধ বললেন—'তাহলে এই ভিটে বাড়ি ছেড়ে সত্যিই কি আমাদের সকলকে যেতে হবে? আমার এই সাধের গাছগুলি ছেড়ে?'

কারুর মুখে ভাষা নেই। বৃদ্ধের বুক ভেঙ্গে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বৃদ্ধ আবার আপন মনে বলে যায়—'ক্যালিফোর্নিয়া, সে তো শুনেছি অনেক দূর! সে দেশ কেমন জানি না। তবে একথা আমি হলফ করে বলতে পারি—সে দেশ যতই সোনার দেশ হোক না কেন কিন্তু সেখানে কোথাও পাবে না আমার এই গাছের মত গাছ। গাছ নয় তো যেন আমার—মূক সন্তান।' বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

ভোর না হতেই একে একে সকলে সেই গাড়িতে উঠল। অনিচ্ছুক বৃদ্ধ যোয়াতকে নেশায় অচেতন করে তোলা হল। বাকী সকলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। যাত্রা শুরু হয়। মোটর লরিটি চলতে শুরু করে। মোটর লরি নয়তো যেন হাঁপানির রোগী। গাড়িটি এগিয়ে যায় উপত্যকা দিয়ে—কখনও বা বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, কখনও আবার পার্বত্য বন্ধুর পথ ধরে।

সন্ধ্যা নেমে আসে। ঐ রাতটা বিশ্রাম করবার জন্য ওরা আস্তানা নেয় কোন এক নিরাপদ জায়গায়। সেই রাত্রেই বুড়ো ঠাকুরদা হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গেল। তাকে কবর দিয়ে ওরা আবার যাত্রার উদ্যোগ করে। শোক করবার অবকাশ কোথায়?

বিপদ একদিক দিয়ে এল না। সময় বুঝে গাড়িটিও বিগড়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার যাহোক করে চলতে শুরু করে। শুধু কি তাই? সেখানকার স্থানীয় লোকেরা আগন্তুকদের শত্রু মনে করে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতে তারা দেখল তাদের মত একদল চাষী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে আসছে। তারা জানায়, সেখানকার অবস্থা ওকলাহামার থেকেও খারাপ। সেখানে যাওয়া নিরর্থক।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার মধুর স্বপ্নে যোয়াত পরিবার বিভোর। তাই সে কথা তাদের কানে যায় না। তারা এগিয়ে যায়।

ক্যালিফোর্নিয়া আর বেশী দূর নয়। পথের কষ্টে সকলেই কম বেশী ক্লান্ত। তাদের সকলের চেহারা হয়েছে ধূলি মলিন। সামনে

একটি নদী দেখে গাড়িটি থামানো হল সে নদীটির কিনারে—স্নান করবার জন্য।

সকলে স্নান করবার জন্য নদীর দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ টমের সেই পাগলাটে ভাই নোয়ার মনে হল যেন সে পরিবারের একটি বোঝা—সে তাদের গলার কাঁটা। দল ছেড়ে নোয়া চুপি চুপি কোথায় উধাও হয়ে গেল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

যোয়াত পরিবার লক্ষ্য করলে তাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সেখানকার লোকরা ব্যঙ্গ করে বলছে—

—'ঐ দেখ ভবঘুরে বেদুইনের দল আবার এসেছে জ্বালাতে।'

নীরবে ওরা এই কটূক্তি হজম করে যায়।

গাড়িটি একবার থামলে আর চলতে চায় না। অনেক কষ্টে তাকে ঠেলেঠুলে নড়ান হল। গাড়িটি আবার চলতে শুরু করে। রাত্রের ভিতর সামনের মরুভূমিটি পাড়ি দিতে হবে। সকলে ত্রাহি মধুসূদন বলে ডাকছে। তারা ডাকছে এজন্য যে বাহনটি মরুভূমির মাঝখানে বিগড়ে না যায়।

ওদের ডাকা সার্থক হয়েছিল। গাড়িটি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কিন্তু ভোর হবার আগেই ওরা জানল রাত্রে বুড়ি ঠাকুরমা কখন গত হয়েছে। মাটির অভাবে বিগতা বুড়ি বালু পেল। দলটি আবার এগিয়ে যায়।

এবার গাড়িটি ধুঁকতে ধুঁকতে এক সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছল। দলটি শহরের এক কোণে আগন্তুকদের ক্যাম্পে আশ্রয় নিল। তারা জানল সেখানে মাথা খুঁড়লেও কোন কাজ পাবার সম্ভাবনা নেই। তাদের মত হাজার হাজার চাষীমজুর রাস্তায় এখানে ওখানে পড়ে আছে। তাদের না আছে আশ্রয় না খাদ্যের সংস্থান। ক্ষুধার্ত শিশুদের আর্তনাদ চারদিক থেকে ভেসে আসে তাদের কানে। সত্যই সে এক মর্মান্তিক পরিবেশ।

এই সময় সে ক্যাম্পে এল এক ঠিকাদার। সে এল কোন এক ভিন্ দেশের ফলের বাগানের জন্য মজুরের সন্ধানে। উপস্থিত চাষী মজুররা তার লাইসেন্স্ দেখতে চাইলে ঠিকাদারটি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বেগতিক বুঝে সে কয়েকটি উদ্ধত যুবকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে।

ফলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ চাষী মজুরদের কথা কাটাকাটি হয়। ক্রমে উভয় পক্ষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্বযুদ্ধ। তাতে টম জড়িয়ে পড়ে। বেগতিক দেখে সে সেখান থেকে সরে পড়ে। তার জায়গায় জিম এগিয়ে আসে মারমুখো হয়ে।

এই ডামাডোলের মধ্যে টমের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভগ্নীপতি দল ছেড়ে কোথায় চলে যায়। চলে যায় সে তার আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে ছেড়ে।

টমের মা শ্রীমতী যোয়াত-এর উপর দিয়ে ইতিমধ্যে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। পথে তিনি তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ীকে হারিয়েছেন, হারিয়েছেন তাঁর বিকৃতমস্তিষ্ক সন্তানটিকে, সেই সঙ্গে অবুঝ জামাতা-টিকেও। পরিবারের শক্তির উৎস সুযোগ্য পুত্র টম আজ পুলিশের নজরবন্দী, পুত্রসম জিমের অবস্থাও তদ্রূপ। চরম দুর্গতির মধ্য দিয়ে তাঁদের দিন কাটে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁদের দলে ভাঙ্গন ধরেছে।

তবুও তাঁর ধৈর্য অটুট থাকে। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন বাকী সকলকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে। সকলকে দেন তিনি সান্ত্বনা, দেন উৎসাহ। অত কষ্টের মধ্যেও মুখে হাসি এনে স্বামী-পরিত্যক্তা আসন্নপ্রসবা মেয়েটিকে বুকে টেনে অভয় দেন—'ভয় কি মা, আমি তো তোর সঙ্গে আছি।'

পুলিশের সঙ্গে মারামারির দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে ইতিমধ্যে

টম আর জিম দু'জনেই গা ঢাকা দিয়েছিল। যোয়াত পরিবারটি এবার বর্তমান ক্যাম্পটি ছেড়ে চলে যায় অন্য আর একটিতে। সেটি তাদেরই মত আগত অস্থায়ী চাষী-মজুর দ্বারা পরিচালিত ছিল। তবুও সেখানকার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সব চেয়ে বড় কথা, সেখানে যাবার পর এতদিনে তারা মানুষের যোগ্য ব্যবহার পেল।

কিন্তু বরাত যাদের মন্দ, শান্তি খোঁজা তাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। নিন্দুকের দল সর্বকালে সর্বদেশেই থাকে। সেখানেও তাদের অভাব হয় না।

হঠাৎ এই দ্বিতীয় ক্যাম্পটির বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকেরা কুৎসিত দুর্নাম রটাল। উদ্দেশ্য, যাতে সে ক্যাম্পটি বন্ধ হয়ে যায়— দুঃখী লোকগুলি বিভ্রান্ত হয়ে সে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। —কিন্তু সত্যমেব জয়তে। তাতে কোন ফল হল না। নিন্দুকরা নিজেরাই হল স্তব্ধ।

ক'দিন বাদে যোয়াত পরিবারকে সে ক্যাম্পটি ছাড়তে হল। ছাড়তে হল দুর্নামের তাড়নায় নয়, পেটের তাগিদে। তারা শুনল অন্য কোন জেলার একটি খামারে মজুরের দরকার। অগত্যা যোয়াত পরিবার সেদিকে ছুটে যায়।

কিন্তু সে খামারে প্রবেশ করতে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের কাছ থেকে ওরা বাধা পায়। বিক্ষোভকারীরা জানায় সেখানকার মালিকরা মজুরদের রক্ত চুষে নিয়ে যে পারিশ্রমিক দেয় তা অতি তুচ্ছ। তাই তাদের এই বিক্ষোভ।

কিন্তু পেটের ক্ষুধা দুর্জয়। যোয়াত পরিবার যে-কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাটতে প্রস্তুত। তাই ওরা পুলিশের সাহায্যে গা ঢাকা দিয়ে খামারে একসময় প্রবেশ করে।

পিচফলের বিশাল বাগান। যোয়াত পরিবারের সকলে সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে সে বাগানে। দিন শেষে ওরা মিলিত ভাবে

মজুরী পায় মাত্র পাঁচ সেণ্ট। সে অর্থে ওদের এক বেলার অন্ন জোটে, আর একবেলা 'হরিমটর।'

খামারের বাইরে বিক্ষোভকারীদের কথা মনে হতে রাতের অন্ধকারে টম চলে যায় তাদের মধ্যে—ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে। সেখানে যেতে জিমের সঙ্গে তার দেখা হল। সে জানল, জিম ওদের একজন পাণ্ডা।

সেই ভীড়ের মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে দু'বন্ধু কথা বলছিল। পুলিশের চোখে এরা দুজন বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী—ফেরারী আসামী।

এদের গন্ধ পেয়ে পুলিশ চুপি চুপি এগিয়ে আসে তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করতে। ওরা টের পেয়ে সময় মত সেখান থেকে গা-ঢাকা দেয়।

কিন্তু ফল হল না। ওরা ধরা পড়ল। পুলিশের সঙ্গে লাগল লড়াই। তাতে জিম মারা গেল। টমের মাথা ফাটল। টমও কম যায়নি—তার হাতে বলি হল পুলিশের একজন ডেপুটি।

সেখান থেকে পালিয়ে এসে টম বাড়িতে আশ্রয় নিল জঞ্জালের ভিতর একটি চটের থলির মধ্যে।

ইতিমধ্যে ওদের মজুরীর হার কমে অর্ধেক হয়েছে। একদিকে টমের বিপদের ঝুঁকি, তায় সে বাগানে কাজ করবার অসারতা যোয়াত পরিবারকে ভাবিয়ে তুলল।

তারা স্থির করলে সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে। বস্তাবন্দী আহত টমকে গাড়িটির এককোণে বিছানার নীচে লুকিয়ে ওরা একদিন সকলে যাত্রা করলে—অজানা পথে।

যোয়াত পরিবারকে নিয়ে জরাজীর্ণ মোটর লরিটি আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় সেটি ধুঁকতে ধুঁকতে।

কিছুদূর যেতে ওরা দেখল একটি খালের পাড়ে খোলা মাঠের

মাঝে খড়কুটো দিয়ে তৈরী কতগুলি অস্থায়ী ডেরা। ওদের বুঝতে অসুবিধা হয় না সেগুলি তাদেরই একদল সগোত্রের আস্তানা। গাড়িটি থামান হল। ওরা তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল।

এখানে এসে যোয়াত পরিবার সাময়িক ভাবে তুলোর বাগানে কাজ পেল। ফেরারী টম দিনের বেলায় তাদের ক্যাম্পের অদূরে একটি পয়ঃনালীর ভিতর আত্মগোপন করে থাকে। এখবর অবশ্য পরিবারের সকলেই জানে, জানে টমের ছোট্ট বোন রুথে পর্যন্ত।

একদিন সরল রুথে কথায় কথায় তার এক খেলার সাথীকে দাদা টমের এই লুকিয়ে থাকার গল্পটি বলে। ব্যাপারটা নিয়ে শিশু দু'টি কৌতুক বোধ করে।

এ খবরটি টমের মা শ্রীমতী যোয়াতের কানে যেতে তিনি আঁত্‌কে ওঠেন। সর্বনাশ! তিনি ভাবেন, এই বিদেশ বিভূঁয়ে ছেলেকে বুঝি আর রক্ষা করা গেল না।

ছেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে শ্রীমতী যোয়াত ঐ রাত্রেই টমকে সেখান থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে বলেন। মা হয়েও ছেলেকে দিতে হয় চিরবিদায়।

এই মর্মান্তিক বিদায়ের ক্ষণে ছেলের বুক ভেঙ্গে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। তার কণ্ঠ হয়ে ওঠে বাষ্পরুদ্ধ। মায়ের ধৈর্য তবুও অটুট থাকে। টম মহীয়সী জননীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

শান্তকণ্ঠে মা বললেন,—'লক্ষ্মী ছেলে, টম, আর দেরী করো না। এবার তুমি এস।'

—'মা, তুমি আমায় আশীর্বাদ কর। আজ থেকে বন্ধু জিমের অসমাপ্ত কাজের ভার আমি গ্রহণ করলাম। দুনিয়ার নীচু তলার লাঞ্ছিত অবহেলিত জনগণের সেবা হোক আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।'

মার মুখে ভাষা নেই। শুধু তাঁর কম্পিত হাতখানি তিনি বাড়িয়ে দেন ছেলের মাথার ওপর।

মায়ের হাতের স্পর্শ নিয়ে টম তড়িৎ বেগে বাইরে বেরিয়ে যায়। সে মিলিয়ে যায় গভীর অন্ধকারের ভিতর।

পাথরের মূর্তির মত শ্রীমতী যোয়াত বসে থাকেন সেইখানে। ছ'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে তাঁর চোখ থেকে। বুঝি তিনি নিজেও তা টের পেলেন না।

এল বর্ষা। বর্ষার জলে খালটি ফেঁপে ওঠে। সেই খালের জল উপছে এসে শরণার্থীদের ক্যাম্পটি ভাসিয়ে দেয়। অসহায় লোকগুলি করে ওঠে হাহাকার।

এই চরম বিপর্যয়ের সময় টমের বোন শ্রীমতী রোজ একটি মৃত সন্তান প্রসব করল। এদিকে প্লাবনের বেগ ক্রমে বেড়ে যায়। ফলে এবার ডেরাগুলির ভিতর জল ঢোকে; সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বর্ষায় যোয়াতদের মোটর লরিটি ধ্বসে পড়ে।

যোয়াত পরিবারটিকে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়। আবার তাঁরা যাত্রা করেন অ-জানা পথে, পায়ে হেঁটে।

তাঁরা এসে হাজির হন একটি গোলাবাড়িতে। বলা বাহুল্য, গোলাবাড়ির গোলাটি ছিল শূন্য। সে বাড়ির বৃদ্ধ মালিক আর তার ছোট্ট ছেলেটি ছিল বুভুক্ষু।

বৃদ্ধের নিজের দুর্দশার সীমা নেই। তবুও সে ক্ষীণকণ্ঠে দুঃস্থ অতিথিদের জানায় অভ্যর্থনা। ওরা সেখানে আশ্রয় পায়।

একে স্বামী-পরিত্যক্তা তায় মৃত সন্তান প্রসব করে শ্রীমতী রোজ আরও ভেঙ্গে পড়েছে। সব কিছুতে সে থাকে নির্লিপ্ত।

কিন্তু এই বৃদ্ধকে দেখে শ্রীমতী রোজের মনে কেমন মায়া জাগে।

অনাহারক্লিষ্ট মৃতপ্রায় বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে শ্রীমতী রোজ তুলে ধরে তার দুগ্ধপরিপুষ্ট একটি স্তন বৃদ্ধের মুখের ওপর।

অমৃতের স্বাদ পেয়ে বৃদ্ধের চোখে মুখে ফুটে ওঠে সকৃতজ্ঞ হাসি।

সেই চরমদিনে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের ফলে দুঃস্থ পরিবার দুটি ঐ দারুণ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পেল।

বিবমিষা

আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের দিক্‌পাল জঁাপল সার্তর্ (Jean-Paul Sartre)-এর 'নসিয়া' (Nausea), ১৯৩৮, উপন্যাসের গল্প।

এণ্টনী রকেটিন বয়সে তরুণ, জ্ঞানে বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিতে দীপ্ত। কিছুদিন থেকে তিনি গবেষণা করছেন। গবেষণার বিষয়বস্তু,—'অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ রোলেবন মার্কুইসের জীবন ও তাঁর চিন্তাধারা'।

এই ফরাসী যুবকটি মধ্য ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং প্রাচ্যের বহু দেশ ঘুরে সম্প্রতি ফ্রান্সের বোভ্যালি শহরে এসে আস্তানা নিয়েছেন। বোভ্যালি মার্কুইসের জন্মভূমি। রকেটিন তাই এ ছোট্ট শহরটিকে তাঁর আদর্শ কর্মস্থল বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা এখানে থেকেই এই গবেষণার কাজ শেষ করবেন।

এ শহরে তিনি আগন্তুক। স্থানীয় কোন লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তা হোক্। এখানকার গ্রন্থাগারে তাঁর সময় বেশ কেটে যায়। তিনি তাঁর গবেষণায় ডুবে গেলেন।

১৯৩২ সাল। শীতকাল। দেখতে দেখতে বোভ্যালিতে রকেটিনের প্রায় তিন বছর কেটে গেল। তাঁর কাজও অবশ্য প্রায় শেষ হয়ে এলো।

—কোন ফাঁকে ওগিয়ার নামে এক স্থানীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে রকেটিনের পরিচয় হয়েছে। রকেটিন তাঁকে 'সবজান্তা' বলে ডাকেন। হাঁ, ফ্রাঙ্ককস্ নামে এক মহিলার সঙ্গেও ইতিমধ্যে তাঁর কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ইনি মাঝবয়সী,—কোন একটি কাফের মালিক এবং তার পরিচালিকা। রকেটিনকে এ মহিলারও ভাল লাগত বটে।

কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক ছিল দেহ-কেন্দ্রিক মাত্র। অন্ততঃ রকেটিন তাই মনে করতেন।

—দিন যায়। ক'দিন থেকে রকেটিন মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে কেমন যেন একটা মানসিক বিকারের মত ভাব লক্ষ্য করছেন। এই বিকারের ভাব তিনি এখন প্রায় রোজই অনুভব করেন। ক্রমে এ ব্যাধি শুধু মনে নয়—এর নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া যেন তাঁর দেহের ভেতরও শুরু হল। রকেটিন ভেবে পান না,—প্রকৃতির এ কি নির্মম পরিহাস।

রকেটিনের যখন এ অবস্থা, একদিন সবজান্তা এসে হাজির হলেন তাঁর বাড়িতে।—উদ্দেশ্য, গবেষকের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হওয়া।

—রকেটিন বহু দেশ ঘুরেছেন। সেই সব দেশের বহু ছবি তাঁর কাছে ছিল। আর ছিল তাঁর সে সব দেশ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সবজান্তার লোভ ছিল ঐ সব ছবি দেখবার এবং তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনবার। আসলে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেন।

গবেষকের মন মেজাজ তখন মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। এতদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় যে মানসিক রোগ তিনি অনুভব করতেন, আজকাল সেটা অন্য সময়েও প্রকট হয়ে হাজির হয়। তাই অতিথিকে আপ্যায়ন করার মত তাঁর মনের অবস্থা সে সময় ছিল না। পরিস্থিতি এড়াবার জন্য তিনি সবজান্তাকে ক'দিন বাদে এক নৈশ-ভোজে নিমন্ত্রণ জানালেন।

তাঁর গবেষণার পাণ্ডুলিপি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,—

গত তিন বছর ধরে তিনি মার্কুইসের জীবন এবং তার চিন্তাধারা

সম্বন্ধে বহু নতুন তত্ত্ব এবং তথ্য উদ্ধার করেছেন। পাণ্ডুলিপিতে সে বিষয়ে তিনি আলোচনাও করেছেন সুন্দর ভাবে। যথেষ্ট হয়েছে। এবার লেখা বন্ধ করে ওটি পেশ করলেই হয়।

এমন সময় হঠাৎ একদিন রকেটিনের কাছে এ গবেষণার বিষয়বস্তু একেবারে অর্থহীন বলে মনে হল। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের সত্তা সম্বন্ধেও তিনি কেমন যেন সন্দিহান হয়ে উঠতে লাগলেন। গবেষকের মনে হল মার্কুইস যেন তাঁর ব্যক্তিসত্তার সবটুকু নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলেছে। ক্রমে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হল,—এই মার্কুইস তাঁকে নির্মমভাবে এতদিন ঠকিয়েছে, তাঁর সঙ্গে জোচ্চুরী করেছে। তাই, সেই প্রতারকের জীবনচরিত নিয়ে গবেষণা করার তাঁর আর কোন প্রবৃত্তি রইল না। সে প্রশ্ন অবান্তর বলে তাঁর মনে হল।

যে গবেষণা ছিল রকেটিনের জীবনের ধ্যান, একমাত্র স্বপ্ন ও আদর্শ—মুহূর্তে তা সব মিথ্যা হয়ে গেল। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনটাও একেবার অর্থহীন বলে মনে হতে লাগল। জগৎ থেকে তাঁর এই ব্যর্থ জীবন মুছে ফেলবার জন্য তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এ জীবন সত্যই অসহ্য!

রকেটিনের মনে তখন ঘোর দুর্যোগ চলেছে। তবুও ভদ্রতার খাতিরে তিনি নির্ধারিত দিনে সবজান্তার সঙ্গে নৈশ-ভোজে মিলিত হলেন। আলাপ আলোচনার মধ্যে সবজান্তা রকেটিনকে মানবতা-বাদের উপকারিতা সম্বন্ধে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। বললেন,—বিশ্বমানবতা বোধ-ই মানব জীবনের সার্থকতা—। রকেটিনকে তিনি এ নীতি অনুসরণ করতে অনুরোধ করলেন।

এ আলোচনা কিন্তু রকেটিনের মন আদৌ স্পর্শ করছিল না। ততক্ষণে তাঁকে পরিচিত সেই মানসিক বিকার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; চারপাশের সব কিছুর ওপর তার দুষ্ট প্রভাব রকেটিন উপলব্ধি করেন —সেই বিবমিষা। তাঁর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উপস্থিত নিমন্ত্রিত

অতিথির কথা তিনি ভুলে গেলেন। অস্বাভাবিক মনের আবেগে হঠাৎ এক সময় রকেটিন হোটেল থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

সবজান্তা স্তম্ভিত—

একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে, বহু ঠিকানা ঘুরে সেদিন অ্যানের একটি চিঠি এলো রকেটিনের হাতে। অ্যানে জানিয়েছে,—শীঘ্রই সে প্যারীতে বেড়াতে আসছে। সেখানে সে রকেটিনের সঙ্গ পেলে বিশেষ খুশী হবে। চিঠি নয়ত এ যেন মৃতের মুখে অমৃতের বারি-ধারা—প্রিয়ার আশ্বাস।

পুরানো বান্ধবীর এ চিঠি পেয়ে রকেটিনের মনের স্তিমিত প্রদীপ আবার জ্বলে ওঠে। বুক-ভরা আশা নিয়ে তিনি প্যারীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

দীর্ঘ তিন বছর বাদে তিনি হাজির হলেন তাঁর এককালের মানসীর কাছে। কিন্তু অ্যানেকে দেখে রকেটিন আশাভঙ্গ হলেন। দেখলেন, এ ক'বছরে অ্যানে যেন দেহে মনে অনেক বদলে গেছে। তিনি ভাবেন, কি জানি, হয়ত বা সে ঠিকই আছে—এ তাঁর ভ্রান্ত অনুভূতি মাত্র, এ তাঁর বিভ্রম। তাই হোক্। একসময় রকেটিন অ্যানের সঙ্গ ফিরে পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

অ্যানে তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। হয়ত সে তার পুরানো প্রেমিককে খুঁজছিল। মর্মাহত হয়ে সে ভাবছিল, এ যে রকেটিনের প্রেতাত্মা! রকেটিনের প্রস্তাব শুনে অ্যানের চমক ভাঙ্গে। সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত রকেটিনকে সে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়।

আহত রকেটিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ফেরবার পথে তিনি অ্যানেকে দেখতে পান এক অজানা পুরুষের বাহুলগ্ন। হয়ত বা তার নতুন প্রেমিক।

এ ঘটনার পর রকেটিন আর বেঁচে থাকবার তাগিদ পান না। তাঁর মনে হয়—এ পৃথিবীতে যেন তিনি বড্ড বেশী দিন কাটালেন—বিনা প্রয়োজনে। না, এ জীবনে তাঁর আর কিছুই করবার নেই। সাধারণ জীবের মত খেয়ে ঘুমিয়ে নিজেকে অর্থহীন ভাবে জীইয়ে রাখা ছাড়া আর কি-ই বা করবার আছে তাঁর?

তবুও তিনি ফিরে এলেন তাঁর আস্তানায়—সেই বোভ্যালি শহরে।

কিন্তু বোভ্যালিতে ফিরে এসে রকেটিনের জীবন যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠল। সঙ্গিহীন, আশাহীন, শক্তিহীন নিরর্থক এ জীবন বয়ে বেড়ানো বড়ই কষ্টকর। মুক্তি চাই এ জীবনের। এ বন্ধন অসহ্য।

ক'দিন বাদে রকেটিন গেলেন সবজান্তার সঙ্গে দেখা করতে। গ্রন্থাগারে গিয়ে তাঁর সন্ধান পেলেন। দেখলেন, সেখানে সবজান্তা দু'টি কিশোর ছেলেকে কি যেন পড়ে শোনাচ্ছেন। তিনিও তাদের পাশে বসে পড়লেন। কিন্তু খানিক বাদেই তিনি সবজান্তার আসল মতলব বুঝতে পারলেন।—ছেলে দুটিকে তিনি তাঁর বিকৃত লালসা তৃপ্ত করার জন্য জোগাড় করেছেন। কথাটা সবজান্তা এক সময় নির্লজ্জর মত তাঁর কাছে প্রকাশ করে ফেললেন। গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এ খবর জানা মাত্র সবজান্তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

রকেটিন স্থির করেন, এবার সেখান থেকে তাঁর আস্তানা গুটোবেন। চলে যাবার আগে সেই কাফের মহিলার সঙ্গে একবার তাঁর দেখা করতে ইচ্ছা হল। শেষ বারের মত কিছুটা তাঁর সঙ্গ-লাভের আশায়ও বটে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মহিলাটির সময় নষ্ট করবার অবকাশ কোথায়? একে তিনি ব্যবসায়ী, তায় তাঁর ভক্তের

ভীড়ও আছে। মহিলা রকেটিনের পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যান অন্য অতিথির দিকে—আপ্যায়ন করেন তাদের।

দাঁড়িয়ে থেকে রকেটিন দেখলেন সব কিছু। বিদায়ের ক্ষণে মহিলার সঙ্গে একটি কথাও বলবার সুযোগ পেলেন না তিনি।

এবার তাঁর প্যারীতে ফেরবার পালা। স্টেশনে এসে হাজির হলেন রকেটিন। গাড়ীতে উঠতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল,—তাঁর নিজের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়? হয়ত বা অগণিত পাঠক তাঁকে একটি বিচিত্র এবং জটিল চরিত্র বলে মনে রাখবেন। তাঁর গবেষণার বক্তব্যের চেয়ে এ উপন্যাস অনেকের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

কিন্তু পরক্ষণেই রকেটিনের মনে হয়, তাঁর নিজের জীবনে এ উপন্যাসের মূল্য কতটুকু? তাতে কি তাঁর ব্যক্তি-জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান হবে? নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার সেই দুরূহ সমস্যার হাত থেকে পাবেন কি তিনি নিষ্কৃতি?—মিলবে কোন আশ্বাস বা কোন ইঙ্গিত!

ধীরে বহে ডন

রুশ সাহিত্যের দিক্‌পাল মিখাইল শলোখফ (Mikhail Sholokhov)-এর 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' (And Quiet Flows the Don) ১৯২৮, উপন্যাসের গল্পরূপ।

অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে ডন নদী। কখনও শান্ত, কখনও উদ্দাম, কখনও বা সে-নদী তরঙ্গভঙ্গে লীলাচঞ্চল। এই ডনের উপকূলে গড়ে উঠেছে কসাকদের ঘন বসতি—তাতার্স্ক এবং আরও অনেক পল্লী। 'ডন' তো কেবল নদী নয়—কসাকদের জীবনের উৎস, তাদের প্রাণগঙ্গা।

তাতার্স্ক গাঁয়ের শেষ প্রান্তে থাকে মেলেখফ পরিবার। তবুও তাদের বাড়ির উত্তর দিকের গোয়ালঘরের দরজাটি খুললেই চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে ডনের ইস্পাত-নীল প্রবাহ। কতটুকুই বা দূরত্ব? ঘাসে-ঢাকা পাড়ের মাঝখানে হাত চল্লিশেক খাড়া ঢালু জমি তারপরই ডনের তরঙ্গায়িত জলরাশি, যা যোগায় কসাকদের দৈনন্দিন জীবনের স্পন্দন।

ওদিকে উইলো-ডালের বেড়া-ঘেরা উঠোন পেরিয়ে পূব দিকে সদর রাস্তা। সেই রাস্তা পেরোলে ধূসর 'ওয়ার্ম-উড' গাছের ঝোপ, কোথাও বা গাঢ় মেটে রঙের 'নট' ঘাসের জটলা। রাস্তার দু'মুখের মোড়টিতে কসাকদের উপাসনা মন্দির, তারপরই রুক্ষ স্তেপের বিশাল প্রান্তর। গাঁয়ের দক্ষিণে খড়ি রঙের একসার পাহাড়, যেন সতর্ক প্রহরীর মত তারা দাঁড়িয়ে আছে। আর, পশ্চিমে রাস্তাটা আড়াআড়ি ভাবে বারোয়ারি-তলা পেরিয়ে ছুটে গেছে দূর-প্রান্তরে।

স্তেপান আস্তাখফ আর তার বৌ আকসিনিয়া মেলেখফদের ঘনিষ্ঠ পড়শী। দু'পরিবারের বাড়ির মাঝখানে ডাল-পাতার হাল্কা বেড়া।

আকসিনিয়ার বিবাহিত-জীবন সুখের হয় নি। দেড় বছরের বিবাহিত জীবনে সে স্বামীর সোহাগ একদিনও পায় নি। স্তেপানের কাছ থেকে সে পেয়েছে শুধু নির্মম নির্যাতন আর লাঞ্ছনা। ক্রমে স্তেপানের প্রতি তার আকর্ষণ শ্লথ হয়।

উদাস দৃষ্টি মেলে আকসিনিয়া মাঝে মাঝে বসে থাকে তার আঙ্গিনায়। ঐ পথেই পড়শী তরুণ গ্রিগর মেলেখফ যায়-আসে কখনও কখনও বা তাদের দৃষ্টি-বিনিময় হয়। ক্রমে গ্রিগরের সে-দৃষ্টি হয়ে ওঠে কামনাতপ্ত, তার স্পর্শে আকসিনিয়ার শূন্যমনে জেগে ওঠে এক মধুর স্পন্দন। আকসিনিয়া সচেতন মনে গ্রিগরকে কামনা করে না। কিন্তু তার অবচেতন মনের বাসনা দুর্জয়।

ফৌজী শিক্ষাশিবির থেকে গাঁয়ের কসাকদের ডাক এলো। তিরিশজন কসাককে যেতে হবে। এই দলের সঙ্গে যাবে গ্রিগরের অগ্রজ পিয়োত্রা, যাবে পড়শী স্তেপানও।

দু'বাড়িতেই যাত্রার আয়োজন শুরু হয়। ক্রমে যাত্রার লগ্ন এগিয়ে আসে। দাদার ঘোড়াটাও যাবে সঙ্গে। ঘোড়াটার খাওয়া শেষ হ'লে তাকে জল খাওয়াতে গ্রিগর ছুটিয়ে নিয়ে যায় ডন নদীর দিকে। হুড়মুড় করে নদীতে নেমে ঘোড়াটা জল খেল প্রচুর। তবুও সে মুখটি তুলে তাকিয়ে থাকে প্রবাহিণী ডনের দিকে।

হঠাৎ পিছন দিকে নজর পড়তে গ্রিগর লক্ষ্য করে, অদূরে আকসিনিয়া বাঁকে করে ডনের জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গ্রিগরও ছুটল তার পেছনে। আকসি-নিয়ার সামনে ঘোড়াটাকে আড়াআড়ি এনে গ্রিগর রাশ টানে।

ভয় পেয়ে আকসিনিয়া চেঁচিয়ে ওঠে —

—এ্যাই বদমাশ, দাঁড়াও তোমার বাপকে বলে দিচ্ছি। এমনি করে তুমি ঘোড়া ছোটাও ?

—রাগ করো কেন গো সুন্দরী ?···তাহ'লে চলে যাচ্ছে তোমার স্তেপান ?

তাতে তোমার কি ?

ইস্, অত দেমাক কিসের ? মনে রেখো, এখন থেকে আমাকে তোমার প্রয়োজন হবে।

কোন্ কাজে ?

অনেক কাজে। ঘাস কাটারও দেরী নেই কিন্তু। সে-কথা যাক্। স্বামীর জন্য তোমার মনটা কেমন করছে, না ?

ঘাড়টা ফিরিয়ে একটু বাঁকা হাসি হেসে আকসিনিয়া জবাব দেয়,—তা একটু করছে বৈ কি ? বিয়ে কর, বুঝবে।

তারা দু'জন পাশাপাশি এগিয়ে চলে। আড়চোখে গ্রিগর আকসিনিয়ার দিকে তাকাতে লক্ষ্য করল, তার ঠোঁট দু'টো কি নির্লজ্জ লালসাতুর। গ্রিগর উত্তর দিল—

—বিয়ে করার আমার ইচ্ছা নেই···।

তা হ'লে বলো, নজর পড়েছে কারুর ওপর।

নজর আবার কি ? আগে স্তেপান বিদেয় হোক তো···।

খবরদার। আমার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে এসো না। আমার ওপর নজর দিতে এসো না। স্তেপানকে বলে দেবো কিন্তু।

আকসিনিয়া জানে, একে তো কসাক তায় ওর গা-য়ে তুর্কীর রক্ত রয়েছে; গ্রিগর স্তেপানকে কিছুমাত্র ভয় করে না। তবুও কেন জানি সে কথাটা বলে ফেলল। বলেই সে বুঝি নিজের ফাঁদে পা বাড়াল।

আকসিনিয়ার উক্তি শুনে গ্রিগর গর্জন করে ওঠে—

—আমাকে ভয় দেখিয়ো না। বেশ করব। এখন থেকে তোমার ওপর আরও বেশি ক'রে নজর দেবো।

বেশ তাহ'লে নজর দাও।

আকসিনিয়ার ঠোঁটে সন্ধির হাসি ফুটে উঠতে দেখে গ্রিগর তৃপ্তির নিঃশ্বাস নেয়।

গ্রিগর, এবার আমাকে যেতে দাও। স্তেপানের যাবার সময় হয়ে এল না ? দেখছো না—আশপাশে লোক রয়েছে ?—আকসিনিয়ার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর।

ঘোড়াটাকে একটা সংকেত করতে নিমিষে গ্রিগর ফিরে এলো বাড়িতে। আকসিনিয়ারও পৌঁছুতে দেরী হ'ল না।

ততক্ষণে পিয়োত্রা এবং স্তেপান দু'জনেই তৈরী হয়ে নিয়েছে। কসাক দলটি চলে গেল ফৌজী শিক্ষাশিবিরে—গাঁ থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে।

সে-দিন সন্ধ্যায় গাঁয়ের মাথায় গাঢ় মেঘ দেখা গেল। ক্রমে ঝড় উঠল। বিদ্যুৎ আকাশের বুকটাকে অবিরত চিরে দিচ্ছে। বজ্রের গুরুগর্জনে মাঝে মাঝে মাটি কেঁপে উঠছে। ওদিকে ক্রুদ্ধ ডন বাতাসের ঝাপটায় দু'পাড় আছড়ে ফেনা ওগরাচ্ছে ঘন ঘন।

বৃদ্ধ পান্তালিমন মেলেখফ চিৎকার করে ছেলে মেয়ে আর জাল দু'টোকে মুহূর্তের মধ্যে জড়ো করে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ডনের দিকে, মাছ ধরতে। তারা সঙ্গে নেয় আকসিনিয়াকেও সাহায্য করতে।

তখনও মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। মাটিতে পা টিপে টিপে এগুতে এগুতে এক সময় তার কোমর জলে গিয়ে পড়ল গ্রিগর। কনকনে ঠাণ্ডায় তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটা বুঝি বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর জলের ঢেউগুলো যেন চাবুক মারছে গ্রিগরের চোখে মুখে। হঠাৎ তার পা'টা হড়কে যেতে জালটা ফসকে যায় গ্রিগরের হাত থেকে। স্রোতে তাকে নিয়ে যায় মাঝ দরিয়ায়।

অনেক কষ্টে পাড়ের কাছে ফিরে এসে গ্রিগর চিৎকার করে ওঠে,—আকসিনিয়া, ঠিক আছ তো ?

ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর তার কানে ভেসে এল,—এখনও আছি।

চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু বাতাস আর ডনের ক্রুদ্ধ গর্জন।

খানিক পরে কান্নায় ভাঙ্গা আকসিনিয়ার আর্তনাদ গ্রিগর শুনতে পায়,—'গ্রিগর, তুমি কোথায় ?'

জালটা টানতে টানতে গ্রিগর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এলে স্মিত মুখে আকসিনিয়া তাকে জানায়,—

পাড়ের সঙ্গে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছলাম। ভেবেছিলাম তুমি হয়ত ডুবে গেছ। তাই…

ঠিক সেই সময় গ্রিগরের বোন ছুনিয়া দৌড়ে এসে জানাল, ওরা এক বোরা ভর্তি স্টারলেট মাছ ধরেছে। বাবা তাদের ছু'জনকে এক্ষুণি বাঁকের মুখে যেতে বলেছে।

জালটা গুটিয়ে নিয়ে ওরা ছু'জন পাড়ে ওঠে। কিন্তু ছু'জনের পা-ই অনড়। উভয়েই শীতে কাঁপে ঠক্ ঠক্ করে। তবুও তারা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। খানিক এগুতে একটা পুরনো খড়ের গাদা গ্রিগরের নজরে পড়তে সে প্রস্তাব করে,—চল, ওটার ভিতর ঢুকে গা গরম করে নিই ছু'জনে।

আকসিনিয়া যেন হাতে স্বর্গ পায়।

সেই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়ে গ্রিগর আকসিনিয়ার পাশে শুয়ে পড়ে। খানিক বাদে তার মাথাটা গ্রিগর টানবার চেষ্টা করতে আকসিনিয়া উঠে দাঁড়ায়। বলে,—আমাকে যেতে দাও, নইলে চেঁচাব কিন্তু।

—চুপ, চুপ।

সত্যিসত্যিই আকসিনিয়া বেরিয়ে এসে চিৎকার করে ওঠে,—পান্তালিমন গো।

কিন্তু পাশের কোন ঝোপ থেকে বুড়ো তার কাছে এগিয়ে আসতে আকসিনিয়া গ্রিগরের বিরুদ্ধে নালিশের কথা ভুলে যায়। বলে,—'শীতে মলাম।' তারপর মুচকি হেসে বোরাটা তুলে নিয়ে আকসিনিয়া তাদের সঙ্গে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

এলো ট্রিনিটি পরব। পরবের দু'দিন আগে গাঁয়ের ঘাস-জমি ভাগা-ভাগি হ'ল কসাকদের মধ্যে। পান্তালিমন স্থির করল, পরবের পরে তার অংশের ঘাস কাটতে শুরু করবে। পড়শী স্তেপানের অংশ কাটবার দায়িত্বও তার। আকসিনিয়া তাদের সঙ্গে যাবে সাহায্য করতে।

পরবের পরেই শুরু হ'ল ঘাসকাটা। ঘাসকাটা নয়তো যেন এক উৎসব। গোটা গ্রামটাই বুঝি মাঠে নেমেছে। ডনের পারের সেই সুবিস্তৃত মাঠটা প্রাণের স্পন্দনে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে সেদিনের মত ঘাসকাটা বন্ধ হ'ল। অন্যসব মেয়েদের সঙ্গে কাটা-ঘাসের শেষ আঁটিটা পর্যন্ত আকসিনিয়া ঝাড়াই করল।

খাওয়ার পাট চুকে গেলে স্থির হ'ল রাতটা তারা ঐ মাঠে কাটিয়ে সকালে বাকী ঘাস কেটে বাড়ি ফিরবে।

এরই মধ্যে বুড়ো পান্তালিমন গাড়িতে কখন থেকে বিচিত্র সুরে নাক ডাকাতে শুরু করেছে। মেয়েরা কেউ গাড়ির ভিতর কেউবা গাড়ির নীচে শুয়ে পড়েছে। বাপের আদেশে গ্রিগর গেছে বলদ দু'টির তত্ত্বাবধানে।

মাঝ রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। চোরের মত পা টিপে টিপে গ্রিগর এক সময় তাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। খানিক এগিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়।

গাড়ির ভিতর থেকে আপাদমস্তক ঢাকা এক ধূসর মূর্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে গ্রিগরের দিকে। এবার গ্রিগর গুঁড়ি মেরে

এগিয়ে গিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল কামনাতপ্ত, আত্মসমর্পিত একটি নারী মূর্তিকে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যায় আকসিনিয়া।

গ্রিগর তাকে কোটের ভিতর জড়িয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে সেখান থেকে। আকসিনিয়ার প্রাণ হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত।

হঠাৎ আকসিনিয়া অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে,—গ্রিগর, তোমার বাবা।

চুপ।

আচ্ছা, এবার আমাকে নামিয়ে দাও। নিজেই যাচ্ছি। এখন আর কি এসে যায় বলো!

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না। তারপর দু'দিন বাদে গাঁয়ের রাখাল বালকটি সে-দিন ভোরে ওদের দু'জনকে রাইক্ষেতের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে আসে। এবার ওদের কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ্যে আলোচনা হতে থাকে পাড়ায় পাড়ায়। খবরটা বৃদ্ধ পান্তালিমনের কানেও পৌঁছতে দেরী হয় না।

আকসিনিয়া কিন্তু তবুও মাথা উঁচু করেই ঘুরে বেড়ায়। তার চোখে মুখে খুশীর ছোঁয়াচ।

পান্তালিমন গ্রিগরকে ধরে চাবকাল খুব। আকসিনিয়াকেও গালমন্দ করল, তাকে শাসালো। তারপর সে ছেলের বিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু বাপের চাবুক বা তার বিয়ের উদ্যোগ এদের দু'জনের গোপন মিলনে কোন বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় না। দু'জনের সে মিলনের লালসা ক্রমে প্রকট হয়ে ওঠে।

সে দিন গভীর রাত্রে আস্তাখফদের বিছানায় গ্রিগর এবং আকসিনিয়া শুয়ে আছে পাশাপাশি। হঠাৎ আকসিনিয়া করুণ ভাবে বলে ওঠে—

স্তেপান ফিরে আসছে আর ছ'দিন পরে। চলো আমরা পালিয়ে যাই কোথাও। সব কিছু ছেড়ে আমি শুধু তোমাকে ভালবাসবো।

—বোকার মত কথা বল কেন? আসছে বছর আমার ফৌজী-বেগার। তাছাড়া এ গাঁ ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না, জেনো; আমার দম আটকে আসবে।

গ্রিগরের উক্তি শুনে আকসিনিয়া মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

পরের দিন রাতের অন্ধকারে আকসিনিয়া ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ে গাঁয়ের বদ্যি-বুড়ির পায়ের উপর। কাতর কণ্ঠে বলে—

বুড়ীমা, বাঁচাও আমাকে। ওরা ওকে বিয়ে দিচ্ছে।...আমার শেষ কামিজটা পর্যন্ত তোমাকে দেব। শুধু গ্রিগরকে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে।

কাল ভোরে আঁধার থাকতে আসিস। ডনের জলে তোর সব দুখ্‌খু ধুয়ে দেব, বাছা। হাঁ, সঙ্গে একটু নুন আনতে ভুলিস নে যেন। —বুড়িমা-র কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর।

অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে আকসিনিয়া তার বুড়িমার নির্দেশ পালন করল। তবুও কিন্তু তার পরের দিন স্তেপান ফিরে এলো ফৌজী-ক্যাম্প থেকে। ক'দিন বাদে সুন্দরী নাতালিয়ার সঙ্গে গ্রিগরেরও বিয়ে হয়ে যায়।

ক্যাম্পে থাকতেই স্তেপান শুনেছিল তার বৌ-র ব্যভিচারের কথা। বাড়ি ফিরেই সে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে আকসিনিয়াকে। তার আর্তনাদ শুনে গ্রিগর আর পিয়োত্রা ছুটে না এলে আকসিনিয়া হয়ত সে-যাত্রায় বাঁচত না। আকসিনিয়া নীরবে সহ্য করে যায় স্তেপানের অত্যাচার আরও অনেক কসাক-বৌদের মত।

অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে হলেও নাতালিয়া চতুর মেয়ে। ছ'দিনেই

সে সংসারের সকলের হৃদয় জয় করে ফেলে। শুধু পায় না সে স্বামীর সোহাগ, না তার মনের হদিস।

একদিন গ্রিগর বৌকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সে তাকে ভালবাসে না। তার সঙ্গে ঘর করা গ্রিগরের পক্ষে অসম্ভব।

ওদিকে আকসিনিয়া গ্রিগরকে ভুলতে পারে না। গ্রিগর-হীন জীবন তার কাছে হয়ে ওঠে অসহ্য।

সেদিন জেলার সব তরুণ কসাকদের সঙ্গে ফৌজী-বেগার দেবার শপথ নিয়ে গ্রিগর ফিরে এল সন্ধ্যাবেলায়। ফিরে এলে নাতালিয়ার প্রতি তার উদাসীনতাকে কেন্দ্র করে বাপ আর ছেলের মধ্যে বিশ্রী ভাবে ঝগড়া হল। বাপ ছেলেকে বলল,—'বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা।' সঙ্গে সঙ্গে গ্রিগর বেরিয়ে যায় এক-বস্ত্রে। নাতালিয়ার বুকভাঙ্গা কান্না তার গতি রোধ করতে পারে না। যাবার মুখে গ্রিগর একবার ফিরেও তাকায় না।

এ ঘটনার পরের দিনই গ্রিগর আকসিনিয়াকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যায় ভিনগাঁয়ে। তারা দু'জনে ঘর বাঁধে ইয়াগোদনয়ের জমিদার বাড়িতে। গ্রিগর হ'ল জমিদারের কোচোয়ান আর আকসিনিয়া বহাল হয় তাঁর রান্নাঘরে।

কিছুদিন বাদে আকসিনিয়ার কোলে এল গ্রিগরের একটি কন্যা-সন্তান। তার ক'মাস বাদে গ্রিগরের ডাক এল ফৌজ থেকে।

১৯১৪ সাল। রাশিয়ায় আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ডন নদীর উপকূলের সব গাঁ উজাড় করে কসাকদের যেতে হল সেনাবাহিনীতে। তার রেজিমেণ্টের সঙ্গে গ্রিগর চলে যায় রুশ-অস্ট্রিয় সীমান্তের দিকে।

মাঠের কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রথমটায় তরুণ কসাকরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জীবনের ক্লান্তিকর অসাড় দিকটা তাদের কাছে প্রকট

হয়ে ওঠে। শুধু কি তাই? সামান্য ত্রুটিতে উপরওয়ালাদের থেকে তাদের ওপর বর্ষণ হয় অশ্রাব্য গালমন্দ কখনও বা চাবুক। তারা সব অবিচার নীরবে সহ্য করে যায়—ওরা যে কসাক!

অফিসারদের পোষাক-আসাক আর চালচলন গ্রিগরকে বুঝিয়ে দেয়—দু'শ্রেণীর মধ্যের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের কথা। গ্রিগরের রাত্রের বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল তাদের আস্তানার জানালার নীচে, ঘাসের মাদুরটিতে।

গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে গ্রিগরের মনে ইচ্ছা জাগে, সে ছুটে যাবে আস্তাবলে তারপর সে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে বাড়ির দিকে। কিন্তু তার সার্জেন্ট-মেজরের চাবুকটার কথা মনে হতে অসহায় গ্রিগরকে পাশ ফিরে চোখ বুজতে হয়।

সীমান্তের প্রথম লড়াইয়েই সেদিনের গভীর মানসিক যন্ত্রণাটা গ্রিগরের মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। ঘুমের ঘোরেও সেই অস্ট্রিয়ানের অশরীরী মূর্তি, যাকে সে বর্শা দিয়ে নির্মম ভাবে খুন করেছিল, জেগে ওঠে তার মানসপটে। কখনও বা আর একজনের স্মৃতি তাকে তাড়া করে যাকে গ্রিগর ঐ একই দিনে কুপিয়ে মেরেছিল।

সাথীর দুঃসহ মানসিক অবস্থা উপলব্ধি ক'রে তার এক কসাক সৈনিক-ভাই গ্রিগরকে উৎসাহ দেয়—

ভুলে যেওনা তুমি কসাক। প্রয়োজনে দ্বিধাহীন মনে মানুষ খুন করা তোমার ধর্ম। আর লড়াইয়ে শত্রুকে কুপিয়ে মারা তো পুণ্যের কাজ।

গ্রিগর ক্রমে আত্মস্থ হয়ে ওঠে। আবার সে অমিত বিক্রমে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ওপর।

মাঝে মাঝে গ্রিগর সংক্ষিপ্ত চিঠি লেখে তার বাবাকে। হিসেব করে সে উল্লেখ করে নাতালিয়ার কথা কখনও বা এড়িয়ে যায় সন্তর্পণে। আর, আকসিনিয়াকে গ্রিগর জানায়—এক নাগাড়ে

সীমান্তে থেকে লড়াইয়ের প্রতি তার ঘেন্না ধরে গেছে ; মৃত্যুকে পিঠে বয়ে তাকে দিন কাটাতে হয়।

যুদ্ধ গড়িয়ে চলে। বছর ঘুরে যায়। যুদ্ধ চলে অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে, রুমানিয়ার সঙ্গে, কখনও বা জর্মনদের সঙ্গে। সেনাবাহিনী মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বাড়ির জন্য তাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে। তবুও তাদের যুদ্ধ করতে হয়।

রণাঙ্গন থেকে পিয়োত্রা বাপকে জানাল—

গ্রিগর মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে সে একাকী পড়েছিল। গ্রিগর মরে গেছে বলেই সকলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু গভীর রাত্রে গ্রিগরের জ্ঞান ফিরতে আকাশের তারার দিকে লক্ষ্য রেখে হামাগুড়ি দিয়ে সে নিরাপদ এলাকায় পোঁছে। ঐ অবস্থায় নিজের জীবন তুচ্ছ করে একজন আহত অফিসারকেও প্রায় চার মাইল সে বয়ে এনেছিল। তার এই অসাধারণ বীরত্বের জন্য গ্রিগর 'সেণ্ট জর্জ ক্রশ' পুরস্কার লাভ করেছে। তার পদোন্নতিও হয়েছে।

শুধু তাতার্স্ক-এই নয়, আশপাশের গাঁয়ের মধ্যে গ্রিগরই প্রথম এই দুর্লভ পুরস্কারের গৌরব লাভ করল। গর্বে তার বাবার বুকটা ফুলে ওঠে। আনন্দাশ্রুতে মা-র বুক ভেসে যায়। নাতালিয়া চুপি চুপি ঈশ্বরের কাছে গ্রিগরের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

আরও কিছুদিন পরে গ্রিগর হঠাৎ ছুটি পেল। এই সে প্রথম ছুটি পায়। সে ছুটে যায় আকসিনিয়ার কাছে, বাড়িতে নয়। কিন্তু ঐ রাত্রে সে-বাড়িতে পা দিয়েই গ্রিগর আশাহত হয়। সে জানল তার ছোট্ট মেয়েটি ইতিমধ্যে দু'দিনের জ্বরে দাপাদাপি করে মারা গেছে। আকসিনিয়া জমিদারের ছেলে তরুণ অফিসার ইউজেনের সঙ্গে রঙ্গরসে ডুবে আছে। ইউজেনে ছুটিতে এসে রাত কাটাচ্ছিল আকসিনিয়ার শয্যায়।

আকসিনিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে গ্রিগরের মাথায় খুন চেপে যায়। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। ঘরে ঢুকে আকসিনিয়ার সঙ্গে মামুলি দু'একটা কথা বলে গ্রিগর বিছানায় শুয়ে পড়ে।

সকালে উঠেই সে জমিদারের সঙ্গে দেখা করল। তারপর কৌশলে, ইউজেনেকে গাড়িতে নিয়ে গ্রিগর ছুটে গেল এক নির্জন উপত্যকায়। আচমকা গাড়িটি থামিয়ে চাবুকটি হাতে নিয়ে গ্রিগর এক লাফে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। মুখে একটি কথাও না বলে চাবুকটি শূন্যে দুলিয়ে প্রচণ্ড জোরে ইউজেনের মুখের ওপর আড়াআড়ি বসিয়ে দেয়।

ইউজেনে কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অবকাশ পেল না। চটাস্ চটাস্ শব্দ করে অবিশ্রান্ত ভাবে চাবুকটি তার সর্বাঙ্গে আঘাত করে চলল। আত্মরক্ষা করবার জন্য রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মরিয়া হয়ে ইউজেনে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপর চাবুকের আর একটি আঘাত পড়তে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তবুও ইউজেনে রেহাই পায় না। এবার গ্রিগর তার লোহার নাল-লাগানো ফৌজী বুটের গোড়ালি দিয়ে নির্মমভাবে ইউজেনেকে পিষতে থাকে। ততক্ষণে ইউজেনের নড়বার শক্তি লোপ পেয়েছে।

হঠাৎ আকসিনিয়ার কথা মনে পড়তে গ্রিগর গাড়িতে উঠে বসে ঝড়ের বেগে ছুটে চলে জমিদারের বাড়ির দিকে। গাড়িটি বাড়ির গেটের বাইরে থামিয়ে চাবুকটি শক্ত মুঠিতে নিয়ে সে উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। তারপর সপাং সপাং করে আকসিনিয়ার সুন্দর মুখখানার ওপর চাবুক মেরে তেমনি উন্মাদের মতই গ্রিগর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সেই অবস্থায় বিভ্রান্ত আকসিনিয়াও ছোটে তার পিছু পিছু। কাতর ভাবে সে গ্রিগরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু গ্রিগরের গতি এতটুকুও শ্লথ হয় না। একবারও সে পিছন ফিরে তাকাল না।

গ্রিগর ছুটে চলে তার নিজ গাঁয়ের দিকে। চাবুকটি তখনও ধরা তার শক্ত মুঠির মধ্যে। আকসিনিয়াকে অগত্যা ফিরে আসতে হয় তার সেই অভিশপ্ত আস্তানাতে।

বাড়িটি নজরে স্পষ্ট ভেসে উঠতে গ্রিগরের সম্বিত ফিরে আসে। বাড়িতে ঢুকবার আগে সে হাতের চাবুকটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

অপ্রত্যাশিত ভাবে গ্রিগর বাড়ি ফিরে এলে গোটা বাড়িটাতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। গ্রিগর নাতালিয়াকে বুকে তুলে নেয়।

একদিন নাতালিয়া স্বামীর অবহেলার দহন থেকে মুক্তি-কামনায় নির্মমভাবে আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। আজ তার স্পর্শে এক অনাস্বাদিত মূক আনন্দে নাতালিয়ার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপে, দু'গাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। মনে ভাবে, এত সুখ সে সইতে পারবে কি? নাতালিয়া নিজেকে সঁপে দেয় স্বামীর কাছে।

হাসপাতালের ডাক্তারের নির্দেশে অল্প ক'দিনের ছুটি পেয়েছিল গ্রিগর। ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে যেতে সে আবার ছুটে যায় রণাঙ্গনে। ক'দিন বাদে নাতালিয়ার দেহে ফুটে ওঠে তাদের মধুর মিলনের স্বাক্ষর। স্বামী সোহাগের গর্বে নাতালিয়ার মনটা ভরে ওঠে কানায় কানায়।

যথাসময়ে নাতালিয়া গ্রিগরকে উপহার দেয় যমজ সন্তান। কিন্তু রণাঙ্গনে থেকে সে-অমূল্য উপহারের কথা গ্রিগরের ভাববার অবকাশ কোথায়?

অভিশপ্ত লড়াইয়ের দ্বিতীয় বছরও গড়িয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যা আরও বেশী। অগণিত অসহায় নারী আর অনাথ শিশুর হাহাকারে চারিদিক মুখরিত। এদিকে সৈন্যগণ দীর্ঘকাল অনাহারে অর্ধাহারে ট্রেঞ্চে বসে বসে পচে গলে মরেছে। তবুও যুদ্ধ চলে।

ক্রমে চারিদিকে এক চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। সৈন্যগণ উপলব্ধি করে এ নিধনযজ্ঞ জার সরকারের ইচ্ছাকৃত, তাদের স্বার্থের খাতিরে—দেশের মঙ্গলের জন্য নয়। তারা এবার ভাবতে শুরু করে, অস্ট্রিয়ান বা জর্মনরা তাদের শত্রু নয়—তাদের আসল শত্রু হচ্ছে জার এবং সেইসঙ্গে দেশের শিল্পপতি এবং জমিদারগণ।

কসাক বানচাকও ইউজেনের রেজিমেণ্টের একজন অফিসার। সেদিন ইউজেনের ক্যাম্পে ক'জন অফিসারের আড্ডা জমে উঠেছে। হঠাৎ বানচাক তাদের জানাল: লড়াই সম্পর্কে সৈন্যগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে সুরু করেছে; কোন কোন সীমান্ত থেকে তারা পালাতেও শুরু করেছে। সে সতর্ক করে, এ কাল-যুদ্ধ শীঘ্রই ডেকে আনবে বিপ্লব হয়ত বা গৃহযুদ্ধও। বানচাক তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল রুশ-জাপান যুদ্ধ থেকে।

বানচাকের উক্তি শুনে অন্য সব অফিসার চমকে ওঠে। বানচাক তাদের লেনিনের উদাত্ত বাণী শুনিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না; জনসাধারণের ওপর সে-বাণীর অমোঘ প্রভাবের কথা জানাতেও বানচাক ভুল করে না।

পরের দিন বানচাককে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তার নাগাল আর পাওয়া গেল না। উপরওয়ালারা হতভম্ব হয়।

যুদ্ধের তৃতীয় বছরে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। গাঁয়ের পুরুষহীন বাড়ির চালাগুলো হাঁ করে পড়ে, কোন বাড়ি বা ধ্বসে পড়ে আছে রাস্তার ওপরেই। বাড়ির উঠোন সব জঞ্জালে ভর্তি। রাস্তার-ও ঐ একই অবস্থা। মাঠে লাঙল পড়ে না। সর্বত্র এক জীর্ণতার ছাপ ফুটে উঠছে।

তবুও যুদ্ধ চলে অবিরাম গতিতে। বীর বিক্রমে গ্রিগর কসাক গৌরব রক্ষা করে চলে। তাদের সে অমর বীরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে

গ্রিগর নিজের জীবন বিপন্ন করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। নিজ মহিমায় সে হয়ে ওঠে গৌরবমণ্ডিত। চারটে 'সেণ্ট জর্জ ক্রশ'-ই শুধু সে পায় নি, গ্রিগর এখন একজন পদস্থ অফিসার।

ক্রমে জনগণের মনের চাপা অসন্তোষ বিক্ষোভের রূপ নেয়। দেখতে দেখতে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রামক ব্যাধির মত সে-বিক্ষোভ সৈন্যদের ভিতরও প্রসারিত হতে থাকে।

এমন সময় খবর এল সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাই-এর রাজত্বের পতন হয়েছে, সেই সঙ্গে হয়েছে জারের রাজতন্ত্রের অবসান। বল-শেভিক-দল মাথা উঁচু করে উঠেছে। অস্থায়ী সরকার হাতে তুলে নিয়েছে রাজ্যের শাসনভার।

চারিদিকে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার ঢেউ বয়ে যায়। সে পরিস্থিতিতেও যুদ্ধ চলে অবিরাম গতিতে।

কসাকরা ভাবে, স্বাধীনতাই যদি এল তবে কেন এই অকারণ যুদ্ধ! কেন সে যুদ্ধ বন্ধ হয় না! তাদের মনে কেমন সন্দেহ জাগে। ফলে, তাদের নিয়ে অফিসারদের লড়াই করা এবার কষ্টকর হয়ে ওঠে।

বিপ্লবের খবরটা একসময় সীমান্তে গিয়েও পৌঁছল। সেখানের কসাকরা এখন আর অফিসারদের ভয় করে না। তারা দলে দলে ফিরে যায় নিজ নিজ গাঁয়ে। চলার পথে বাধা পেলে কসাক-সৈনিকরা সঙ্গে সঙ্গে অফিসারদের গুলি করে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

দেশের চারিদিকে বিপ্লবের ঢেউ বয়ে চলেছে। ডন নদীর উপকূলের পল্লীগুলিও বিপ্লবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের শরতের শেষ দিকে তাতার্স্ক গাঁয়ের কসাকরা দলে দলে ফিরে এল। তাদের শেষ দলটি খবর নিয়ে এল—গ্রিগর বলশেভিকদের দলে যোগ দিয়েছে।

গ্রিগর তখন একজন কম্পানি-কমাণ্ডার। সে তার কর্তব্যে স্থির,

অবিচল। কিন্তু চারিদিকের ঘটনাচক্রের আবর্তে পড়ে তার মনেও কেমন দ্বিধা জাগে। ক্রমে গ্রিগর চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিছুদিন বাদে। ইউক্রেণীয় আর জর্মন বাহিনীর তাড়া খেয়ে তু'নম্বর সমাজতন্ত্রী ফৌজের দলটি ডন অঞ্চলের দিকে হঠে আসে। এই রেড-গার্ডরা গাঁয়ে ঢুকে কসাকদের ধন সম্পত্তি অবাধে লুট করে, করে কসাক-মেয়েদের ধর্ষণ। নিরীহ লোকদের অকারণ লাঞ্ছিত করতেও তারা কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

তাদের এই অত্যাচারের খবর জানতে পেরে আশপাশের গাঁ থেকে কসাকরা হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমাজতন্ত্রী বাহিনীটির ওপর। ফলে, রেড-গার্ডদের অর্ধেক মারা যায়, বাকী সব বন্দী হয়। এমনি ভাবে বহু অস্ত্র-শস্ত্র এবং ফৌজী সরঞ্জাম কসাকদের হাতে আসে।

এ ঘটনার পর মিগুলিনস্ক আর কাঝানস্ক জেলার কসাকরা তাদের অঞ্চল থেকে বলশেভিক সরকারকে উচ্ছেদ করে। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ডনের উত্তর দিকের জেলাগুলিও সেখানের বিপ্লবী কমিটির আওতা থেকে মুক্ত হয়। তারপর বারটি কসাক জেলা এবং একটি ইউক্রেণীয় জেলাকে কুক্ষিগত করে তারা স্বাধীন ভাবে চলতে স্থির করে। এই নতুন জেলার নাম হল 'উত্তর ডন', জেলার কেন্দ্র হল—ভিয়েশেনস্কায়। তাদের নতুন আতামান নির্বাচিত হতেও দেরী হয় না। সেই সঙ্গে প্রতি গাঁয়ে গড়ে ওঠে এক একটি স্বেচ্ছাসেবক ফৌজী-বাহিনী। এমনি ভাবে কসাকদের ভিতর গড়ে ওঠে প্রতি-বিপ্লবী দল।

এই সময় গ্রিগরও একদিন ফিরে এল তার গাঁয়ে। তার এই আগমন অপ্রত্যাশিত হলেও অবাঞ্ছিত হল না।

আরও কিছুদিন পরের কথা। ভিয়েশনস্কা থেকে তাতার্স্ক গাঁয়ে

খবর এল—দলপতি পোদ্‌তিয়েলকোভ রেড-গার্ডদের নিয়ে উত্তর ডনের দিকে এগিয়ে আসছে।

খবর শুনে পিয়োত্রার নেতৃত্বে গাঁয়ের কসাকদল ছুটে যায় রেড-গার্ডদের সঙ্গে লড়াই করতে। গ্রিগর একসময় রেড-গার্ডদের সঙ্গে ছিল বলে ওরা তার নেতৃত্বে ভরসা পায় নি। তার অগ্রজ পিয়োত্রাকে দলপতি করেছে। কিন্তু গ্রিগরও ছোটে তাদের সঙ্গে।

পোনামারিওভ গাঁয়ে ওরা পোঁছে জানল পোদ্‌তিয়েলকোভকে তার বাহিনী সহ বন্দী করা হয়েছে। বন্দীদের সকলকে সেদিন-ই গুলি করে মারা হবে শুনে গ্রিগর আঁত্‌কে ওঠে। ওরা একটু এগিয়ে যেতে হাজির হল বধ্য-ভূমিতে। সেখানের বীভৎস দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে যাবার জন্য গ্রিগর উপস্থিত জনতার ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে। এগিয়ে আসতে রেড-গার্ডদের দলপতি পোদ্‌তিয়েলকোভের মুখোমুখি পড়ে যায় গ্রিগর।

গ্রিগরকে দেখে দলপতি ব্যঙ্গভরে বলে ওঠে,—'বেশ, তাহলে তুমিও আছো এদের সঙ্গে। তা ভালো, সুবিধা মত উভয় দলেই রয়ে গেলে!'

তার উক্তি শুনে গ্রিগর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফস্‌ করে দলপতির হাতটা চেপে ধরে গ্রিগর দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়,—

গ্লুবোকার লড়াইয়ের স্মৃতি আপনার তো ভুলবার কথা নয়। সেদিন আপনার হুকুমেই অফিসারদের গুলি করে মারা হয়েছিল। ইহুদিদের হাতে কসাকদের বেচে দেবার মূলেও আপনি ছিলেন…।

গ্রিগর আরও কি বলতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে তার বন্ধু ক্রিস্তেনিয়া এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

দলপতি এগিয়ে এসে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে,—'আপনারা কি মনে করেন আমাদের মৃত্যুতেই বিপ্লবের সমাধি হবে? অসম্ভব, তা হতে পারে না। জেনে রাখুন, বিপ্লবী-শক্তি একদিন কায়েম হবেই। তখন গোটা দেশ জুড়ে হবে সোবিয়েত সরকার'…।

তার উক্তি গ্রিগরের কানে পৌঁছল না। ততক্ষণে সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে—তাতার্স্কি গাঁয়ের পথে।

ততক্ষণে গোটা রেডগার্ড বন্দী-বাহিনীটিকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়েছে। এই বাহিনীর সঙ্গে বানচাকও বলি হ'ল। তারপর সেই মৃতদেহগুলি একসঙ্গে একটি গর্তের ভিতর ফেলে শবগুলির ওপরে মাটি চাপা দিয়ে পায়ে পায়ে মাড়িয়ে দেওয়া হয়। জায়গাটা একটি ঢিবির মত হয়ে থাকে।

এবার কালো মুখোসপরা দু'জন এগিয়ে এসে রেডগার্ডদের দলপতি পোদ্‌তিয়েলকোভকে ফাঁসিকাঠের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সে বীরের মত ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করেছে। মাথাটা উঁচু করে বীরদর্পে দলপতি ফাঁসিকাঠের নীচের টুলটার ওপর গিয়ে দাঁড়াল। জামার কলারের বোতাম খুলে সে নিজ হাতেই চর্বিমাখানো দড়িটা গলায় গলিয়ে দিল। তার হাত একটুও কাঁপল না।

দর্শকদের ছোট্ট একটি দল তখনও অদূরে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। বাকী সব খানিক আগের সেই বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে কখন বাড়ী ফিরে গেছে। সেই ছোট্ট দলটির দিকে হাতদু'টি বাড়িয়ে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে দলপতি এবার চিৎকার করে বলে,—

—দেখুন, আমার এ ফাঁসি দেখবার জন্য মাত্র ক'জন রয়েছেন!··· ওরা আপনাদের চরম ধোঁকা দিয়েছে। বিপ্লবী সরকার একদিন আসবেই, তখন বুঝতে পারবেন কোনদিক সত্য···।

একসঙ্গে অনেকগুলো উত্তেজিত কণ্ঠের গর্জনে দলপতির কথা ডুবে গেল। এমন সময় তড়িৎবেগে কে একজন ছুটে এসে লাথি মেরে দলপতির পায়ের নীচের টুলটা ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় ফাঁস আটকে গিয়ে দলপতির বিশাল দেহটা ঝুলে পড়ে; খানিক বাদে তার রক্তজমাট কালোজিভটা বেরিয়ে আসে, রক্তরাঙা চোখ দু'টা ঠিকরে বেরোয়।

সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে উপস্থিত বিমূঢ় জনতা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে ; কেউ বা কপালে বুকে হাত ঠেকিয়ে ক্রশের ভঙ্গী ক'রেই বাড়ির দিকে ছুটে পালায়।

* * *

বছর ঘুরতে একটি অনাদৃত কবরের ঢিবি 'ওয়ার্ম-উড্' আর বুনো ঝোপে ঢেকে যায় ; বুনো ওট্ গাছও ঢিবিটির 'পরে ত্বলতে থাকে, পাশ থেকে সরষে গাছের ফুলের গুচ্ছ মুঠো মুঠো হলুদ রং ছড়ায়। সেখানে হয় শ্যামা-ঘাসের জটলা। তাদের সঙ্গে মিতালি পাতাতে এগিয়ে আসে নাম-না জানা লতা-পাতার দল ; তারা মাথা নাড়িয়ে প্রাণ-মাতানো এক অপূর্ব গন্ধ ছড়ায়।

আরও কিছুদিন পরের কথা। পাশের কোন্ গাঁ থেকে একদিন এক বৃদ্ধ ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হলেন সেখানে। লোকটি কবরের পাশে সদ্য কাটা একটি ওকের খুঁটি পুঁতে বেদীর মত তৈরী করেন। তারপর সেই বেদির কুলঙ্গির তিন কোণা কার্ণিশের নীচে বৃদ্ধ সযত্নে স্থাপন করেন মা-মেরীর একটি শোকাচ্ছন্ন অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। তাঁর কাজ শেষ হলে বৃদ্ধ আবার ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় মিলিয়ে যান।

দীর্ঘ কাল কেটে গেছে তবুও ডন নদীর তীর ধরে ঐ পথ দিয়ে চলতে গেলে পথিকের মন বেদনায় আর্দ্র হয়ে ওঠে ; বেদীর ঐ বিষণ্ণ মূর্তিটি সে পথিকের মনে জাগায় এক মূক আকূতি।

—:-*-:—

লেখক পরিচিতি

সংকলিত কাহিনীগুলির ক্রম অনুসারে লেখকদের
সংক্ষিপ্ত জীবনী বিন্যস্ত করা হয়েছে।

হেনরিক সিনকিয়ুইজ, ১৮৪৬-১৯১৬

হেনরিক সিনকিয়ুইজ (Henryk Sienkiewicz) উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোলিশ কথা-সাহিত্যিক।

১৮৭২ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত ভাবে সাহিত্য সেবা করে গেছেন। তাঁর লেখা অন্যূন বারোটি উপন্যাস অনূদিত হয়েছে; তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—Quo Vadis, Children of the Soil, The Deluge এবং On the Field of Glory।

অনেকের মতে,সংকলিত কাহিনীটি—'**মানরক্ষা**' (Quo Vadis) তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

হেনরিক সিনকিয়ুইজ কেবল সাহিত্যিক নন, তিনি একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বদেশপ্রেমিকও। বৃদ্ধ বয়স অবধি তিনি নিরলস ভাবে দেশের সেবা করে গেছেন সক্রিয় ভাবে।

সাহিত্য সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০৫ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

রুডিয়ার্ড কিপলিং,
১৮৬৫-১৯৩৬
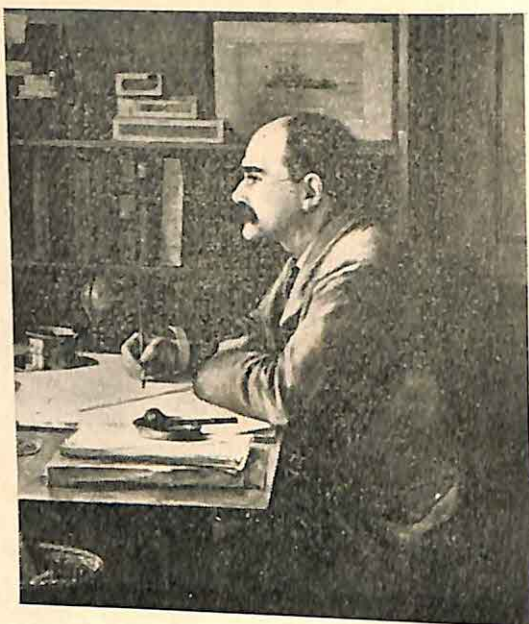
ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে কিপলিং একটি অতি পরিচিত নাম। ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর রুডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিল্পী। ভারত সরকারের অধীনে লাহোরে মিউজিয়াম-কিউরেটার হিসাবে তিনি কিছুকাল ছিলেন।

প্রথম জীবনে কিপলিং হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করেন। উত্তর জীবনে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ ক'রে তিনি নানাদেশের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন।

ফলে, যদিও প্রধানতঃ ভারতবর্ষ কিপলিং-এর সাহিত্যের পটভূমি হিসাবে বেশী স্থান পেয়েছে, তবু মিশর, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনাডা প্রভৃতি বহু দেশের ছবিও সেখানে বিধৃত হয়েছে।

কিপলিং তিন বছর এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকাকালীন সেই পত্রিকায় বহু কবিতা ও ছোটগল্প লিখেছিলেন।

সাম্রাজ্য বিস্তারের যে উদগ্র বাসনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে সদা-জাগ্রত ছিল, কিপলিং তাঁদের অন্তরের সেই কামনাকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য রচনা করেছিলেন। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে তাঁর এই অহমিকাই শেষ

পর্যন্ত তাঁর অপ-নামের অনেকখানি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবুও কিপলিং-সাহিত্যে ভারতীয় আরণ্যক জীবনের যে বর্ণোজ্জ্বল রূপ "The Jungle Book", "The Second Jungle Book" প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে।

১৯০৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ভারত এবং বৃটেনের পটভূমিকায় রচিত তাঁর **"আঁধারে আলো"** (Brushwood Boy)—আমাদের নির্বাচিত গ্রন্থটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে—Barrack Room Ballads, Kim এবং The Light that Failed উল্লেখযোগ্য।

জেল্‌মা লেগার্‌লয়েফ্,
১৮৫৮–১৯৪০

তখন তাঁর বয়স সাড়ে তিন বছরের বেশী নয়। জেল্‌মা লেগার্‌লয়েফ্ (Selma Lagerlof) পিতার সঙ্গে একদিন পুকুরে স্নান করতে নামলেন। আর সেই স্নান থেকেই হল ঐ বিপর্যয়; পুকুর থেকে উঠে এলে ছোট্ট মেয়েটির শরীরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিল।

চিকিৎসার কোন ত্রুটি হল না। এ জন্য তাঁর শৈশবের প্রায় সবটাই কাটে কোন স্যানাটোরিয়ামে অথবা কোন গরম দেশে। কিন্তু কোন ফল হল না; চিরদিনের জন্য তিনি খোঁড়া হয়ে রইলেন। তাঁর বিয়ে না হওয়ার হয়ত এটাও একটা কারণ।

তাঁর পিতা মাতা দুজনেই ছিলেন সংস্কৃতি সম্পন্ন। তাঁদের মেয়েটি ছিল দুর্বল প্রকৃতির। ফলে তাঁর এই অবস্থার জন্য জেল্‌মাকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠানো হল না। হাল্কাভাবে বাড়ীতে বসেই তাঁর লেখা পড়া শুরু হয়। আর অবসর সময়ে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনে জেল্‌মার দিন কাটে। ঠাকুমার মুখের গল্প শুনেই তাঁর মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল সাহিত্যের বীজ। পরবর্তীকালে ঠাকুমার এ গল্পের অনেকগুলো নাতনীর গল্পে স্থান পেয়েছিল।

নাটকের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী জেলমার সাহিত্য-তৃষ্ণা জেগে ওঠে। কিন্তু তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা ছিল কবিতা, সেটি প্রকাশিত হয়েছিল কোন

একটি স্থানীয় পত্রিকায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর প্রথম কাব্য-সংকলনটির জন্য কোন প্রকাশক খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সংকলিত গল্পটি—**"ঝড়ের পরে"** (The Story of Gosta Berling)। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যে একটি যুগান্তর সৃষ্টি করে। একমাত্র হান্স ক্রিশ্চিয়ান এ্যাণ্ডারসন ভিন্ন আর কোন লেখক এতটা জনপ্রিয় হননি।

১৯০৪ সালে সুইডিস্ এ্যাকাডেমি থেকে তিনি স্বর্ণ পদক পেলেন। দশ বছর পর এই এ্যাকাডেমির প্রথম মহিলা-সদস্য হিসাবে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯০৯ সালে এই সুইডিস্ লেখিকা নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে মহিলাদের ভিতর তিনিই প্রথম এই গৌরব অর্জন করেন।

তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে Tale of a Manor, Jerusalem, Anna Svaird বিখ্যাত।

পল হেইস্,
১৮৩০-১৯১৪

১৮৩০ সালের ১৫ই মার্চ পল [ফ্যান] হেইস্ (Paul [Von] Heyse) বার্লিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন জর্মন। সুতরাং তিনি একজন জর্মন সাহিত্যিক সন্দেহ কি? কিন্তু স্বদেশ বলতে তিনি নিজে মনে করতেন ইতালিকে।

১৮৫৪ সালে ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম ম্যাক্সিমিলানের আমন্ত্রণে তিনি ম্যুনিকে গমন করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ম্যুনিকেই বাস করেছেন। এখানে এসে তিনি হয়েছিলেন ম্যুনিক কবিসঙ্ঘের মধ্যমণি।

তাঁর লেখার প্রধান বাহন ছিল ইতালীয় ভাষা। হেইসের লেখা ছিল প্রধানতঃ বাস্তবভিত্তিক। তবুও সেখানে সৌন্দর্য ও মনস্তত্ত্বের একটা বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছে।

হেইস্ সেকালে প্রচলিত নিও-রোমান্টিকদের ধারাটিকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। নিও-রোমান্টিকরাও তাঁকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতে ছাড়েন নি।

তবুও ১৯১০ সালে নোবেল পুরস্কারে তিনিই সম্মানিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে জর্মন সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কারের গৌরব লাভ করেন।

মূলতঃ ঔপন্যাসিক হলেও তিনি অন্যূন পঞ্চাশটি নাটকও লিখেছিলেন। কবি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না।

তেইশ বছর বয়সের লেখা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত—**"গরবিনী"** (L' Arrabita) নভেলেনটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ইতালিয়ান সাহিত্যে এটি একটি অনবদ্য সংযোজন। রচনাটি এত বছর পরেও কত প্রাণবন্ত!

পল হেইস্ সাহিত্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছ থেকে।

মরিস মেটারলিঙ্ক,
১৮৬২-১৯৪৯

মরিস মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck) ১৮৬২ সালে বেলজিয়ামে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক বেলজিয়ান সাহিত্যের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক—যদিও ফরাসী ভাষা ছিল তাঁর সাহিত্যের বাহক।

অন্যান্য বহু সাহিত্যিকের মত মেটারলিঙ্কেরও প্রথম প্রকাশ হয় কাব্যের ভিতর দিয়ে। কবি মেটারলিঙ্কের সৃষ্টির মধ্যে পো এবং ভারলেইনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয় নাটকের মাধ্যমে। স্বদেশের গণ্ডির বাইরে তিনি নাট্যকার হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেছেন।

তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক—Pe'lle'as and Melisande, The Blue Bird এবং Monna Vanna.

অনেকের মতে এ গ্রন্থে সংকলিত প্রথমোক্ত বইটি 'Pe'lle'as and Melisande' বা **"নষ্টনীড়"** তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না। প্রবন্ধ পুস্তকের মধ্যে—Life of the Bee, Treasure of the Humble এবং Wisdom and Destiny বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। প্রসঙ্গতঃ তিনি নিজেও মৌমাছি পালন করতেন।

১৯১১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

গেরহার্ট হাউপ্টমান্,
১৮৬২-১৯৪৬

এই জর্মন লেখকের জীবনের প্রথম দিকে একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল ঃ সাহিত্যের দিকে যাবেন না বিজ্ঞানের চর্চা করবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

গেরহার্ট হাউপ্টমান্ (Gerhart Hauptmann) জায়েন্ট মাউনটেনসের অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রেসলান ও জেনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম দিকে তিনি ন্যাচারালিজমের অনুরাগী ছিলেন; পরে নিও-রোমান্টিসিজম, ক্ল্যাসিসিজম, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

ইতালি ও স্পেনের বহুস্থানে ঘোরার পর ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ "Promethidenlos"। এর পর স্থায়ীভাবে তিনি বার্লিন সহরে বাস করেন এবং এই সময়েই তিনি নিও-রিয়েলিজম-এর প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন একজন গরীব তাঁতি। এক সময় সাইলেশিয়ান তন্তুবায়দের সেই বিখ্যাত বিদ্রোহের কাহিনী তিনি শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুরদার থেকে। ভাবীকালে সেই বিদ্রোহের রূপ পেল নাতির ভাষায়—তাঁর চতুর্থ নাটক '**তাঁতি**'-তে (The Weavers)। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত উক্ত বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই

ইউরোপীয় বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হল। এই সাইলেশিয়াতেই হাউপ্টমান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জার্মানীর এই প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক তাঁর নাটক এবং উপন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করে গেছেন।

১৯১২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ক্নুট হামসুন,
১৮৫৯-১৯৫২

১৮৮৮ সালে একজন অখ্যাতনামা লেখক ডেনমার্কের কোন একটি সাহিত্য পত্রিকায় একটি উপন্যাস ছাপাতে পাঠান। এটি প্রকাশিত হলে সাহিত্য-জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস-টিতেই লেখক—ক্নুট হামসুন (Knut Hamsun) প্রতিষ্ঠিত হন বিশ্বসাহিত্যের সম্মানের শিখরে। উপন্যাসটির নাম ছিল Sult, ইংরেজী অনুবাদ : Hunger।

১৮৫৯ সালের ৪ঠা আগস্ট, পূর্ব নরওয়ের এক পল্লীতে কোন এক দরিদ্র চাষী পরিবারে হামসুনের জন্ম হয়। তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল পৈতৃক আমলের লোহা পেটানোর কাজে। শৈশব থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করতে শেখেন। কিন্তু সে সংগ্রাম তাঁর শিল্পীমনকে কোনদিন এতটুকু ম্লান করতে পারেনি।

কাকার অতিরিক্ত শাসনে উত্ত্যক্ত হয়ে হামসুন একদিন বাড়ী থেকে পালিয়ে মুচির দোকানে আশ্রয় নেন। দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে জুতা সেলাই করে তাঁর দিন কাটে। কিছুদিন বাদে ভাগ্যের সন্ধানে তিনি চলে যান আমেরিকা। সেখানে প্রথমে কাজ জুটল এক কারখানার কুলি হিসাবে। কিছুদিন বাদে তিনি হলেন একজন সেল্‌সম্যান এবং তারপর শিকাগোর ট্রাম-কন্‌ডাকটার। কিন্তু শিল্পী হামসুনকে আমেরিকা বেশীদিন বেঁধে রাখতে পারল না।

তাঁর ত্রিশ বছরের কঠিন অভিজ্ঞতার ফল নিবেদন করলেন প্রথম উপন্যাস —'**বুভুক্ষা**'-তে (Hunger)। উপন্যাসটির খ্যাতি ও সাহিত্যিক মূল্য স্বীকৃত হল সর্বদেশে। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি।

কবি হামসুন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে যে ছদ্মনাম তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তা 'HAMSUND'—তাঁদের পারিবারিক কৃষি প্রতিষ্ঠানের নাম। কিন্তু মুদ্রাকর তা ছাপলো 'Hamsun'। সেই থেকেই হামসুন নাম বহাল হল। তাঁর আসল নাম—ক্নুট পেডারসন চাপা পড়ে গেল।

তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯২০ সালে। তাঁর রচিত—Hunger, Pan এবং Growth of the Soil প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যে এক একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আনাতোল ফ্রাঁস,
১৮৪৪-১৯২৪

যিনি এককালে ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপ-ন্যাসিক এবং সমা-লোচক হিসাবে গৌরব লাভ করে-ছিলেন; যিনি ১৮৯৬ সালে ফ্রেঞ্চ আকা-দেমীতে সভ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন—তাঁর সাহিত্য-জীবনের উৎস ছিল পিতার বইয়ের দোকানটি।

পিতা ছিলেন প্যারিস শহরের বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা। সে দোকান ছিল মস্তবড়।

আনাতোল তখন নিতান্ত বালক। রোজ বহু জ্ঞানী, গুণী এবং সু-সাহিত্যিক আসতেন তাঁর পিতার দোকানটিতে। তাঁদের আসরে আলোচনা হত—শিল্প এবং সাহিত্য। তাঁদের সে সব আলোচনা কতটুকুই বা বুঝতেন। তবুও আনাতোল চুপ করে এক কোণে বসে থাকতেন। আগ্রহভরে শুনতেন সেই সব আলোচনা। অগ্রজদের এই আলোচনা শুনতে শুনতেই বালক আনাতোলের মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল সাহিত্যের বীজ।

১৮৪৪ সালের ১৬ই এপ্রিল, প্যারিস শহরে আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France) জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গত হন ১৯২৪ সালের ১২ই অক্টোবর। তাঁর আসল নাম ছিল জাকে আনাতোল থিবো।

কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়েছিল। মাঝে কিছু নাটকও তিনি লিখেছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ বিকাশ হয় উপন্যাসের মাধ্যমে।

তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—**'পাপ-পুণ্য'** (মূল ফরাসী গ্রন্থটির নাম "The Crime de Sylvestre Bonnard" : ইংরাজীতে—"The Crime of Sylvestre Bonnard)। যদিও এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস কিন্তু এটি প্রকাশিত হবার পর ফ্রেঞ্চ আকাদেমী তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। এই বইটি-ই তাঁকে এনে দিয়েছিল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই—Thais, The Life of Joan of Arc (Vie de Jeanne d' Arc), Penguin Island (Ile des penguins) ইত্যাদি।

———

ইয়াসিন্তো বেনাভেন্তে,
১৮৬৬-১৯৫৪

ইয়াসিন্তো বেনাভেন্তে (Jacinto Benavente) ছিলেন স্প্যানিস নাট্যকার। তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু হয়েছিল মাদ্রিদ-এর মাটিতে। তিনি পেছনে রেখে গেছেন তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকার যে আদর্শ চেয়েছিল শুধু স্পেনের জন্য নয়, অন্যান্য ইওরোপীয় দেশসমূহের জন্যও বৃহত্তর স্বাধীনতার আশ্বাস।

তাঁর পিতা ছিলেন একজন চিকিৎসক। গোড়াতে বেনাভেন্তে আইন অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে লেখার তীব্র তাগিদ অনুভব করতে তিনি আইন পড়া ছেড়ে দিলেন। প্রথম দিকে কাব্য এবং ছোট গল্প দিয়েই বেনাভেন্তে যাত্রা শুরু করেছিলেন, ক্রমে নাটক লেখাতে তিনি পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য এই প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর 'দি আদার্স নেস্ট', ১৮৯৩-এর সাফল্যের পর।

তাঁর প্রথম দিকের নাটকগুলো মাদ্রিদের থিয়েটার শিল্প ও মঞ্চের গঠনমূলক ছিল। ডায়ালগ রচনা, স্যাটায়ারের প্রকাশ এবং সর্বোপরি এই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের অন্তরালে যে বাস্তবতা রয়েছে, তার প্রকাশের মাধ্যমেই তিনি তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ ঘটালেন।

এ গ্রন্থে সংকলিত—**'শেষ রক্ষা'** (The Bonds of Interest) প্রকাশের

পর তিনি খ্যাতির চরম শিখরে আরোহণ করেন। এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এর পরে তিনি পঞ্চাশের অধিক নানা ধরনের নাটক লেখেন। কিন্তু উক্ত নাটকটির গুণগত উৎকর্ষকে পরবর্তী কালের কোন নাটক অতিক্রম করতে পারেনি।

১৯১২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। ১৯১৩ সালে বেনাভেন্তে স্প্যানিশ একাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন।

শুধু সাহিত্যে নয়, শিক্ষা এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও বেনাভেন্তে একটি বহু উচ্চারিত নাম।

তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে People We Know, Saturday Night প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ল্যাডিস্‌লাস রেমঁ,
১৮৬৮-১৯২৫

ল্যাডিস্‌লাস রেমঁ (Ladislas Reymont) পোল্যাণ্ডের অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক। ১৮৬৮ সালের ৬ই মে, মধ্য-পোল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম; ১৯২৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

রেমঁর পিতা ছিলেন একজন সাধারণ গ্রামীণ অর্গান-বাদক। অভাবের সংসার। তাঁর পিতার মেজাজ ছিল রুক্ষ, সন্তানদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত রূঢ়।

অভিমানী বালক রেমঁ পিতার সংস্পর্শ এড়িয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতেন বনে জঙ্গলে। তবুও পিতার নিষ্ঠুর শাসন থেকে তিনি রেহাই পান নি। অবশেষে একদিন বাড়ী থেকে পালিয়ে সুদূর কাকার বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিশোর রেমঁ পিতার আওতা থেকে দূরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

বালক বয়সে রেমঁ লেখাপড়ার সুযোগ বিশেষ পান নি কিন্তু পড়বার বা জানবার তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। কি করে স্লওস্বাস্‌কি-র 'লিলা ভেনিডা'র একটি কপি একদিন তাঁর হাতে এলো। কিশোর রেমঁ রাত্রি বেলায় চোরের মত চুপি চুপি চাঁদের আলোয় বইটি পড়ে শেষ করলেন।

এই বইটি পড়েই তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্য সাধনার প্রেরণা। সেই রাত্রেই তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল সাহিত্যের বীজ।

কিন্তু তাঁর পেটের ক্ষুধা ছিল দুর্জয়। অনেক কষ্টে তিনি রেলওয়েতে একটি সাধারণ চাকুরী পেলেন। ক'বছর চাকুরী করবার পর তিনি একদিন গুরুতর ভাবে আহত হলেন। ফলে, তাঁকে দেড় বছর শয্যাশায়ী থাকতে হল।

পুরোপুরি আরোগ্য লাভের জন্য কোন একটি স্বাস্থ্যাবাসে তাঁকে থাকতে হয়। চাষীদের জাবন নিয়ে সেখানে বসে তিনি লিখলেন একটি সুদীর্ঘ উপন্যাস। সাহিত্যে তাঁর হাতে খড়ি হল। কিন্তু তাঁর শিল্পীমন সে-রচনাটি অনুমোদন না-করায় রেমঁ পাণ্ডুলিপিটি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

কিন্তু তাঁর মৌলিক ভাবনা নষ্ট হল না, মনের মধ্যে রয়ে গেল। কিছুদিন বাদে ফ্রান্সে এসে শিল্পী রেমঁ একাগ্রচিত্তে তাঁর পুরানো ভাবনার রূপ দিতে বসলেন। দীর্ঘ সাত বছরের সাধনার ফল হিসাবে বিশ্বসাহিত্য পেল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস-মালা **"চাষী"** (The Peasants), চার খণ্ডে।

এই এপিকধর্মী সুবৃহৎ উপন্যাস প্রকাশিত হলে তিনি পেলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি, পেলেন বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। ১৯২৪ সালে তিনি হ'লেন নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত।

প্রথম জীবনে ভাগ্যের বিড়ম্বনা তাঁকে কম সইতে হয়নি। সে-সব বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার ছবি পাওয়া যাবে তাঁর অনেক ছোটগল্পে।

জর্জ বার্নার্ড শ',
১৮৫৬-১৯৬০

১৯২৫ সালে তাঁর নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হলে তিনি বললেন,—'এই বছর আমি কোন বই প্রকাশ করিনি ; আমার বই বের না হওয়াতে পৃথিবী যে স্বস্তি লাভ করেছে, সেজন্যেই আমাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে'। জীবনের অর্ধেকের বেশী বয়স পর্যন্ত যাঁকে ভাগ্যের সন্ধানে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল, এই পুরস্কারের টাকা কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না। তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে ঐ টাকায় এ্যাংলো-সুইডিস লিটারারি ফাউণ্ডেশান স্থাপিত হয়। সুইডিস সাহিত্যের ভালো ভালো বইগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন রহস্যে মণ্ডিত। সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর উক্তি চমকপ্রদ। মূলতঃ নাট্যকার হিসাবে নোবেল পুরস্কার পেলেও, সমালোচক হিসাবেও বার্নার্ড শ'র খ্যাতি কম নয়। পরিচিত এবং অপরিচিতদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখে গেছেন অসংখ্য চিঠি।

১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই জর্জ বার্নার্ড শ'(George Bernard Shaw) ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন ; মৃত্যু হয় ২রা নভেম্বর, ১৯৫০। তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। শ'র পিতামাতার দাম্পত্য-জীবন সুখের ছিল না। তিনি পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

মদ এবং তামাকের প্রতি পিতার অতিরিক্ত আসক্তি দেখে

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ঐ দুটি জিনিসের প্রতি গভীর ঘৃণা পোষণ করতেন।

পারিবারিক অবস্থার জন্য স্কুলের পাঠ তিনি শেষ করতে পারেন নি। অবশ্য ছাত্র হিসাবে শ' ভাল ছিলেন না।

লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে পনেরো বছর বয়সে কিছুদিন তিনি কোন এক জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে লেখক হবার আশা নিয়ে তিনি চলে গেলেন লণ্ডনে। তিন বছর বাদে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Immaturity' শেষ করলেন। কিন্তু কোন প্রকাশকই এ বই ছাপতে রাজী হল না। লণ্ডনে আসবার পর দশ বছর যাবৎ মা ও বোনের উপার্জনের ওপর বসে খেতে হয়েছিল বলে তাঁকে কম লাঞ্ছনা সইতে হয়নি। অল্প কিছুদিনের জন্য টেলিফোন কোম্পানীতে তিনি কাজ করেছিলেন।

এই সময় প্রতিদিন পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখে শ' একে একে পাঁচখানা উপন্যাস লিখলেন। কিন্তু এবারেও একটি পাণ্ডুলিপির জন্যও প্রকাশক পেলেন না। তখন নগদ প্রাপ্তির আশায় তিনি আরম্ভ করলেন সঙ্গীত ও নাটক সমালোচনা।

উইলিয়াম আর্চারের পরামর্শ এবং উৎসাহে শ' প্রথম নাটক লিখতে শুরু করেন। নাট্যকার শ' জীবনে প্রথম আলো দেখেন ১৮৯৪ সালে।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে নাটকীয় ভাবে তিনি বিয়ে করেছিলেন শ্রীমতী শার্লটকে। ফেবিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর শ' প্রায় প্রথম থেকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তিনি শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। টাকা-পয়সার ব্যাপারে শ' ছিলেন অত্যন্ত হিসেবী।

"সেণ্ট জোয়ান" (Saint Joan) তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই—Man & Superman ; Getting Married ইত্যাদি।

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা,
১৮৭২-১৯৩৬

১৮৭২ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর সারডিনিয়ার অন্তর্গত নুয়োরো পল্লীগ্রামে গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (Grazia Deledda) জন্ম গ্রহণ করেন। পল্লীর শান্ত পরিবেশে তিনি বড় হ'য়ে ওঠেন। স্বভাবে তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক এবং প্রকৃতিতে ভীরু। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রচলিত ঔদাসীন্য দরুন তিনি অল্প বয়সে লেখা পড়ার বিশেষ সুযোগ পাননি। ঘরে বসে ফরাসী ভাষার মাধ্যমে যা-হোক কিছু পাঠ নিয়ে ছিলেন। কিন্তু জানবার আগ্রহ যাঁর প্রবল ও-সামান্য বাধা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। শ্রীমতী গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা নিজের চেষ্টা এবং আগ্রহে ঘরে বসেই যথেষ্ট পড়াশুনা করলেন।

তার ফলশ্রুতিতে পনের বছর বয়স থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় রোম নগরের একটি ফ্যাসান জার্নালে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক পাঠিকা লেখিকার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

তাদের সেদিনের কৌতূহল মিথ্যা হয়নি। ক' বছর বাদে এই লেখিকাই আধুনিক ইতালিয়ান সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী-ঔপন্যাসিকের গৌরব লাভ করলেন। বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারেও তাঁর কদর হ'ল।

১৮৯৭ সালে একজন পদস্থ রাজ কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীমতী গ্রাৎসিয়াকে এবার তাঁর পল্লীর গণ্ডী ছেড়ে চলে যেতে হয়

রোম নগরে—তাঁর স্বামীর কর্মস্থলে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন।

তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—'**মা**' (La Madre, ইংরেজীতে The Mother)। প্রধানতঃ এই বইটিকে কেন্দ্র করেই ১৯২৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু এ পুরস্কারের পর তিনি লজ্জায় আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন। তাঁর আগে শুধু একজন নারী (Selma Lagerlof) এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। সুতরাং সেদিক থেকেও তাঁর গৌরব কম নয়।

তাঁর আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য বই—Divorce এবং Ashes.

সীগ্‌রীড উণ্ডসেট্‌,

১৮৮২-১৯৪৯

নরওয়ের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীমতী সীগ্‌রীড উণ্ডসেট্ (Sigrid Undset) ডেনমার্কের অন্তর্গত কলুণ্ডবর্গে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস—Mrs Martha Oulie অপ্রত্যাশিত ভাবে একঘেঁয়ে বিরক্তিকর কেরানী জীবন থেকে তাঁকে দিয়েছিল মুক্তি। এই বইটি প্রকাশিত হবার পর সরকারী বৃত্তি পেয়ে তিনি বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পৌছলেন রোম নগরে। এখানে তিনি দীক্ষিত হন রোমান ক্যাথলিক রূপে।

তাঁর প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতিরূপে ১৯২৮ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর প্রায় সব বইগুলিই নারীকেন্দ্রিক। নারীর সুখ-দুঃখকে ভিত্তি করেই তাঁর উপন্যাস।

দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি আমেরিকায় ছিলেন।

'হারানো প্রেম' (Kristin Lavransdatter) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে—The Master of Hestviken, The Steadfast Wife প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

টমাস মান,

১৮৭৫-১৯৫৫

বর্তমান শতাব্দীর জর্মন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে টমাস মান (Thomas Mann)-এর আসন শীর্ষ-স্থানে। ১৮৭৫ সালে ল্যুবেকে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পনের বছর বয়সে পরিবারে আসে চরম বিপর্যয়। পারিবারিক ব্যবসা উঠে যায়, পিতা হলেন অকালে স্বর্গত। তাঁদের বসতবাড়ীটি পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল। আশ্রয়ের জন্য তাঁরা সকলে চলে এলেন ম্যুনিকে। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় Buddenbrooks.

অতি অল্প বয়সে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ম্যুনিকে একটি বীমা অফিসে কেরানীর কাজ করবার সময় সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বন্ধুত্ব ও প্রীতি তিনি অর্জন করেন এবং সেই মেলামেশার ফলেই সাহিত্য-কর্মে তিনি প্রথম অনুপ্রেরণা লাভ করেন। উত্তরকালে তাঁর এই সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা সাফল্যমণ্ডিত হয়। বড় ভাই হাইনরিখের সঙ্গে কিছুদিন রোমে থাকাকালীন তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন ছোটগল্প।

'যাদু-পাহাড়' (The Magic Mountain) প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত স্বদেশে এবং বিদেশে এই বইটি ছিল মানের একমাত্র পরিচয়। ১৯১২ সালে এক স্বাস্থ্যনিবাসে রুগ্না স্ত্রীকে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। সেই পটভূমিকাতেই হয়েছিল এই বিখ্যাত বইটির সৃষ্টি।

১৯২৯ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার পর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির গতি বেড়ে যায় অধিকতর উৎসাহে।

নাৎসীবাদের বিরোধিতার অপরাধে জর্মন নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে ১৯৩৭ সালে তিনি চলে গিয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ায়। কিছুদিন পরে টমাস সেখান থেকে স্থায়ীভাবে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। প্রায় আশী বছর বয়সে জুরিখে তাঁর দেহান্তর হয়।

১৯৪৯ সালে মহাকবি গ্যোতের দু'শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে টমাস মান জর্মনীতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে 'ফ্রিডম অফ হুবাইমার' সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁর জন্মভূমি ল্যুবেক তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল—'Freedom of Lubeck' উপাধি দিয়ে।

ঐ বছরই অকস্‌ফোর্ড এবং ১৯৫৩-এ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় টমাস মানকে 'ডক্টর অফ লিটারেচার'-এ সম্মানিত করে।

তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই : Dr. Faustus ; The Genesis of a Novel ; The Tales of Jacob ইত্যাদি।

সিনক্লেয়ার লুইস,
১৮৮৫-১৯৫১

আমেরিকান লেখকদের মধ্যে লুইস-ই প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন—১৯৩০ সালে। ১৯২০ সালের আমেরিকান সমাজ-জীবনকে তিনি তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেন। 'মেইন স্ট্রীট' ও 'ব্যাবিট'—এই দু'টি গ্রন্থই এক হিসাবে তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছে। প্রথম বইটি ছোট্ট শহরের একটি বিশিষ্ট রূপ এবং দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রমনা ব্যবসায়ীর একটি প্রতিচ্ছবি। বই দু'টি সর্বকাল এবং সর্বদেশের উপভোগ্য। বিশেষ করে **"রাজপথ"** (Main Street) বইটি সত্যিই একটি অনবদ্য রচনা।

১৮৮৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী মিনিসোটায় সিনক্লেয়ার লুইস্ (Sinclair Lewis) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন চিকিৎসক।

পিতার প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁর অনেক উপন্যাসের মধ্যে তিনি পিতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

স্কুলের পাঠ শেষ করার পর তিনি ইয়েল-এ গমন করেন; সেখানে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সালে তিনি স্নাতক হন।

সাহিত্যের প্রতি অবশ্য তাঁর অনুরাগ প্রথম থেকেই ছিল। প্রথম দিকে অনেকের মতো তিনিও কবিতা লিখতেন। পরে কথা-সাহিত্যের প্রতি তিনি আকর্ষিত হন।

তার আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য বই--Arrowsmith এবং Dodsworth.

জন গলস্‌ওয়ার্দি,

১৮৬৭-১৯৩৩

নাট্যকার, ছোটগল্প রচয়িতা, ঔপন্যাসিক এবং কবি—গলস্‌ওয়ার্দি ছিলেন এই বহুমুখী প্রতিভার আধার।

১৮৬৭ সালের ১৪ই আগস্ট জন গলস্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy) কিংস্টনে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে তিনি আইন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং প্র্যাকটিস করবার জন্য তাঁকে বার-এ ডাকাও হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ তাঁকে সে পথে পা বাড়াতে দেয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তাঁকে 'স্যার' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব হতে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য ১৯২৯ সালে বিশেষ সম্মানের উপাধি 'অর্ডার অফ মেরিট' তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

তিন খণ্ডের বিখ্যাত উপন্যাস-মালা—**'ফরসাইট পরিবার'** (Forsyte Saga) তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। সে কাহিনীর পটভূমিতে রয়েছে এক সংস্কৃতিসম্পন্ন উচ্চ মধবিত্ত সমাজের ছবি, ফরসাইট পরিবারের একটি দীর্ঘ ইতিহাস। এই উপন্যাস-মালায় গলস্‌ওয়ার্দির শিল্প প্রতিভা পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়েছে।

বিশেষ করে এই সাহিত্য-কীর্তির জন্য ১৯৩২ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তি-জীবনে চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিনয়ী এবং সহানুভূতিশীল।

অক্সফোর্ডের নিউ কলেজের তিনি ফেলো ছিলেন, এবং অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে অনরারী ডক্টরেট ডিগ্রীও দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর লেখক মানসের সবচেয়ে বড়গুণ ছিল—তিনি প্রেরণা অনুভব না করলে কখনও লিখতেন না।

অন্যান্য রচনা—The Island Pharisees, The Swan Song, Silver Box, Justice, Strive ইত্যাদি।

আইভান বুনিন,

১৮৭০-১৯৫৩

চেকভের মৃত্যুর পর রাশিয়ান নাটক যেমন, রাশিয়ান উপন্যাসও তেমনি একটি অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে চলছিল। এই সময় বুনিনের আবির্ভাব রাশিয়ার কথা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে।

ভরোনেগ শহরে আইভান [আলেক্সিভিচ] বুনিন (Ivan [Alexeyevich] Bunin) জন্মগ্রহণ করেন। ছেলে বেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়।

১৯১০ সালের দিকে কিছু সংখ্যক সাধারণ স্তরের কবিতা এবং লং-ফেলোর Hiawatha-র অনুবাদ প্রকাশের পর সাহিত্য জগতে সহজেই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস **"শহর থেকে দূরে"** (The Village) প্রকাশের পর বুনিনের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হল। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

বুনিন-কে প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ান সাহিত্যের একজন কালনির্দেশক বলা চলে। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু, রীতি-প্রকৃতি, ভাষা, বক্তব্যের স্বচ্ছতা ও তীক্ষ্ণতা, শিল্প-পরিমিতিবোধ—সবকিছু মিলিয়ে এক হিসাবে তাঁকে ঊনবিংশ শতকের রাশিয়ান সাহিত্যের তৃতীয় পর্বের সেই সব বাস্তববাদী

সাহিত্যিকদেরই সমগোত্রীয় করে তুলেছে—যাঁরা রাশিয়ান সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯৩৩ সালে আইভান বুনিন-ই রাশিয়ান সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন।

১৯২০ সালের পর থেকে বুনিন যা কিছু লিখেছেন তার সবটুকুই রাশিয়াকে কেন্দ্র করে।